নৃত্য-ভারত

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরনী, কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
রবি রায়চৌধুরী
২২০, বি ব্লক, বাঙুর এভিনিউ
কলিকাতা-৫৫

দ্বিতীয় সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৬৩

মুদ্রক :
শ্রীসুধাংশু মোহন রায়
নিউ শক্তি প্রেস
১০নং রাজেন্দ্র নাথ সেন লেন
কলিকাতা-৯

ভূমিকা

আলোচ্য গ্রন্থটির লেখিকা শ্রীমতি মঞ্জুলিকা রায় চৌধুরী আমাকে এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিতে বলেছেন বলে আমি খুশী হয়েছি। তাঁকে দক্ষ নৃত্যশিল্পের শিক্ষয়িত্রী হিসাবেই এতদিন জানতাম ; তিনি যে অতিরিক্ত ভাবে নৃত্যশাস্ত্রে গভীর বুৎপত্তি লাভ করেছেন, জানতাম না। বর্তমান গ্রন্থখানি আমার ধারণায় এ বিষয়ে তাঁর অনন্য সাধারণ অধিকারের পরিচয় দেবে।

অতীতে নৃত্যচর্চা ভারতে ব্যাপক ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ধর্মের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান হিসাবে বা বিশুদ্ধভাবে চিত্তবিনোদনের উপায় হিসাবে, উভয়রূপেই তার স্বীকৃতি ছিল। এই চর্চার ফলেই ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতিকেন্দ্রে স্থানীয় মানুষের রুচি ও মতিগতি ভেদে এতগুলি বিভিন্ন রীতির নৃত্য গড়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক কালে তার চর্চা নানাকারণে শিথিল হয়ে এসেছিল। তবে সৌভাগ্যের কথা, তা আবার স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। সেটা সম্ভব হয়েছে কয়েকজন গুণী নৃত্য সাধকের ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং বিশেষ ভাবে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত এবং সক্রিয় উৎসাহ দানে। ফলে নৃত্যচর্চা এখন আর অপাংক্তেয় নয়, তা শিক্ষার অঙ্গ, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমেও তা সম্মানের আসন অধিকার করেছে।

নৃত্যশিল্পে অধিকার স্থাপন করতে একদিকে যেমন দক্ষ গুরুর প্রয়োজন, অপরদিকে ভাল পাঠ্য পুস্তকের প্রয়োজন। বাংলাভাষায় এই ধরণের পাঠ্যপুস্তক যে একেবারেই রচিত হয় নি তা নয়, তবে উচ্চস্তরের ছাত্রদের জন্য গভীরতর ও ব্যাপকতর আলোচনা সমন্বিত গ্রন্থের অভাব এখনও দূর হয় নি। আমার মনে হয়, বর্তমান গ্রন্থখানি সেই অভাব পূরণ করবে ।

আমার এই প্রতিপাদ্যের সমর্থনে আলোচ্য গ্রন্থের পরিচয় দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। গ্রন্থখানি ষোলটি অধ্যায়ে সমাপ্ত। তাতে নৃত্যশিল্পের নানা অঙ্গ আলোচিত হয়েছে। মোটামুটি দেখা যায়, আলোচ্য বিষয়গুলি তিনটি মূল বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে অবশ্য জ্ঞাতব্য কতকগুলি নৃত্য সম্পর্কিত সাধারণ তথ্য। এই বিভাগে আলোচিত হয়েছে নৃত্যের ইতিহাস, নৃত্য সম্পর্কিত মৌলিক চিন্তা, শিল্প হিসাবে নৃত্যের রসবিচার প্রভৃতি। তারপর

দ্বিতীয় বিভাগে আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন শ্রেণীর নৃত্যের সঙ্গে সাধারণ ভাবে সংযুক্ত কতকগুলি বিষয়। যেমন নৃত্যে রূপসজ্জা, আঙ্গিক অভিনয়ের রীতি এবং বিভিন্ন হস্তমুদ্রার পরিচয়। তৃতীয় বিভাগে ভারতের বিভিন্ন নৃত্যরীতির পৃথক ভাবে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাতে যেমন ভারতের চারটি প্রতিষ্ঠিত নৃত্যরীতির বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়, তেমন ওড়িষি নৃত্য এবং আধুনিক নৃত্যরীতি সম্বন্ধেও প্রয়োজনীয় তথ্য এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আধুনিক নৃত্য আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নৃত্যরীতিরও ব্যাখ্যা আছে। বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে লেখিকা শুধু তথ্য দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, যেখানে প্রয়োজন বোধ করেছেন সেখানে তুলনামূলক আলোচনা দিয়েছেন এবং অতিরিক্তভাবে বিভিন্ন মত সম্বন্ধে আলোচনা করে নিজের মন্তব্যও স্থাপন করেছেন। মোটামুটি গ্রন্থখানিতে যেমন আলোচ্য বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচনার চেষ্টা হয়েছে, তেমন সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টাও লক্ষিত হয়। এইখানেই এই গ্রন্থের উৎকর্ষ

সুতরাং এমন আশা পোষণ করা অসঙ্গত হবে না যে, গ্রন্থখানি শিল্পরসিক সমাজে সমাদর লাভ করবে। যিনি শিক্ষার্থী তিনি যেমন উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক হিসাবে এটি ব্যবহার করতে পারবেন, তেমন যিনি ভারতীয় নৃত্য সম্বন্ধে সবিস্তার জানতে ইচ্ছুক তিনিও গ্রন্থখানি পাঠ করে উপকৃত হবেন।

আমার কথা

পৃথিবীর সভ্যতার উন্মেষের স্তরে স্তরে নৃত্যের বিকাশ। অতি প্রাচীন-কাল থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ধর্ম, শিল্প, সংস্কৃতি প্রভৃতির সঙ্গে নৃত্যের নিবিড় সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক যুগে নৃত্য আংশিকভাবে চিত্ত-বিনোদনের জন্ত করা হয়ে থাকে। তবে এখন শিক্ষার অংশ হিসেবেও গণ্য করা হচ্ছে। আবার অনেকে একে কলাবিদ্যা হিসেবে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে থাকেন। অতি প্রাচীনযুগে এশিয়াতে নৃত্য যে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

সেইজন্তে দেখা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক সুসভ্য দেশগুলিতেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নৃত্যের প্রচলন ছিল। প্রাচীনকালে সুসভ্য দেশগুলির মধ্যে মিশর ছিল অন্ততম। তার সভ্যতার নিদর্শন আজও মরুভূমির বুকে বিরাজ করছে। মিশরে বহু দেবদাসী ছিল যারা শোভাযাত্রায় নানারকম উপচার বহন করত এবং নৃত্য করত। 'ক্রুটন কোরাসের' দলের গায়করা অঙ্গভঙ্গী সহকারে ঘুরে ঘুরে গ্রীক দেবতা এ্যাপোলোর মন্ত্র উচ্চারণ করতেন। রিয়ার সম্মানের জন্তে ফিজিয়ান্ কেরিব্যান্টিস করতাল ও ড্রামের সঙ্গে নৃত্য করেছিলেন। এমন কি রোমানরা যদিও চূড়ান্ত বিলাসী ছিলেন তবুও ধর্মানুষ্ঠান ছাড়া নৃত্য দেখতেন না। প্রাচীনকালে রোমে মার্সের বাৎসরিক উৎসবে স্যালির পুরোহিতরা ভক্তিমূলক গীত ও নৃত্য করতেন। ইহুদীদের ভেতরও মিরিয়াম ভক্তিমূলক গানের সঙ্গে নৃত্য করেছিলেন। এমন কি খৃষ্টানদের ভেতরও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। কার্পাস খৃষ্টি অক্টেভ ব্যালের দ্বারা সিভিল গির্জায় নৃত্যগীতের আয়োজন করা হত। এতে বারো থেকে সতের বছর পর্যন্ত বালকরা অংশ গ্রহণ করত। আমাদের ভারতবর্ষেও মন্দির কেন্দ্রিক নৃত্য প্রচলিত ছিল। সুতরাঃ এইভাবে বিচার করে আমরা দেখতে পাই যে, সমস্ত বিশ্বে নৃত্যের একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল। ধর্মই নৃত্যকে এই মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং সকল রকম অমঙ্গল থেকে রক্ষা করেছিল।

এ্যারিষ্টটল্ নৃত্যের সৌন্দর্যকে কাব্যের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের বিজয় কেতন দিকে দিকে জয়বার্তা ঘোষণা করল। মানুষের ধর্ম বিশ্বাসও শিথিল হয়ে এলো। ফলস্বরূপ ধর্ম থেকে নৃত্য

বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। সুতরাং সংযমের সেতুটি ভেঙ্গে পড়ল। নৃত্যের এই রূপ দেখে সমাজের বিভিন্ন সমালোচকরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। শরীর বিজ্ঞানীরা বললেন যে, নৃত্য হচ্ছে মানুষের দেহের পুঞ্জীভূত অতিরিক্ত শক্তির বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম। নৃত্য একটি সুন্দর ব্যায়াম। মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন, এর দ্বারা মানবিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায়। দার্শনিকরা বলেন নৃত্যের ভেতর দিয়ে পরমাত্মার প্রকাশ। নৃত্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। কিন্তু কোন বিশ্লেষণই কার্যকরী হয়ে নৃত্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত ধনী সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনের জন্যেই নৃত্যের অস্তিত্ব রয়ে গেল। মধ্যযুগে বিশ্বের সর্বত্রই নৃত্যের এইরকম পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয়।

মধ্যযুগে অভিজাত শ্রেণীর ভেতর বিলাস হিসেবে নৃত্যের প্রচলন হয়। উদাহরণস্বরূপ ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুইএর ব্যালেতে অংশ গ্রহণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সময়ে পাশ্চাত্ত্যে নৃত্য বিপুল জনসমাদর লাভ করে। যে সকল নৃত্য পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে তার ভেতর প্রাগের 'Polka' ব্যাভেরিয়ার 'Waltz, দক্ষিণ আমেরিকার 'Tango' প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। সামাজিক নৃত্য বলতে 'বলরুম' নৃত্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। এতে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের সান্নিধ্যলাভের অপার সুযোগ দেওয়া হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্যালে নৃত্য সমগ্র বিশ্বে খ্যাতিলাভ করে। নিঝিনিস্কি, পাভলোভা, কার্সাভিনা প্রভৃতি ব্যালে নর্তক-নর্তকী হিসেবে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

ভারতীয় নৃত্যের বিবর্তনও এইভাবে হয়েছে। আমি আলোচ্যগ্রন্থে ঐতিহাসিক পটভূমিতে ভারতীয় নৃত্যের বিভিন্ন স্তর অতিক্রমণ ও বিবর্তনের ইতিহাস বিবৃত করার চেষ্টা করেছি।

পিতামাতা ও স্বামীর অনুপ্রেরণায় গ্রন্থটি লিখতে আরম্ভ করি। বিশেষ করে আমার পিতার (স্বর্গীয় শ্রীসোমনাথ ভাদুড়ীর) প্রেরণা, উৎসাহ ও অভয়বাণীর কথা স্মরণ করে আমি শত শত বাধা সত্ত্বেও এই কাজে লিপ্ত হয়েছিলাম। আমার স্বামীর অকুণ্ঠ সহযোগিতায় এই কাজ আমার পক্ষে আর ও সহজ হয়ে ওঠে। স্বর্গীয় শ্রীবঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় বইটির আবয়বিক গঠন

সম্বন্ধে সদুপদেশ দিয়ে আমাকে বিশেষভাবে উপকৃত করেছিলেন। আমার কাকার (স্বর্গত শ্রীসদানন্দ ভাদুড়ী, ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ) কাছে কয়েকটি অমূল্য উপদেশের জন্যে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সংস্কৃত শিক্ষক স্বর্গীয় শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে। সংস্কৃত গ্রন্থগুলি থেকে অনুবাদ করতে, প্রুফ দেখতে এবং কোন কোন স্থানে ভাবগুলিকে পরিস্ফুট করতে তিনি আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন। ডি. এম. লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপানোর ব্যাপারে তাঁরা অকুণ্ঠভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। গুরু বিপিন সিং 'তাল' অধ্যায়ে মনিপুরী প্রাচীন তাল সম্বন্ধে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। তাঁর সাহচর্য ছাড়া এই অংশটি আমার পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। সর্বশ্রী গুরু নদীয়া সিং, গুরু গোবিন্দন কুট্টি, স্বর্গীয় গুরু মরুথাপ্পা পিল্লাইয়ের কাছে যথাক্রমে মণিপুরী, কথাকলি ও ভরতনাট্যম্ নৃত্যের আবয়বিক গঠন সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য পেয়েছি। আমার মণিপুরী নৃত্যের শিক্ষাগুরু শ্রীনদীয়া সিং মণিপুরী নৃত্য সম্বন্ধে দীর্ঘকাল আলোচনা করে আমাকে এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দিয়েছেন। রেখাঙ্কনে সাহায্য করেছেন শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ রায় ও শ্রীসুশীল সরকার। আমার পুত্র শ্রীমান চন্দনও হস্তভেদের কয়েকটি মুদ্রা অঙ্কিত করেছে। বালিকা শিক্ষা সদনের গ্রন্থাগারিকা শ্রীমতি মায়া বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে গ্রন্থাগারের বইগুলি ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে দিয়ে আমার বিশেষ উপকার করেছিলেন।

রবীন্দ্রভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য স্বর্গীয় শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট করে আমাকে যে ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন তাতে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। চারুকলা বিভাগের প্রাক্তন সর্বাধ্যক্ষ স্বর্গীয় শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহানুভূতি ও উৎসাহ আমাকে বিশেষ প্রেরণা দিয়েছিল। গ্রন্থটিতে অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল ত্রুটি রয়ে গিয়েছে যা বিশেষ সতর্কতা সত্ত্বেও আমি এড়াতে পারি নি। আশা করি, পাঠকরা নিজগুণে ত্রুটিগুলি ক্ষমা করবেন।

সূচীপত্র

নৃত্যের ইতিহাস

"সর্বশাস্ত্রার্থসম্পন্নং সর্বশিল্প—প্রবর্ত্তকম্ ।
নাট্যাখ্যং পঞ্চমং বেদং সেতিহাসং করোম্যহম্ ।"

নৃত্যের ইতিহাস

ভারতের মাটির অনুতে অনুতে নৃত্যের ছন্দ দোলা দেয়। বিভিন্ন জাতির সমাবেশ, বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণ এবং বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও দেশবাসীর সঙ্গীতপ্রিয়তা আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। কিছুমাত্র কমে নি, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। চারুকলা সম্বন্ধে বহু গবেষণা চলেছে, ফল স্বরূপ বর্তমানযুগে বহু কলেজ; বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে এবং এই সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের অক্লান্ত চেষ্টায় গবেষণার কাজও অগ্রসর হচ্ছে।

প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত নৃত্যকলা সম্বন্ধে কোন ধারাবাহিক ইতিহাস হয় তো আমরা পাবো না। কিন্তু এর উপাদান সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। পাথরের গায়ে, শিলালিপি, তাম্রফলক, গুহা শিল্প, ভাস্কর্য, সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি ও পাথরের বাদ্যযন্ত্রগুলি নিশ্চল ও নীরব ভাষায় শতাব্দীর সাক্ষ্য বহন করে আসছে। এগুলি কেবলমাত্র দেখে, অনুভব করে এবং তাদের ঐতিহাসিক মূল্য নির্ধারণ করে এবং তার সঙ্গে প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রগুলি ও ঐতিহাসিক নৃপতিদের কাজের সাংস্কৃতিক পরিচয় নিয়ে নৃত্যের ইতিহাস রচনা করা যেতে পারে। সুতরাং ইতিহাস সম্পূর্ণ নির্ভুল না হলেও নৃত্যের ইতিহাসের একটি ধারাবাহিকতা রক্ষা করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ—ভারতের ইতিহাস রচনার কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সময়কে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নাম করা যেতে পারে। এই যুগের অন্তর্গত হচ্ছে প্রস্তরযুগ, ধাতুযুগ, সন্ধুনদের সভ্যতা ইত্যাদি। এই যুগের বিস্তৃত ঐতিহাসিক বিবরণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। সুতরাং এই যুগের নৃত্যের ইতিহাসও বিস্মৃতির কোন অতলে তলিয়ে আছে।

আমরা যা কিছু সেই যুগের ঐতিহাসিক উপাদান পেয়েছি তাই দিয়ে মানশ্চক্ষে একটা ছবি এঁকে নিতে পারি। প্রস্তরযুগে মানুষের আদিম উল্লাসের

প্রকাশ ছিল নৃত্য। সে নৃত্য কোন শাস্ত্র মানত না, কোন নিয়মশৃঙ্খলা মানত না; অর্থাৎ তাল, লয় বা সুঠাম ও শৃঙ্খলাবদ্ধ অঙ্গভঙ্গী প্রকাশের জন্য কোনও নিয়মশৃঙ্খলা ছিল না অথবা কোন সৌন্দর্যবোধও ছিল না। ছিল শুধু ছন্দে ছন্দে প্রাণের উল্লাস ও মনের বৃত্তিগুলিকে প্রকাশের অদম্য ইচ্ছা। কোন ভাষা ছিল না, কোন গান ছিল না, ছিল শুধু অভিব্যক্তি। এইভাবে প্রকৃতির কোলে খেয়ালখুশীর শিকার ভাষাহীন অসহায় মানুষ নিজের মনোবৃত্তিকে প্রকাশ করত আঙ্গিক ক্রিয়ার মাধ্যমে। একেই বলা যায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম নৃত্যের আদিম অবস্থা। সুতরাং আমরা সহজেই বলতে পারি যে, নৃত্য হচ্ছে মানুষের স্বভাবজাত বৃত্তির আঙ্গিক প্রকাশ।

সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের অভিব্যক্তি প্রকাশের ভঙ্গিরও পরিবর্তন হয়েছে। ভারতবাসী যে চিরকাল নৃত্যকলাকে বিশেষ ভালবেসেছে এবং প্রাধান্য দিয়েছে তা অতি সহজেই অনুমেয়। সিন্ধুনদের উপত্যকায় মহেঞ্জদরো ও হরপ্পায় যে সকল ভগ্নস্তূপ পাওয়া গিয়েছে তার ভেতর একটি নর্তক ও একটি নর্তকীর মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে। এ ছাড়া সাতটি ছিদ্র যুক্ত বাঁশী, তন্ত্রীযুক্ত বীণা, বিভিন্ন চামড়ার বাদ্যযন্ত্রও পাওয়া গিয়েছে। সেই যুগের সঙ্গীতবিষয়ে এর বেশী কিছু জানা যায় নি। তবে নৃত্যের সঙ্গে যে বাদ্যযন্ত্র বাজাবার প্রচলন ছিল তা সহজেই অনুমেয়। তবে এইটুকু বোঝা যায় যে, সেই যুগের অধিবাসীরা সঙ্গীতপ্রিয় ছিল। এরা ছিল শঙ্কর ও কালীর উপাসক। শুধু তাই নয়, উত্তর পশ্চিম ভারতে বহু প্রাচীন নাগজাতি বাস করত। এরা বৃক্ষ ও শিবের উপাসনা করত। মহেঞ্জোদড়োর শীলমোহরে বৃক্ষকে আবেষ্টন করে নাগদম্পতীর উৎকীর্ণ মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। সেই যুগে বৃক্ষ, সর্প, জীবজন্তু পূজার প্রচলনও ছিল।

দ্রাবিড় যুগ—ভারতের আদিবাসী সাঁওতাল, কোল, ভীল, মুণ্ডাদের প্রস্তর-যুগের মানবের বংশধর বলে মনে করা হয়। যদিও পৃথিবীর বিবর্তনের সঙ্গে আকৃতি ও প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন হয়েছে তবুও অনেক বিষয়ে অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

এঁদের নৃত্যকে মনোবৃত্তির স্বতঃস্ফূর্ত আঙ্গিক বহিঃপ্রকাশ বলা যায়। সিন্ধুনদের উপত্যকায় মহেঞ্জদরো ও হরপ্পায় যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তাকে দ্রাবিড় সভ্যতার অন্তর্গত করেছেন ঐতিহাসিকরা। সুতরাং দ্রাবিড়যুগের

নৃত্যকলা সম্বন্ধে কোন অনুমানই চলে না। তবে এইটুকু অনুমান করা কঠিন নয় যে, নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গীত সহযোগিতা করত এবং পায়ে মল জাতীয় গহনা তাল রক্ষা করত। নৃত্যের সাহায্যে দেবদেবীরও পুজো হত। এর সাক্ষ্য দেয় শঙ্কর এবং অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তিগুলি। দ্রাবিড়দের সঙ্গীত, শিল্পকলা ও চিত্রকলার প্রতি আসক্তি দেখে মনে হয় তাঁরা শিক্ষায় উন্নত ও সভ্য ছিলেন। পাশ্চাত্যবাসীরা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসিরা উদ্দীপ্ত, ভাবপ্রবণ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বটে, কিন্তু বর্ণ ও সৌন্দর্যের উপাসক। অবশ্য এ কথা শুধু ভারতের ক্ষেত্রে নয়, ভারতের সমসাময়িক মেসোপটেমিয়া ও সুমের সভ্যতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সেই যুগে যে এইসকল দেশেও নৃত্যের ব্যাপক প্রচলন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দেখা গিয়েছে, যে দেশে সভ্যতা উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল, সেই দেশে শিল্পকলার চর্চা এবং সঙ্গীতপ্রিয়তাও প্রবল ছিল। শুধু তাই নয়, অধিবাসিরাও উন্নত নাগরিক জীবন অতিবাহিত করতেন।

বৈদিক যুগ :—

এর পরবর্তী যুগকে আমরা বৈদিক যুগ বলে অভিহিত করতে পারি। খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর পূর্বে আর্যরা ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে পাঞ্জাবের নিকটবর্তীস্থানে দাবিড় সভ্যতাকে ধ্বংস ও বিতাড়িত করে বসতি স্থাপন করেন। সেই সময় আর্য ও অনার্যদের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের ইতিহাস আমরা প্রাচীন কাব্যে, মহাকাব্যে ও পুরাণ প্রভৃতিতে পাই। এমন কি প্রথম যে নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল তার বিষয়বস্তুও ছিল দেবাসুরের যুদ্ধ। দেবতা ও দানবরাই যথাক্রমে আর্য ও অনার্য বলে অভিহিত হতেন। অবশ্য পরবর্তী যুগে আর্য ও অনার্য সভ্যতা এমন পরস্পর মিশে গিয়েছিল যে, এর প্রভেদ নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। 'দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা'য় এর সুন্দর ব্যাখ্যা আছে—"বৈদিক যুগের শেষভাগে সূত্রের যুগে ভারতে মূর্তি পূজার সূত্রপাত হয়। অনার্য প্রভাবিত ব্রাহ্মণ্য ভারতে তাহার বিকাশ ও বিস্তার। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে শিল্পের পর্যায়ে তক্ষণ ও ধাতুমূর্তি, কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত এবং নৃত্যকেই বুঝাইত" (পৃঃ ২৩)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ প্রণেতা মহর্ষি ঐতরেয়ের কল্যাণে আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মিলনে চৌষট্টি কলার সৃষ্টি হয়েছিল। যাই হোক, এই সময় আর্যরা বেদের সংস্কার করেন। এই বেদ ভারতবাসীর জীবনে

সঞ্জীবনী সুধার কাজ করেছে। 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতিতে' স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেছেন—
,'ভারতীয় শিল্প ও মাধুর্যের বিকাশের পেছনে আছে সুপ্রাচীন বেদ ও উপনিষদের সাহিত্যের প্রেরণা।" বেদের দর্শন ভারতীয়দের কর্মে প্রেরণা জাগিয়েছে, শান্তির বাণী শিখিয়েছে, সৌন্দর্যের উপাসক করেছে এবং শিল্প ও সঙ্গীতের জ্ঞান দিয়েছে। বৈদিক যুগের সঙ্গীত পরবর্তী যুগের সঙ্গীতে প্রেরণা জাগিয়েছে।

বেদ থেকে যে সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছে এ কথা প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রগুলি থেকে আমরা জানতে পারি। সঙ্গীতবিষয়ে আলোচনা করতে গেলে বেদের সম্বন্ধেও সাধারণ জ্ঞান থাকা উচিত। বেদ চারটি ভাগে বিভক্ত—ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব। প্রত্যেক বেদের চারটি অংশ—(১) মন্ত্র অথবা সংহিতা (২) ব্রাহ্মণ (৩) আরণ্যক ও (৪) উপনিষদ। সংহিতাতে দেবতাদের স্তুতি করে মন্ত্র আছে, অর্থাৎ বৈদিক ঋক্ এর সঙ্কলন করা হয়েছে। ব্রাহ্মণে কর্মকাণ্ডের উল্লেখ আছে আরণ্যকে দার্শনিক তথ্যের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং উপনিষদে আত্মজ্ঞানের কথা আছে। বেদের এই সকল শাখাগুলিকে শিক্ষার জন্য যে ব্যাকরণের সৃষ্টি হয়েছিল তাকে প্রাতিশাখ্য বলে। ছন্দোগ্য উপনিষদে গান, বাদ্য ও নৃত্যের উল্লেখ আছে। প্রাতিশাখ্যে তাল, লয়, মাত্রা ও ছন্দ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। চারটি বেদ থেকে সারাংশ গ্রহণ করে ভারতীয় সঙ্গীতের সৃষ্টি। সঙ্গীতের উৎপত্তি সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রে আছে যে, সত্যযুগ অতীত হবার পর ত্রেতাযুগের আরম্ভে জনগণ অধর্ম আচরণের ফলে দুঃখ পাচ্ছে দেখে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা পিতামহ ব্রহ্মাকে প্রধানতঃ শূদ্র ও স্ত্রীলোকদের শিক্ষার জন্য পঞ্চমবেদ সৃষ্টি করতে অনুরোধ করেন। কারণ বেদ অধ্যয়নে শূদ্র ও স্ত্রীগণের অধিকার ছিল না। তদনুসারে ব্রহ্মা ঋক্‌বেদ থেকে পাঠ্য ; সামবেদ থেকে গান, যজুর্বেদ থেকে অভিনয় এবং অথর্ব বেদ থেকে রস গ্রহণ করে নাট্যবেদ সৃষ্টি করলেন।

"জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎসামভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসা নাথর্বণাদপি ॥

(নাট্যশাস্ত্র, ১ম অধ্যায়, শ্লোক ১৭)

এই নাট্যবেদই পঞ্চমবেদ বলে অভিহিত হল এবং এতে সর্বজনের সমান অধিকার থাকল। সুখভোগে অভ্যস্ত দেবগণ নাট্যবেদের গ্রহণ, ধারণ ও জ্ঞান প্রয়োগে অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় ইন্দ্র এ বিষয়ে ঋষিদের উপযুক্ততার উল্লেখ করেন—

"গ্রহণে ধারণে জ্ঞানে প্রয়োগে চাস্য সত্তম্
অশক্তা ভগবন্ দেবা অযোগ্যা নাট্যকর্মনি

(নাঃ শাঃ-১ম অধ্যায়, শ্লোঃ-২২)

এ কথা শুনে ব্রহ্মা ভরতমুনিকে নাট্যবেদের প্রথম উপদেশ প্রদান করেন এবং ভরত মুনি ব্রহ্মার আদেশে তাঁর শতপুত্রকে এই শিক্ষা দেন। আত্রেয় প্রভৃতি মুনিদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে ভরত উপরোক্ত কাহিনীটি বিবৃত করেন। তিনি একাধারে দেবতাদের মঞ্চাধ্যক্ষ, নাট্যকার, ত্রৈয়ত্রিক ও সূত্রকার ছিলেন। ভরত তাঁর শিষ্যদের দ্বারা এই নৃত্য মর্তে প্রচার করেন। নাট্যোৎপত্তি সম্বন্ধে অভিনয়দর্পনে বলা হয়েছে যে চতুর্মুখ ব্রহ্মা ভরতকে নাট্যবেদ প্রদান করেছিলেন। মুনি ভরত গন্ধর্ব অপ্সরা সহ শম্ভুর সম্মুখে নাট্য, নৃত্ত ও নৃত্যের প্রয়োগ করেছিলেন। অনন্তর হর স্বপ্রযুক্ত হয়ে উদ্ধত প্রয়োগ স্মরণ করে স্বগণের অগ্রণী তণ্ডুর দ্বারা আচার্য ভরতকে তা শিক্ষা দেন এবং প্রীতিবশতঃ পার্বতীর দ্বারা লাস্যের উপদেশ প্রদান করেছিলেন। অভিনয়দর্পণের ২।৩।৪ নম্বর শ্লোকে আছে—

"নাট্যবেদং দদৌ পূর্ব্বং ভরতায় চতুর্মুখঃ।
ততশ্চ ভরতঃ সার্দ্ধং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণৈঃ ॥২
নাট্যং নৃত্তং তথা নৃত্যমগ্রে শম্ভোঃ প্রযুক্তবান্।
প্রয়োগমুদ্ধতং স্মৃত্বা স্বপ্রযুক্তং ততো হরঃ।৩
তণ্ডুনা স্বগণাগ্রণ্যা ভরতায় ন্যদীদিশৎ।
লাস্যমস্যাগ্রতঃ প্রীত্যা পার্ব্বত্যা সমদীদিশৎ।৪

অনন্তর তণ্ডুর কাছ থেকে তাণ্ডবের জ্ঞান লাভ করে ভরতাদি মুনিরা মর্ত্যের মানবদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। পার্বতী বানাসুরের দুহিতা ঊষাকে লাস্য শিক্ষা দেন। আর ঊষা দ্বারাবতী বা দ্বারকার গোপীদের, গোপীরা সৌরাষ্ট্রদেশের নারীদের ও তাঁরা আবার নানাদেশের রমণীদের এই বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন। এইভাবে তাণ্ডবলাস্যাত্মিকা নর্তনকলা পরম্পরাক্রমে ইহলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুতরাং সঙ্গীতের মূল যে বেদে নিহিত আছে এ আমরা প্রাচীন সঙ্গীত-শাস্ত্রগুলিতে দেখতে পাচ্ছি। অভিনয়দর্পণে আছে—

"ঋগ্‌যজুঃসামবেদেভ্যো বেদাচ্চাথর্বণঃ ক্রমাৎ ॥৭
পাঠ্যং চাভিনয়ং গীতং রসান্‌ সংগৃহ্যপদ্মজঃ।
ব্যরীরচ্ছাস্ত্রমিদং ধর্মকামার্থমোক্ষদম্‌ ॥৮

অভিনয় দর্পণ (৮)

ঋক্‌, যজুঃ, সাম ও অথর্ব বেদ থেকে যথাক্রমে পাঠ্য; অভিনয়, গীত ও রস সংগ্রহ করে পদ্মযোনি ধর্মকামার্থ মোক্ষপ্রদ এই শাস্ত্র রচনা করেছিলেন। নাট্য-শাস্ত্রেও ঠিক একই কথা বলা হয়েছে।

এইটুকু বোঝা যায় যে প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের মূল উপাদান বেদ থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

এ ছাড়া আরও কিছু বিচ্ছিন্ন উপাদান পাওয়া যায় যাতে প্রমাণিত হয় যে বৈদিকযুগেও নৃত্যের ব্যাপক প্রচলন ছিল। যজ্ঞের সময় উদ্গাত্রীরা পরস্পর সংলগ্ন হয়ে যজ্ঞবেদী পরিভ্রমণ করতেন। অনেকসময় পুরনারীরা এই পরিক্রমণে যোগদান করতেন। শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞানানন্দ স্বামী একে সমবেত নৃত্যের প্রথম সূত্রপাত বলেছেন।

বৈদিক যুগে মুনি ঋষিরা যজ্ঞমণ্ডপ নির্মাণ করে হোম করতেন। গগনস্পর্শী অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠত। উদাত্ত কণ্ঠে সুরের লহরী তুলে তাঁরা দেবতার স্তুতি করতেন। কখনও পাঠ্যে, কখনও সঙ্গীতে, কখনও স্বর্গীয় রসধারায় প্লাবিত হয়ে তাঁরা বেদগান করতেন। ব্রাহ্মণ সাহিত্যগুলিতে আছে যে, সামগরা যখন গান করতেন তখন পুরনারীরা করতালি দিয়ে নৃত্য করতেন। সামগদের গানের সঙ্গে নর্তকরা বংশদণ্ড উন্নত করে নৃত্য করতেন। যজ্ঞাদি উৎসবের পর অবভৃথ স্নান নামে একটি উৎসব হত। এই উৎসবে রাজা ও রানীর সঙ্গে পুরুষ ও নারী উভয়েই নৃত্য করতেন।

বৈদিকযুগে সঙ্গীতের মধ্যে একটি স্বতঃস্ফূর্ত ভাব দেখা দিল। তার কারণ আর্যরা প্রকৃতির আশ্চর্যলীলা অন্তরে অনুভব করেছিলেন। তাঁদের মতে মহা-শক্তির অমিততেজ গভীর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। তাঁরা ঘোষণা করলেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব শক্তি এবং সব দেবদেবী পরমপিতা পরমব্রহ্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন। সৌরমণ্ডলের প্রধান প্রধান দেবতা সূর্য, বৃষ্টি, বজ্র, ও ইন্দ্র প্রভৃতি পরমব্রহ্মের বিকাশ। সেইজন্য অগ্নিদেবকে পরিক্রমা করে অথবা করতালি দিয়ে অথবা বংশদণ্ড উন্নীত করে নৃত্যের প্রচলন হ'ল।

মহাকাব্যের যুগের সমাজব্যবস্থায় নৃত্য :—

মহাকাব্যের যুগে বৈদিকযুগের সামাজিক ব্যবস্থা ও ধর্মসংক্রান্ত পরিবর্তন সুরু হয়ে গিয়েছিল। বৈদিক সনাতন ধর্ম হিন্দুধর্মে পরিণত হতে আরম্ভ করেছিল এবং আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মিলনও সুরু হয়ে গিয়েছিল। শ্রী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবায়তন ও ভারতসভ্যতাতে' আছে যে "এই সময় হইতে যক্ষ-যক্ষী, মনসা প্রভৃতির উদ্ভব হয়। ধর্মক্ষেত্রে উভয়জাতির মিলনের ফলে হিন্দু জাতি ও সভ্যতার উন্মেষ। আর্য ও অনার্য সংস্কৃতি ও শিল্পের মিলনের ফলে হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের উন্মেষ।" এই সকল স্থাপত্যশিল্প নৃত্যের ইতিহাস রচনায় অমূল্য সম্পদ। সিন্ধু দ্রাবিড় সভ্যতার সঙ্গে অসুর অর্থাৎ অষ্ট্রিক ও বৈদিক সভ্যতার মিলনের ফলে রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদের সৃষ্টি এবং যজ্ঞ ও পুজোর প্রচলন হয়েছিল। মহাকাব্যের যুগে বৈদিকযুগের প্রাকৃতিক দেবতাদের পরিবর্তে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতাদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। মহাকাব্যের যুগে রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতিতে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রে কুশীলবের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'বিদগ্ধমাধব' নাটকে কুশীলবের অর্থ করা হয়েছে নট অথবা চারণ। 'কুশীলব' কথাটি রামায়ণে বর্ণিত শ্রীরামচন্দ্রের যমজ পুত্র কুশ ও লবের নামের থেকে এসেছে। কুশ ও লব মহাকবি বাল্মিকীর অমর কাব্য রামায়ণকে সঙ্গীত, আবৃত্তি ও অভিনয়ের সাহায্যে অযোধ্যার রাজসভায় শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে নিবেদন করেছিলেন এবং এই অমৃতধারা প্রত্যেক শ্রোতার হৃদয় দ্রবীভূত করেছিল। রামায়ণে অপ্সরা ও কিন্নর কিন্নরীদের নৃত্যের উল্লেখ আছে। মহাভারতেও নৃত্যের বহু উল্লেখ আছে। মহাভারতে এবং হরিবংশে হল্লীসক ছালিক্য প্রভৃতি নৃত্যের উল্লেখও আছে। দেবরাজ ইন্দ্রের নৃত্যসভার সুন্দর বর্ণনা আছে এবং এই নৃত্যসভায় অপ্সর-অপ্সরা কিন্নর-কিন্নরী প্রভৃতির নৃত্য-প্রদর্শনের উল্লেখও আছে। উর্বশী, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরারা দেবসভার যশস্বী নৃত্যশিল্পী ছিলেন। মহাভারতে নপুংসক বৃহন্নলা কর্তৃক রাজকন্যা উত্তরাকে নৃত্য শিক্ষা দেবার বর্ণনা আছে। অবসর বিনোদনের জন্য তৎকালীন দেবতা ও রাজামহারাজরা যে সঙ্গীতের রসসুধা পান করতেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

পরবর্তী যুগে রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় সঙ্গীতের স্থান—

মহাকাব্যের যুগের পর ভারতের এক যুগ সন্ধিক্ষণ। এই সময় সমগ্র ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কাশী, কোশল, মগধ, বিদেহ প্রভৃতি রাজ্যগুলি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জল দৃষ্টান্ত। পূর্বদিকে অঙ্গ,[১] বঙ্গ, পুণ্ড্র[২] প্রভৃতি রাজ্যগুলি প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। সেই মহাসন্ধিক্ষণে সমাজসংস্কারক, ধর্মসংস্কারক, দার্শনিক ও চিন্তাবীরদের অবির্ভাব ঘটে। ধর্মসংস্কার, দর্শন প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গীতও একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। এই সময় যদিও ধর্মযুদ্ধ তুঙ্গে উঠেছিল তবুও সঙ্গীত সকল ধর্মেই প্রিয় ছিল। হিন্দু ধর্মে এবং বৌদ্ধ ধর্মে সঙ্গীত বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। তবে প্রথম পর্বে হিন্দুধর্মে প্রতাপ, যাগযজ্ঞ ও পশুবলি বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত যেন সমাজ থেকে পৃথক হয়ে পড়ল। ব্রাহ্মণরা কোমল মানবিক বৃত্তিকে দমন করে কেবলমাত্র শুষ্ক আচারবিচার নিয়ে সঙ্গীতকে অপাংক্তেয় করে তুললেন। ললিত কলার উৎস হচ্ছে সুকুমার বৃত্তি ও সৌন্দর্যবোধ। যখনই এক বিশেষ শ্রেণীর ভেতর এর অভাব হল, তখনই সেই স্থান থেকে সঙ্গীতদেবী নির্বাসিতা হলেন। মনুসংহিতায় মনু স্পষ্টই বলেছেন যে, সঙ্গীত ব্রাহ্মণদের জন্যে নয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল বৌদ্ধধর্ম। ব্রাহ্মণ্যধর্মের হিংসার বিরুদ্ধে, নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ধর্মের ক্ষেত্রে ও শাসনের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন এনেছিল। এই সময় রাজনীতি ও সমাজে একটি প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হলেও সঙ্গীতের প্রতিপত্তি অপ্রতিহত থাকল এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেল।

জাতকে নৃত্য :—

বৌদ্ধসাহিত্য "জাতকে"ও সঙ্গীতের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মে জাতকের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। জাতকে বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মের ইতিহাস পাওয়া যায়। এই জাতকগুলি তৎকালীন সমাজব্যবস্থা, কৃষ্টি প্রভৃতির ওপর আলোক পাত করে। নৃত্যজাতকে আছে যে, নৃত্যের ছন্দপতন হওয়াতে ময়ূর হংসরাজ কন্যার স্বামী হতে পারল না। এছাড়া মৎসজাতক, গুত্তিল জাতক, ভেরীবাদক জাতক, ইত্যাদিতে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয়ের উল্লেখ আছে। জাতক থেকে এই রকম প্রমাণও পাওয়া যায় যে, সেই সময় নৃত্য

১। বিহার, ২। উত্তর বাংলা

ও গীতের প্রতিযোগিতা হত। কিন্নর কিন্নরী, অপ্সর অপ্সরা, নট-নটী, দেবদাসী প্রভৃতি নৃত্যগীত ও বাদ্যপটীয়সীদের কথা সেই যুগের সাহিত্যে বিশেষ স্থানলাভ করেছিল। আমরা আম্রপালি প্রভৃতি নটীদের কথা জানতে পারি যারা সামাজিক পীড়নে নটীজীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের উদ্ভবে তারা নটীজীবন ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। থেরীগাথা অথবা থেরগাথাতে নৃত্যগীতের উল্লেখ আছে। জাতকে নটীদের জীবনী নিয়ে বহু কাহিনী আছে। অবদানশতকে নটী শ্রীমতি, বোধিস্বত্ববদান কল্পলতায় নটী বাসবদত্তা, মহাবস্ত্ববদানে সুন্দরী প্রধানা শ্যামার উল্লেখ আছে। সঙ্গীত এই সময় একটি বিশেষ শ্রেণীর ভেতর প্রচলিত ছিল এবং তারা নট-নটী আখ্যা লাভ করেছিল। অর্থাৎ বৃত্তি হিসাবে সঙ্গীতকে যারা গ্রহণ করেছিল তারাই নট নটী আখ্যা পেয়েছিল।

এই যুগে সঙ্গীত যে প্রচলিত ছিল তার আরও কতকগুলি প্রমান পাওয়া যায়। পাণিনির ব্যাকরণে সঙ্গীত শাস্ত্রকার শিলালি ও কৃশাশ্বের নাম পাওয়া যায়। এঁরা নটশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। সঙ্গীত এঁদের পেশা ছিল। পণ্ডিত বুলহারের মত অনুযায়ী পাণিনি খৃঃ পূঃ ৪০০ বৎসর পূর্বের লোক ছিলেন। ভাষ্যকার পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে 'কংসবধ' ও 'বালিবধ' নামে দুটি নাটকের উল্লেখ করেছেন। এতে নৃত্যগীতের উল্লেখ আছে। সুতরাং নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অভিনয়ের বহুল প্রচার না থাকলে সঙ্গীত তদানীন্তন কালের সাহিত্যে ও ব্যাকরণে স্থান পেত না। পতঞ্জলির উদ্ভবকাল অনুমান করা হয় খৃঃ পূঃ ৩য় শতকে। পণ্ডিতরা বৌদ্ধধর্মের উদ্ভবকাল ধরেছেন খৃঃ পূঃ ছয় শতকে।

প্রাচীন ভারতে সঙ্গীতের প্রসার—

সঙ্গীত অথবা গীত, বাদ্য, নৃত্য এবং নাট্য যে ভারতের প্রায় প্রতি স্থানেই প্রচলিত ছিল এর প্রমাণ আমরা বহু ক্ষেত্রেই পাই। প্রাচীনকালে উত্তর ভারত অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এগুলিকে মহাজনপদ বলা হত। এই দেশগুলি হচ্ছে কাম্বোজ, গান্ধার, পাঞ্চাল, কুরু, সুরসেন, মৎস, কোশল, কাশী, মগধ, অঙ্গ, বৎস, চেদি, অবন্তী, অস্মক, বজ্জী ও মল্ল। এর ভেতর কয়েকটি জনপদ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। গান্ধার দেশ সঙ্গীতের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এ ছাড়া নাট্যশাস্ত্রে দেশাচার হিসেবে

চার রকমের অভিনয়ের ধারা বর্ণিত আছে। নাট্যশাস্ত্রে বৃত্তি ও প্রবৃত্তির দ্বারা আচার্য ভরত বিভিন্নদেশের পদ্ধতি ও দেশাচার বুঝিয়েছেন। এর দ্বারা আমরা অনুমান করতে পারি যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সঙ্গীত ও নাট্যের প্রচলন ছিল। ভরত দেশাচার হিসেবে নাট্যের ভাগ করেছেন। অর্থাৎ নাট্য বা সঙ্গীত বিভিন্নস্থানের বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করেছে এবং দেশাচার হিসেবে তাদের নামকরণও করা হয়েছে, যথা—দাক্ষিণাত্য, আবন্ত, ঔড্রমাগধী ও পাঞ্চাল মধ্যম। ভারতের দক্ষিণপূর্ব ও দক্ষিণ পশ্চিম অংশের অন্তর্গত কোশল, কলিঙ্গ, দ্রাবিড় এবং মহারাষ্ট্র প্রথম ধারাটি, মধ্য ও পূর্বাংশের অন্তর্গত অবন্তী, বিদিশা, সৌরাষ্ট্র, মালয় দ্বিতীয় ধারাটি, অঙ্গ, বঙ্গ, বৎস, মগধ, পুণ্ড্র, নেপাল, অন্তগিরি, বাহিরগিরি, মল্লবর্ষ, ব্রহ্মহত্র, প্রাগজ্যোতিষপুর, বিদেহ ও তাম্রলিপ্তের অধিবাসিরা তৃতীয় ধারাটি এবং পাঞ্চাল, সুরসেন, কাশ্মীর, হস্তিনাপুর, বল্হীক ও মদ্র চতুর্থ ধারাটি অনুসরণ করত। এ ছাড়া নাটকে আরও পাঁচরকম অন্ত্যজ জাতির ভাষা ব্যবহৃত হত; যথা—সবরী, আভরী, চাণ্ডালী, শকারী এবং দ্রাবিড়ী। সুতরাং সঙ্গীতের প্রসার যে সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে ছিল সে বিষয় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

প্রাচীন ভারতীয় রাজাদের সঙ্গীতপ্রীতি :—

মগধ রাজ্যটি সর্ববিষয়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। খৃঃ পূঃ ৩২০ থেকে ১ম শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মৌর্য রাজারা রাজত্ব করেন। এইসময় বহু থের থেরীদের গাথা রচিত হয় এবং তাতে নৃত্যগীতের প্রচুর উপাদান পাওয়া যায়। মৌর্যদের শেষ রাজা অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য দেশবিদেশে ধর্ম-

---

প্রাচীন ভারতের ভৌগলিক বিবরণ :—গান্ধার—আফগানিস্থান, দক্ষিণাপথ—দাক্ষিণাত্য, কোশল—অযোধ্যা থেকে বারাণসীর উত্তর পর্যন্ত. দ্রাবিড়—দাক্ষিণাত্য মহারাষ্ট্র—বোম্বাই প্রদেশ, অবন্তী—আধুনিক উজ্জয়িনী, বিদিশা—আধুনিক বেরার সৌরাষ্ট্র—গুজরাট, মালয়—উজ্জয়িনীর পূর্বপ্রান্ত, মগধ—বিহার, পুণ্ড্র—উত্তর বাংলা অন্তগিরি ও বাহিরগিরি—উড়িষ্যা, মল্লবর্ষ—মালদহ, প্রাগজ্যোতিষপুর—কামরূপ, বিদেহ—প্রাচীন মিথিলা, তাম্রলিপ্ত—মেদিনীপুর জেলার তমলুক, পাঞ্চাল—মিরাট জেলা, সুরসেন—মথুরা জেলা, মদ্র—মাদ্রী, বল্হীক—ব্যাকট্রিয়ার প্রদেশসমূহ, বৎস—অযোধ্যার অন্তর্গত কৌশিম্বী রাজধানী।

প্রচারক প্রেরণ করেন। এর ফলে ভারতের বাইরে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিনিময় সম্ভবপর হয়েছিল।

মৌর্যবংশের পর শুঙ্গবংশীয়রা রাজত্ব করেন। এঁদের রাজত্বকালে সঙ্গীত চর্চা অব্যাহত ছিল। শুঙ্গবংশীয় রাজারা ২নং সাঁচীস্তুপের নির্মাণ শুরু করেন এবং এর পরবর্তী কাম্ববংশীয় রাজাদের সময় ব্যবহৃত নির্মিত হয়।

দক্ষিণের সাতবাহন বংশ ভারতীয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন। ভরতনাট্যম নৃত্যের ইতিহাসে এঁদের একটি মুখ্য ভূমিকা আছে।

উত্তরভারতেও এই সময় কিছু পরিবর্তন হতে থাকে। য়ুনীয়ন, শক, হুন ও পার্থিয়ানরা একে একে উত্তরভারত আক্রমণ করতে থাকেন এবং কিছুকালের জন্য রাজত্বও করেন।

এরপর চীনের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত থেকে ইউচীরা ভারতে প্রবেশ করে রাজত্ব করেন। এঁরা কুষাণ বংশীয় বলে পরিচিত। কুষাণবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কণিষ্ক সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। বিদেশী হয়েও তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এঁরই সময় অশ্বঘোষ, নাগার্জুন প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার ছিলেন।

এরপর গুপ্তযুগের সূচনা। ৩২০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৪৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গুপ্তযুগের উল্লেখযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায়। গুপ্তযুগের প্রথমার্ধ ঐশ্বর্যে, শিল্পে, সংস্কৃতিতে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিল। সেই সময় সঙ্গীতের যে বিশেষ প্রসার ছিল তা তৎকালীন মুদ্রা, ভাস্কর্য ও সাহিত্য থেকে জানা যায়। সমুদ্রগুপ্তে সময় সমাজে স্ত্রী ও পুরুষরা স্বাধীনভাবে নৃত্যগীতের চর্চা করতে পারতেন। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ও সঙ্গীত সমাজে বিশেষভাবে আদৃত হত। ফাহিয়েনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে গুপ্তযুগের শিল্প ও সংস্কৃতির বিবরণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে সপ্তম অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে বহু গুণী, জ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই সময় পৃথিবী বিখ্যাত অজন্তা, ইলোরার গুহাগুলি নির্মিত হয়।

গুপ্ত রাজত্বের সময় হূণদের আক্রমণ সুরু হয়েছিল। এই সব বৈদেশিক আক্রমণ ভারতীয় ইতিহাসের পটভূমিতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তন এনেছিল। উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যের

আলোচনাকালে দেখা যায় যে ভারতের এই দুই অঞ্চলের মধ্যে ধীরে ধীরে সাংস্কৃতিক ব্যবধান গড়ে উঠেছিল। এর কারণ উত্তরভারত বার বার বৈদেশিক শক্তির দ্বারা পর্যুদস্ত হয়েছে।

এরপর থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের উদ্ভব হয়। পুষ্যভূতি রাজা হর্ষবর্ধনের সময় নৃত্যগীতের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল। সম্রাট নিজেও নাট্যরসিক ছিলেন। তাঁর লিখিত রত্নাবলী ও নাগানন্দ দুটি উল্লেখযোগ্য নাটক। হর্ষবর্ধনের পিতা প্রভাকরবর্ধন সঙ্গীত ও ললিতকলার একান্ত অনুরাগী ছিলেন। থানেশ্বরের রাজপ্রাসাদে প্রমোদগৃহ, প্রেক্ষাগৃহ, প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল এবং নট, নটী, সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতি গুণিগণ রাজসভা অলঙ্কৃত করে থাকতেন।

অনেক ঐতিহাসিকদের মতে হুণদের পরবর্তী আক্রমণকারী গুর্জর ও প্রতিহার। এঁদের বংশোদ্ভব ছিলেন রাজপুতরা। রাজপুতদের বাসস্থান রাজস্থানে কথক নৃত্যের বহুল প্রচলন ছিল। ১০২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সূর্যবংশীয় চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজপুত রাজারা উত্তরভারতে রাজত্ব করেছিলেন। রাজপুতানার রাজাদের যশোগাথা এবং তাঁদের বীরত্বের কাহিনী ভাট চারণরা জনসাধারণকে গেয়ে শোনাতেন।

ভাস্কর্যে নৃত্য—

ভারতীয় নৃত্যকলা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করতে হলে অথবা ইতিহাস জানতে হলে প্রাচীন গুহাশিল্প, মন্দিরভাস্কর্য, চিত্রশিল্প ও প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রগুলির মধ্যে নাট্যশাস্ত্র, অভিনয়দর্পণ, সঙ্গীতরত্নাকর, সঙ্গীতদামোদর, সঙ্গীতমকরন্দ, সঙ্গীতদর্পণ ইত্যাদি গ্রন্থগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অশোকের রাজত্বের সময় গুহাশিল্পের সূচনা হয়েছিল। অশোক স্তম্ভ ও স্তূপগুলি প্রস্তরশিল্পের প্রথম নিদর্শন এবং এতে নৃত্যের ভঙ্গিমাগুলি দেখলে বোঝা যায় যে, প্রাচীনকালে কি ধরণের নৃত্য প্রচলিত ছিল এবং নৃত্য বেশ সমাদরের সঙ্গেই গৃহীত হত। প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত ১ নং সাঁচীস্তূপের উত্তর পশ্চিম স্তম্ভে নর্তকীর একটি মূর্তি আছে। তাতে বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশও দেখা যায়। ব্র্যাকেট মূর্তিগুলির ভেতর বনদেবীর যে মূর্তিটি আছে তাতে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা ও নৃত্যের মাধুর্য সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। শুঙ্গ রাজত্ব থেকে আরম্ভ করে অন্ধ্র রাজত্ব পর্যন্ত এই স্তূপ নির্মাণ কার্য অব্যাহত ছিল। শুঙ্গ

রাজত্বের অবসানের পর কাম্ববংশের উদ্ভব হলে বারহুত, ভোজ ও বুদ্ধগয়ার মন্দিরের নির্মাণকার্য সুরু হয়।

খৃষ্টীয় প্রথম শতকে নির্মিত বারহুতের ভাস্কর্যে নর্তক ও নর্তকীদের সমবেত নৃত্যের একটি দৃশ্য আছে। গৌতম যখন তপস্যার দ্বারা বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন সেই সময় দেবতারা গৌতমের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনায় তাঁর কেশচুড়া বেদীর ওপর স্থাপন করে পুজো করছিলেন এবং এই উপলক্ষ্যে স্বর্গের দেবসভায় অপ্সরা ও গন্ধর্বরা নাচগানের দ্বারা এই উৎসব পালন করেছিলেন। এই দৃশ্যে আছে যে, নর্তকীরা নৃত্য করছে এবং ৮ জন বাদ্যকর সঙ্গীত পরিবেশন করছে। তার মধ্যে চারজন হার্পজাতীয় বাদ্য বাজাচ্ছে, একজন মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে এবং একজন গান গাইছে। এই সকল নর্তকীদের নামও খোদিত আছে। এরা হচ্ছে মিশ্রকেশী, সুভদ্রা, পদ্মাবতী ও অম্বুসা।

অন্ধ্রবংশের স্মরণীয় কীর্তি হচ্ছে খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত অমরাবতী। এতে ভগবান বুদ্ধের জীবনবৃত্তান্ত খোদিত আছে। পরবর্তীকালে অন্ধ্ররাজত্বের সময় নির্মিত উড়িষ্যায় খণ্ডগিরি, উদয়গিরি ও রাণীগুহায় নর্তক, নর্তকী ও বাদ্যকরের মূর্তিও আছে। রাজা খারবেলের নামও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় খৃষ্টপূর্বে জৈন রাজা খারবেল উড়িষ্যা শাসন করেন। তিনি নিজে একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি প্রজামনোরঞ্জনের জন্যে তাণ্ডব ও অভিনয় প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন। উদয়গিরিতে রাণীগুহায় দেখা যায় যে, একজন রাজা নর্তকীর নৃত্য উপভোগ করছে। এই নর্তকীকে ঘিরে আছে বাদ্যযন্ত্রীরা।

কুষাণ রাজত্বের সময় উত্তরভারতে একটি নূতন শিল্পধারার প্রবর্তন হ'ল। গ্রীক, রোম্যান ও ভারতীয় শিল্পের সংমিশ্রণে গান্ধার শিল্পের উদ্ভব হ'ল। গান্ধার শিল্প গুপ্ত শিল্পের পূর্ববর্তী ধারা। দুইশত ছয় খৃষ্ট পূর্বাব্দে সিরিয়ার গ্রীকরাজা এ্যান্টিয়োকস্ পাঞ্জাব আক্রমণ করেন এবং ব্যাকট্রিয়ায় (বলহীক অর্থাৎ হিন্দুকুশ ও অক্ষুনদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ) গ্রীকরা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। এই গ্রীকরাই ক্রমশঃ পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন এবং তাঁদের সংস্কৃতির বহু নিদর্শন রেখে যান। এর ফলে গান্ধার শিল্পের সৃষ্টি। গান্ধার পদ্ধতিতে ভারতীয় ও গ্রীকশিল্পের অপূর্ব সমন্বয় হয়েছিল। মথুরা এবং অমরাবতীর শিল্পনিদর্শনের ওপর গান্ধার শিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট। গান্ধার অঞ্চলে

এই শিল্পের নিদর্শন সর্বাধিক। কারণ ইউচিরাই কুষাণ বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং গান্ধার অঞ্চলেই তাঁদের রাজত্ব ছিল। পুরুষপুর অথবা পেশোয়ার ছিল রাজধানী। কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কণিষ্ক সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং তাঁর গান্ধার রাজ্যও সঙ্গীতের জন্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। এঁর সময় অশ্বঘোষ, নাগার্জুন প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার ছিলেন।

দক্ষিণে চালুক্যদের রাজত্বকালে (৫৫০—৭৫০ খৃঃ) অইহোলের দুর্গামন্দির নির্মিত হয়। মন্দিরের স্তম্ভে অনেক নর্তক-নর্তকীর মূর্তি খোদিত আছে। চালুক্যরাজদের রাজত্বের সময় ৭০০ খৃষ্টাব্দে এলোরা মন্দিরের নির্মাণকাজ আরম্ভ হয়। অষ্টম শতাব্দীর রাষ্ট্রকূট রাজাদের সময়ও এর নির্মাণকাজ চলে। এই সময় এ্যালিফ্যাণ্টার মন্দির তৈরী হয়। এলোরা মন্দির কৈলাসনাথ অর্থাৎ নটরাজ শিবের উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছিল। দরজার গায়ে নটরাজ শিবের মূর্তি সহজেই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খৃঃ পূঃ ১ম থেকে ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত অজন্তার নির্মাণ কাজ চলে। ৬৪২ খৃঃ অঙ্কিত অজন্তা গুহায় গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের চিত্রের সঙ্গে চিদাম্বরম মন্দিরের নটরাজ মূর্তির যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়া নৃত্যরত মূর্তির সঙ্গে দর্শকদের মূর্তিও রয়েছে। পল্লববংশীয় রাজারা ৬০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই রাজবংশের দ্বারা কৃত মামাল্লাপুরমের বিখ্যাত শিবের মন্দির চারুকলার অন্যতম নিদর্শন। একটি বিষয়ে লক্ষণীয় যে, ছোট ছোট রাজত্বের ভেতর পরস্পর বিদ্বেষ নানাভাবে বিদ্যমান থাকা সত্বেও চারু ও কারুকলার ওপর সকলেরই যে গভীর আকর্ষণ ছিল তা তাঁদের কাজের মধ্যেই যথেষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। ভুবনেশ্বরের মন্দিরে অনেক নৃত্যরত গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের মূর্তি আছে, যা নৃপতিদের সঙ্গীতপ্রীতির পরিচয় বহন করে।

১১০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭০০ খৃষ্টাব্দকে মধ্যযুগ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এই যুগেও রাজা মহারাজদের শিল্পপ্রীতি কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নি। ১০০০ খৃষ্টাব্দে খাজুরাহের কন্দর্পদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে খোদিত নারীমূর্তিগুলির ভেতর নৃত্যের একটি লীলায়িত ভঙ্গী দেখা যায়। রাজস্থানের নৃত্যরত গণেশের মূর্তিটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গাঙ্গবংশীয় রাজাদের দ্বারা নির্মিত পুরীর মন্দির, সোমনাথ ও কোণার্কের মন্দিরের নাটমণ্ডপ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ভারতের প্রত্যেক প্রাচীন মন্দিরেই একটি করে নাটমণ্ডপ দেখা যায়। এই সকল নাটমণ্ডপগুলিই প্রমাণিত করে যে সেকালে দেবতার চিত্ত-

বিনোদনের জন্যে মন্দিরপ্রাঙ্গণে নৃত্যগীতের আয়োজন হত। ভারতের রাজারা মন্দিরের ভাস্কর্য ও গুহাশিল্পের মাধ্যমে তাঁদের গৌরব, মহিমা, ঐশ্বর্য ও শিল্প-প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত পাণ্ড্যরাজারা চিদাম্বরম্ মন্দিরের কাজ শেষ করেন। এই মন্দিরের গায়ে ১০৮টি করণ খোদিত আছে। ১২৩২ খৃষ্টাব্দে নির্মিত মাউণ্ট আবুর নেমিনাথ মন্দিরের ছাদেও এই ধরণের করণ দেখা যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত বিজয়নগরের বিঠল স্বামীর মন্দিরেও পাথরের বেদীর গায়ে নৃত্যরতা, বাদ্যরতা সুন্দরী নর্তকীদের ভঙ্গী উৎকীর্ণ আছে। একটি ব্যাপার এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, ভারতের বিভিন্নপ্রান্তের এই সব নৃত্যরতা মূর্তিগুলির নৃত্যভঙ্গিমার মধ্যে একটি সাম্য ও ঐক্য রয়েছে। সুতরাং অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয় যে একই ধরণের নৃত্যপদ্ধতি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ মুনি ভরত একেই মার্গ নৃত্য বলেছেন। তিনি মার্গ নৃত্যে বৃত্তি ও প্রবৃত্তির কথা বলেছেন এবং এই বৃত্তি ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের নৃত্যের বৈশিষ্ট্যকে সূচিত করেছেন। মার্গ নৃত্য যে রাজা মহারাজরাই উপভোগ করতেন ও তার রস গ্রহণ করতেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্র—

নৃত্যের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে সঙ্গীতশাস্ত্রও বিশেষ মূল্যবান। এইসব সঙ্গীতশাস্ত্রগুলিতে প্রাচীন ভারতের নৃত্য, নাট্য, গীত ও বাদ্য সম্বন্ধে প্রচুর উপকরণ পাওয়া যায়। আচার্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রকে নৃত্য-নাট্য-সঙ্গীত প্রভৃতির মানদণ্ডরূপে গণ্য করা হয়। মুনি ভরতের নাট্যশাস্ত্র রচনাকাল নিয়ে মতবিরোধ আছে। কেউ বলেন খৃষ্ট পূর্ব যুগে মুনি ভরতের উদ্ভব হয়েছিল। আবার কেউ বলেন খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত ভরতমুনির সময়কাল ধরে নিতে পারা যায়। ভরতমুনি পরবর্তী উত্তরাধিকার হিসেবে কোহলের উল্লেখ করেছেন। অনেকে মনে করেন নাট্যশাস্ত্রের শেষ অংশ কোহল লিখেছেন। অনুমান করা হয় যে, কোহল দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতকে ছিলেন। তাঁর 'সঙ্গীতমেরু' গ্রন্থটির উল্লেখও পাওয়া যায়।

নাট্যশাস্ত্রে নাট্য সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ আছে। নাট্যের আলোচনা করতে গিয়ে ভরতমুনি নৃত্য, গীত ও বাদ্যের আলোচনা করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি নাট্যের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে নৃত্যের উল্লেখ করেছেন। অষ্টম ও দ্বাদশ অধ্যায়ে তিনি অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, উপাঙ্গের ক্রিয়া সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। উনবিংশ অধ্যায়ে লাস্যাঙ্গের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ভাব-রস, বেশভূষা, ছন্দ, ভাষা ও তার গুণাবলী, শিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধেও আলোচনা আছে। ভরতের নাট্যশাস্ত্র সঙ্গীতজগতে একটি নবজাগরণ এনেছিল। এঁর পূর্ববর্তী গুণী ছিলেন তুম্বুরু, যাষ্টিক, দুর্গাশক্তি ইত্যাদি।

আচার্য ভরতের পরবর্তী গুণী ছিলেন নন্দিকেশ্বর। এঁর আবির্ভাবকাল ধরা হয়েছে খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী থেকে ৭ম খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এঁর রচিত অভিনয়দর্পণে নৃত্য সম্বন্ধীয় প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। নৃত্যে ভরত ও নন্দিকেশ্বর দুটি ধারার প্রবর্তন করেছিলেন। নন্দিকেশ্বরের অভিনয় দর্পনে বাহ্যিক প্রকাশ ও রীতিনীতির ওপর বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মুনি ভরত রসানুভূতি বা ভাব ও রসের ওপর প্রখর দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

সপ্তম শতাব্দীতে রচিত অগ্নিপুরাণে কিছু কিছু নৃত্যের উপাদান পাওয়া যায়। সপ্তম থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে নারদ কৃত 'সঙ্গীতমকরন্দ' গ্রন্থের উল্লেখ করতে হয়। এই গ্রন্থটির দুটি ভাগ আছে; একটি ভাগে গানের বিষয় লেখা হয়েছে এবং দ্বিতীয় ভাগে নৃত্যের বিষয় লেখা হয়েছে। দশম শতাব্দীতে ধনঞ্জয় 'দশরূপক' গ্রন্থটি রচনা করেন। দশরূপকে ধনঞ্জয় নাট্য এবং ভাব-রস সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে নৃত্য ও নৃত্তের আলোচনাও করেন এবং লাস্য ও লাস্যাঙ্গ সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেন। অবশ্য লাস্যাঙ্গের আলোচনায় তিনি ভরতমুনিকে অনুসরণ করেছেন। দশম শতাব্দীতেই সাগর নন্দী 'নাটকলক্ষণরত্নকোষ' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন, তাতে নৃত্যনাট্য, লাস্যাঙ্গ, কৈসিকী বৃত্তি সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

১১০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১১৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রামচন্দ্র এবং গুণচন্দ্র 'নাট্যদর্পণ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে আঙ্গিকাভিনয় ও ত্রয়োদশটি রূপকের উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচটি নৃত্যনাট্যের অন্তর্গত এবং দুটি নৃত্য সম্বন্ধীয়।

১১৩১ খৃষ্টাব্দে চালুক্যরাজ সোমেশ্বর দেব 'মানসোল্লাস' বা 'অভিলাষিত চিন্তামণি' নামে একটি সঙ্গীত সম্বন্ধে গ্রন্থ লেখেন। এই গ্রন্থে 'দেশী' নৃত্য সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

১১৭৫ খৃষ্টাব্দে শারদাতনয়ের রচিত 'ভাবপ্রকাশন' একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থটিতে নাট্য এবং নাট্যের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য শিল্পেরও উল্লেখ আছে। সপ্তম অধ্যায়ে নাট্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে শারদাতনয় নৃত্যের বহু তথ্য প্রকাশ করেন। নবম অধ্যায়ে নৃত্যভেদ সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে। দশম অধ্যায়ে নানাধরণের নৃত্যের উল্লেখ করা হয়েছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শার্ঙ্গদেব 'সঙ্গীতরত্নাকর' গ্রন্থটি লেখেন। শার্ঙ্গদেব নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয় দর্পণ দুটি বই থেকেই সারপদার্থ গ্রহণ করেছেন। এই বইটিতে সমসাময়িক নৃত্যের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

চতুর্দশ শতাব্দীতে পার্শ্বদেবের 'সঙ্গীতসময়সার' গ্রন্থটি রচিত হয়। এই বইটিতে নৃত্য, অভিনয় ও আঙ্গিক অভিনয় সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আছে। ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে সুধাকলস 'সঙ্গীতোপনিষদ সারধার' বইটি রচনা করেন। এতেও নৃত্য সম্বন্ধে বহু উপাদান পাওয়া যায়।

ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে একটি বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। বইটির নাম 'নর্ত্তননির্ণয়' এবং এর রচয়িতা ছিলেন পুণ্ডরীক বিঠল। সম্রাটের মনোরঞ্জনের জন্য এই বইটি লেখা হয়েছিল। নাট্যশাস্ত্রকে অনুসরণ করে বইটি রচিত। তবে তৎকালীন নৃত্য পদ্ধতিরও উল্লেখ আছে। অর্থাৎ 'দেশী' নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে দামোদর পণ্ডিত সঙ্গীতদর্পণ লেখেন। এই বইটিতে সমসাময়িক 'দেশী' নৃত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঞ্জোরের মারাঠা রাজাদের আদেশে উত্তকে গোবিন্দাচার্য একটি গ্রন্থ রচনা করেন। বইটির নামকরণ হয়েছে 'নাট্যশাস্ত্রসংগ্রহ'। এই বইটির অধিকাংশ উপাদানই সঙ্গীতরত্নাকর থেকে নেওয়া হয়েছে। তবে হস্তভেদের যে বিস্তৃত বিবরণ আছে তা অন্য কোন গ্রন্থে দেখা যায় না। আমরা দেখি যে প্রায় প্রত্যেক শতাব্দীতেই একটি করে সঙ্গীতগ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং অধিকাংশ লেখকই নাট্যশাস্ত্র, অভিনয়দর্পণ অথবা সঙ্গীতরত্নাকরকে অনুসরণ করেছেন।

বদেশী আক্রমণ—

৭৫০ খৃষ্টাব্দে ঐস্লামিক অভিযান সুরু হয়। মুসলমানরা উত্তরাপথে ভারতে প্রবেশ করে লুটপাট করে চলে যেতেন। স্থায়ীভাবে রাজত্ব করতেন না। এতে হিন্দু সংস্কৃতি বিপদের সম্মুখীন হলেও বিপর্যস্ত হয় নি। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে সুলতানী যুগের সুরু হয়। সুলতানী যুগে ভারতে হিন্দু ও

মুসলমান সংস্কৃতির যে মিলন আরম্ভ হয়, মোগলযুগে আকবরের রাজত্বকালে তার চরম বিকাশ ঘটেছিল। এইভাবে উত্তরভারতে এক নতুন সংস্কৃতির জন্ম হল। দক্ষিণভারত এই আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছিল। হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মের রক্ষক হিসেবে বিজয়নগরের দান অতুলনীয়। শুধু তাই নয়, অনেকে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করবার জন্যে দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় নেন।

১২০০ শতাব্দী থেকে ভারতের দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসে। ভারতের রাজারা নিজ নিজ রাজ্য রক্ষার জন্যে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। এর ফলে শিল্পকলার চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। শুধুমাত্র প্রমোদের উপকরণ হিসেবে নৃত্য একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ হল। তার ফলে এর পবিত্র রূপটি বিকৃত হতে থাকল। দেবদাসীরা দেবতার সেবা ছেড়ে নৃপতিদের সেবা করতে লাগল। মুসলমান নবাবদের জলসাঘরে নাচওয়ালীদের প্রবেশ ঘটল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরেজদের আগমনে সঙ্গীতশিল্পের মান আরও নিম্নগামী হল এবং ক্রমশঃ বিলুপ্তির পথে যেতে বসল। কিন্তু যে দেশের অণুতে অণুতে নৃত্যের ছন্দের অনুরণন সেই দেশের নূপুরের নিক্কন স্তব্ধ থাকতে পারে না। রাজনৈতিক বিপ্লব, আত্মকলহ, এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়েও ভারতবাসী কলাদেবীর আরাধনা করতে ভোলে নি। ভারতীয় নৃত্য বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন নাম নিয়ে ভারতের বিভিন্নপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে এবং উত্তরভারতে 'কথক', পূর্বভারতে 'মণিপুরী', দক্ষিণভারতে 'ভরতনাট্যম' ও 'কথাকলি' বলে পরিচিত হয়েছে।

এই সকল বিভিন্ন নৃত্যের ইতিহাস বিচার করলে দেখা যাবে যে এইসব নৃত্য কি ভাবে সমস্ত ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এর ওপর বৈদেশিক সংস্কৃতি কি ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। উত্তরভারতে ঐসলামিক প্রভাব, দক্ষিণভারতে আর্য ও অনার্যের সংমিশ্রণ এবং পূর্বভারতে মোঙ্গল, চীন প্রভৃতি জাতির প্রভাব আছে। বেলুচিস্তান, সীমান্তপ্রদেশ ও পশ্চিমপাঞ্জাবে তুর্ক ও ইরাণজাতির বংশধরদের বাসস্থান। অনুমান করা হয় দ্রাবিড় ও মোঙ্গলজাতির সংমিশ্রণে বাংলা ও উড়িষ্যার অধিবাসিদের উদ্ভব। তরাই, নেপাল, আসাম ও ভুটানের অধিবাসীদের উদ্ভব হয়েছে মোঙ্গল জাতি থেকে। প্রত্যেক অঞ্চলই এক একটি জাতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠেছে এবং সেই জায়গার কৃষ্টির ওপর সেই সেই জাতির প্রভাব পড়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই বৈদেশিক প্রভাবের কথা আলোচিত হয়েছে।

নৃত্যে দর্শন ও সাহিত্য

জয়ত্বদভ্রবিভ্রমভ্রমদ্ভুজঙ্গমশ্বসদ্

বিনির্গমৎক্রমস্ফুরৎকরালভালহব্যবাট্ ।

ধিমিদ্ধিমিদ্ধিমিধ্বনন্মৃদঙ্গতুঙ্গমঙ্গল-

ধ্বনিক্রমপ্রবর্তিত—প্রচণ্ডতাণ্ডবঃ শিবঃ ।

নৃত্যে দর্শন ও সাহিত্য

ভারতীয় নৃত্যের বিনাশ নেই। কারণ ভারতীয় নৃত্য ধর্ম ও দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেই জন্যে নৃত্যের রূপান্তর হয়েছে বটে কিন্তু বিলুপ্ত হয় নি। কারণ এর মূল অত্যন্ত গভীরে নিহিত। নৃত্য সম্বন্ধে এইরকম গাম্ভীর্যপূর্ণ দার্শনিক ব্যাখ্যা অন্য কোন দেশের নৃত্যে আছে বলে মনে হয় না। ভারতীয় নৃত্যের উদ্ভব হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদ থেকে; কিন্তু অন্য কোন দেশের নৃত্যের উদ্ভব সম্বন্ধে এইরকম উঁচু ধারণা পোষণ করা হয় না। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র-কাররাও শংকরকেই ভারতীয় নৃত্যের স্রষ্টা বলে স্বীকার করেছেন। তাঁরা গুরুকে প্রণাম জানিয়েছেন অতি সুন্দরভাবে—

"আঙ্গিকং ভুবনং যস্য বাচিকং সর্ববাঙ্ময়ম
আহার্যং চন্দ্রতারাদি তং নুমঃ সাত্ত্বিকং শিবম্।"

সেই শক্তিমান, যিনি সর্বত্র প্রকাশমান, যিনি পঞ্চভূতে বিরাজিত, যিনি রূপে, রসে, গন্ধে, বর্ণে-নিজেকে বিকশিত করেছেন সেই ত্রিগুণাতীত শিবকে নমস্কার। তিনি নৃত্যের ভেতর দিয়ে জগৎ সৃষ্টি করছেন, জগৎ লয় করছেন, কখনও বা জগতের স্থিতি করছেন। কালের চক্র ঘুরছে এবং তার তালে তালে শিব নৃত্যের ভেতর দিয়ে তাঁর কাজ সম্পাদন করছেন। এই হচ্ছে ভারতীয় নৃত্যের মূল সুর। ভুবন তাঁর আঙ্গিক অভিনয়ের ফলস্বরূপ। তাঁর মুখোচ্চারিত প্রথম ওঁকারধ্বনি বায়ুতরঙ্গে প্রবাহিত হয়ে নিখিল বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে সমগ্র জাগতিক শব্দের সৃষ্টি করে। অতএব বিশ্বের সমস্ত শব্দ তাঁর অভিনয় থেকে উদ্ভূত। চন্দ্র তারাদি তাঁর আভরণ। সেই ত্রিকালজ্ঞ, কালজয়ী, মহাকাল শিব যে নৃত্য করেছিলেন তা জাগতিক নৃত্য। সেইজন্যে জগৎ হয়েছিল আঙ্গিক অভিনয়, অপার্থিব বস্তু চন্দ্র তারাদি হয়েছিল ভূষণ এবং মহাজগতের সকল মিলিত শব্দ হয়েছিল তাঁর বাচিক অভিনয়ের ফলস্বরূপ। সেইজন্যে ভারতীয় নৃত্য ভারতবাসীর কাছে কেবলমাত্র আমোদ প্রমোদ নয়; অথবা সময় অতিবাহিত করবার জন্য নিমিত্তমাত্র নয়। এ এক অদ্ভুত

অনুভূতি, অদ্ভুত সত্তা। এই অদ্ভুত অনুভূতিকে আমরা রূপময় করবার চেষ্টা করি এবং সর্বগত করে শিল্পের সৃষ্টি করি। শিল্প সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। একমাত্র শ্রষ্টাই শিল্প সৃষ্টি করতে পারেন। নৃত্যের সঙ্গে শিল্প ও সৌন্দর্যের নিবিড় সম্বন্ধ। কারণ নৃত্য শিল্পের অন্তর্গত। নৃত্যের ভেতর দিয়ে শিল্পের বিকাশ বুঝতে হলে প্রথমে শিল্প কি এবং শিল্প সম্বন্ধে মনীষীরা কি বলেছেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন।

অনেকে বলেন পরমব্রহ্মের উপলব্ধি থেকে এই অনুভূতির স্পন্দন হয়। এই অনুভূতিই সৌন্দর্যের আস্বাদন করায়। শিল্পের সঙ্গে সৌন্দর্য ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত।

ইংরেজ দার্শনিক বম্‌গার্টেন সৌন্দর্যের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে সৌন্দর্য হচ্ছে সম্পূর্ণতা। এটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। সৌন্দর্যের লক্ষ্য হচ্ছে আনন্দ দেওয়া ও অন্তরের ইচ্ছাকে জাগরিত করা। প্রকৃতিতে সৌন্দর্য প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং আর্টের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে প্রকৃতিকে অনুকরণ করা। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় যে সৌন্দর্যকে অনুভব করে স্বগত করা। উইঙ্কিলম্যান বলেছেন যে, আর্টের সূত্র এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে সৌন্দর্যের প্রকাশ। তিনি তিন রকম সৌন্দর্যের উল্লেখ করেছেন। তার ভেতর ভাবের সৌন্দর্য হচ্ছে শিল্পের প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং ভাবের সুষ্ঠু অভিব্যক্তি হচ্ছে সৌন্দর্য। হেগেল বলেছেন, ভগবান সৌন্দর্যরূপে প্রকৃতি ও শিল্পের ভেতর বিরাজমান। হেগেল সর্বশক্তিমানের এই প্রকাশের ভেতর ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখেছেন। তাঁর মতে এই সর্বশক্তিমান পুরুষ দুইরকম ভাবে নিজেকে ব্যক্ত করেন—(১) বস্তু ও বিষয়ের ভেতর দিয়ে (২) প্রকৃতি ও আত্মার ভেতর দিয়ে; অর্থাৎ চেতন ও অচেতন অথবা স্থাবর ও জঙ্গমের ভেতর দিয়ে। সুতরাং চেতন পদার্থের ভেতর দিয়ে ভাবের প্রকাশের নাম সৌন্দর্য এবং এই সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। আত্মা ও আত্মার সঙ্গে যা সংযুক্ত তাই সুন্দর। সুতরাং আত্মিক সৌন্দর্যের প্রতিবিম্ব হচ্ছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। প্রকৃতির ভেতর এই যে আত্মিক সৌন্দর্যের সন্ধান পাই তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। সুতরাং আত্মার বিকাশ হচ্ছে সৌন্দর্যের প্রকাশ। দর্শন ও ধর্মের মিলনে ভাবের যে অভিব্যক্তি হয় তাকেই অনেকে শিল্প বলেছেন। ইতালীয় সৌন্দর্যের উপাসক প্যাগানো বলেছেন যে, প্রকৃতির ভেতর যে সৌন্দর্য

বিচ্ছিন্নভাবে রয়েছে তাকে সংহত করাই শিল্প। এই সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করার শক্তি হচ্ছে রুচি এবং এদের একত্রিত করে সংহত করার শক্তি হচ্ছে আর্টের প্রতিভা।

ভারতীয় দার্শনিকরা সহস্রাধিক বছর আগে একই কথা বলেছেন। তবে তাঁরা আরও সূক্ষ্ম অনুভূতির দ্বারা তা ব্যক্ত করেছেন। ভরতমুনি রসসৃষ্টির দ্বারা আর্টের সার্থকতা বিচার করেছেন। এই রসসৃষ্টিকেই তিনি প্রকারান্তরে সৌন্দর্য বলেছেন। এই সৌন্দর্য থেকে আনন্দানুভূতির সৃষ্টি। তিনি বলেছেন রসানুভূতি উৎপন্ন হয় কোন সুন্দর প্রাচীরে অঙ্কিত চিত্র অথবা মানুষ, জীব, জন্তু এবং লতাপাতার রঙীন চিত্র থেকে। ছবি কেবলমাত্র রঙ ও রেখা দ্বারা ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে আমাদের মনে আনন্দানুভূতির সৃষ্টি করে। এই আনন্দানুভূতি আমাদের মনে সুপ্তভাবে রয়েছে। তা উদ্বেলিত হয়ে রসসৃষ্টি করে। যেখানে রসসৃষ্টি সফল হয়, সেখানে শিল্পও সার্থক হয়। শিল্প সম্বন্ধে অভিনব গুপ্ত মন্তব্য করেছেন যে লোকবৃত্তির অনুকরণই হচ্ছে শিল্প; তবে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, অবিকল অনুকরণ না হয়ে সদৃশকরণ হবে এবং এর অতিরিক্ত শিল্পীর নিজস্ব অবদান থাকবে। এই অবদানটুকুই সৃষ্টি অথবা শিল্প। রস সম্বন্ধে বিচার করতে গিয়ে অভিনব গুপ্ত নাট্যরসের কথা বলেছেন। নাট্য কোন জিনিসের অনুকরণ নয়, নটবিদ্যাও নয়। অঙ্গভঙ্গী অথবা বিভাবও নয়। তবে এটা কি? এটি সকল মানুষের হৃদয়ে স্থায়ীভাবে রয়েছে। কিন্তু যখন এটি কোন কাব্য, নাট্য প্রভৃতির ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়ে দর্শক হৃদয়ে এক চমৎকার আনন্দানুভূতির সৃষ্টি করে, তখনই তা শিল্প হয়। এ কথা সত্য যে কোন জিনিসের যথাযথ অনুকরণ শিল্প নয়। কারণ তাতে সৃষ্টির আনন্দ কোথায়? এক এক মনীষী এক এক ভাবে আর্টকে অনুভব করেছেন। কিন্তু সকলের বক্তব্যের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রকাশভঙ্গীর পার্থক্য থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষনীয় যে, সকলের ভেতর একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্র রয়েছে। সকলেই অনুভব করেছেন যে, শিল্প হচ্ছে পরমাত্মার সৌন্দর্যেরই প্রতিবিম্ব। ব্রাহ্মণের রচয়িতা ঐতরেয় শিল্প সম্বন্ধে যা বলেছেন তা ক্ষিতিমোহন সেনের ভাষায় উদ্ধৃত করছি—
"শিল্পীরা তাঁদের শিল্পসৃষ্টির দ্বারাই দেবতার স্তব করছেন। সৃষ্টিতে যে দেবশিল্প তারই অনুপ্রেরণায় শিল্পীদের যে এই সব শিল্প তাই বুঝতে হবে।

যিনি এইভাবে শিল্পকে দেখেছেন তিনিই শিল্পের মর্ম বুঝতে পেরেছেন। শিল্পের দ্বারাই শিল্পীর যে উপাসনা, তাতে স্বর্গ বা মুক্তি মেলে না। তার ফল হল শিল্পের দ্বারা আপনার আত্মাকে সংস্কৃত করে তোলা। শিল্প সাধনার দ্বারা বিশ্বের দেবশিল্পের ছন্দে শিল্পী আপনাকে ছন্দোময় করে তোলে।"
"Raskin বলেছেন"

"All great art is the expression of man's delight in god's work, not his own. Michael Angelo বলেছেন—"The true work of Art is but a shadow of the divine perfection," I. H. Holland বলেছেন "Artists are nearest to Cod, Into their soubs He breathes His life…"

সুতরাং এ কথা স্বীকার্য যে শিল্প বাস্তব জগতের অবিকল অনুকরণ নয়। এ যুগের মনীষী রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"কোন কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নয়। প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষকে আমরা প্রতীতি করি; সাহিত্যে এবং ললিতকলায় অপ্রত্যক্ষ আমাদের কাছে প্রতীয়মান। ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা।"টলষ্টয়ও এই কথা বলেছেন—

"To evoke in oneself a feeling one has once experienced and having evoked tn it oneself then by means of movements lines, colours, sounds of forms expressed in words, so to transmit that feeling that other experience the same feeling -that is the activity of art."

ভারতীয় নৃত্যে এই শিল্পের পূর্ণ বিকাশ হয়েছে কিনা তাই বিচার্য বিষয়। প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যশিল্পীরা নৃত্যের ভেতর দিয়ে যে সৌন্দর্যের প্রকাশ ও রস অনুভব করতে চেয়েছিলেন তা তাঁদের আত্মিকবিকাশের বহিঃপ্রকাশ। তাঁরা ভগবানের পদতলে দেহ মন সমর্পণ করে নৃত্যকে দেবতার ভোগ্য করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা এই যে সূক্ষ্ম আনন্দানুভূতি উপলব্ধি করেছিলেন এর ভেতর কামনা বা ভোগের আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তখন ছিল শুধুই আনন্দ; আনন্দ দেওয়া ও পাওয়া। এই সাত্ত্বিক আনন্দানুভূতি থেকে তাঁরা রসসৃষ্টি করে শিল্পের সৃষ্টি করতেন যার রসাস্বাদন করে রসিক মন পুলকিত হত। সুতরাং ভারতীয় নৃত্যের দর্শনে বলে যে, নৃত্য পরমব্রহ্মের মহাস্পন্দনের স্থূল

ও সুন্দর অনুভূতি।

এই সৌন্দর্যানুভূতির ভিতর সৃষ্টির স্পৃহা রয়েছে। মুক্ত মন ইচ্ছামত কল্পনার জাল বুনে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে শিল্পের সৌন্দর্যের এখানেই প্রভেদ এবং এখানেই শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য। ডাঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্যের দ্বারা অনূদিত—"হেগেল রচিত ললিতকলা দর্শনের ভূমিকা" নামক প্রবন্ধে আছে যে—"শিল্পের সৌন্দর্য সৃষ্টি করা সৌন্দর্য—মনের নূতন জন্ম। যে পরিমাণে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ব্যাপার থেকে আত্মা ও আত্মিক সৃষ্টি বড় সেই পরিমাণেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে শৈল্পিক সৌন্দর্য মহত্তর।" এই সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস সকল দেশের শিল্পের ভেতরই দেখা যায়। কিন্তু ভারতীয় নৃত্যশিল্পের ভেতর এই সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ বিকাশ হয়েছে বলা যায়। ভারতীয় নৃত্য রূপে গুণে অধিকতর মহিমান্বিত হয়ে আপনাকে প্রকাশ করছে। এই প্রকাশ এত উজ্জ্বল, এত সুষমামণ্ডিত, যে এই নৃত্য অজ্ঞাতসারে সকলের মনকে আকর্ষণ করছে। এর কারণ এই রঙ্গময়ী নৃত্য পঞ্চেন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করে ক্ষান্ত হয় না। এই নৃত্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের অতীত আরও কিছু আমাদের দেয়, যা অনির্বচনীয়। রবীন্দ্রনাথ শিল্পের ব্যাখ্যায় বলেছেন যা 'অহৈতুক' এবং অপ্রয়োজনীয় তাই শিল্প। প্রাচ্যের আলঙ্কারিক ও পাশ্চাত্য মনীষীরা বলেছেন যে, শৈল্পিক আনন্দ অলৌকিক জগতের সন্ধান দেয়। ভারতীয় শাস্ত্র অনির্বচনীয় ব্রহ্মকে সত্য শিব ও সুন্দর বলে ব্যক্ত করেছে। এই শিল্পকলাও চিরসুন্দরকেই নানাভাবে ব্যক্ত করেছে।

ভারতীয় নৃত্য একাধারে দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্য। এই ভারতীয় নৃত্য অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করে এবং আমাদের অনুভূতিকে বাস্তবজগত থেকে বিচ্যুত করে এক অতীন্দ্রিয় ও অনির্বচনীয় অনুভূতি জাগায়। এটাই হল ভারতীয় নৃত্যশিল্পের বৈশিষ্ট্য। নৃত্যে বাচিকাভিনয়ের অভাব পূর্ণ করে গীত। এই সকল গীতে স্থায়ীভাবকে সঞ্চারিভাবের সাহায্যে নানাভাবে ব্যক্ত করে রসের সঞ্চার করা হয়। এই সকল গানে নানারকম রাগ রাগিনীও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনের সঙ্গে এই সকল রাগ রাগিনীর রূপ পরিবর্তিত হয় এবং এই রাগমালা নৃত্যকে একটি গভীর পরিবেশের ভেতর নিয়ে যায়। এর সঙ্গে চলে ছন্দের বিচিত্র খেলা। এই বিচিত্র ছন্দের খেলার ভেতর রয়েছে জগতের

স্পন্দন। কারণ ভারতবাসী মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, মহাকালের রথের চাকা বিবিধ ছন্দে ঘুরছে। এক কথায় বলা যেতে পারে ভারতীয় নৃত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতীয় দর্শনের ওপর যা শিল্পীর আত্মিক বিকাশের পথে প্রধান পথ প্রদর্শক। সেইজন্যে শিল্প হিসেবে ভারতীয় নৃত্য শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে।

ভারতীয় নৃত্য ভাবসম্ভারে এত সমৃদ্ধ যে অনায়াসেই দর্শকের মনকে রসে, ভাবে আপ্লুত করে তোলে। এর প্রধান কারণ ভারতীয় নৃত্যে মুখাভিনয় একটি প্রধান অঙ্গ। একটি ভাবকে প্রকাশ করতে শুধু দৈহিক অঙ্গভঙ্গীই (Gesture-posture) নয়, মুখের ভাবও একটি প্রধান অঙ্গ। ভাব, মুদ্রা, করণ, অঙ্গহার বিভিন্ন সাজসজ্জা, বিষয়বস্তু, সাহিত্য প্রভৃতি যে ভাবের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে তা দর্শককে লোকোত্তর জগতের সন্ধান দেয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, সাজপোষাকের বর্ণসম্ভারে ভাবগাম্ভীর্যে, প্রাণের আকুতিতে, আত্মিকবিকাশে ভারতীয় নৃত্য সম্পূর্ণ সার্থক।

নৃত্যকে আমরা কতদূর উচ্চপর্যায়ে স্থান দিয়েছি তা নটরাজের নৃত্যের বর্ণনা থেকেই বোঝা যায়। নটরাজ হচ্ছেন নটের রাজা। দক্ষিণভারতীয় নটরাজ মূর্তিটি ভারতীয় নৃত্যের দার্শনিক ব্যাখ্যার মূর্ত প্রতীক। নটরাজ নৃত্য করেছিলেন 'অপস্মর' নামে একটি অসুরের ওপর। দৈত্য অপস্মর হচ্ছে মায়া (Forget fulness)। শিব মায়াকে বিনষ্ট করে জীবকুলকে রক্ষা করছেন। মহাজাগতিক নৃত্যের স্রষ্টা নটরাজ সনাতন শক্তির উৎস পঞ্চক্রিয়ায় নিজেকে প্রকাশ করছেন। এই পঞ্চক্রিয়া হচ্ছে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব ও অনুগ্রহ। দৈত্য অপস্মরকে তিনি পদতলে বিনষ্ট করে সৃষ্টি রক্ষা করছেন; অতএব তিনি পালক। দক্ষিণ হাতে বরাভয় দান করছেন। বামহাতে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড ও মুক্তজটাজাল ধ্বংসের প্রতীক। বাম পা উঁচুতে ওঠান এবং আঙুলের অগ্রভাগ নামানো। এর অর্থ তিনি অনুগ্রহ করছেন। ডানহাতে ডমরু বাজিয়ে তিনি অনাহত শব্দের সৃষ্টি করেন। কখনও তাঁর তাণ্ডব রূপ, কখনও সংহার রূপ, কখনও বা শান্ত রূপ। তাঁর এই রূপের ছটা প্রকৃতির ভেতর ছড়িয়ে পড়েছে। নারদ রচিত 'সঙ্গীতমকরন্দে' শিবের সন্ধ্যানৃত্যের বর্ণনা আছে। একদা প্রদোষকালে হিমালয় পর্বতের ওপর শিব নৃত্য করেছিলেন। ব্রহ্মা তাল ধরেছিলেন, হরি মৃদঙ্গ বাজিয়েছিলেন এবং ভারতী স্বয়ং বীণা বাজিয়েছিলেন। চন্দ্র ও সূর্য বাঁশি বাজিয়েছিলেন। সিদ্ধ

অপ্সর ও কিন্নররা ছিলেন শ্রোতৃমণ্ডলী। নন্দী ও ভৃঙ্গী প্রভৃতি মাদল বাজিয়েছিলেন এবং নারদ স্বয়ং সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন। ভারতীয় নৃত্যের উদ্ভব ও এর বিকাশেও আধ্যাত্মিকতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং এই জন্তেই ভারতীয় নৃত্যের সঙ্গে পৃথিবীর অন্ত কোন দেশের নৃত্যের তুলনা চলে না।

ভারতীয় নৃত্যে বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব, আধ্যাত্মিকতা, ভাষা ও সাহিত্য—

পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, বিভিন্ন ধর্ম বিরোধের মধ্যেও ভারতীয় নৃত্যের বিনাশ হয় নি। তার কারণ ভারতবাসীরা নৃত্যের অন্তর্নিহিত বিশুদ্ধ মর্মটি উপলব্ধি করতেন এবং একে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসতেন। নৃত্য কিভাবে বিভিন্ন ধরণের প্রতিযোগিতার ভেতর বেঁচে রইল তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বৈদিকযুগের পরবর্তীকালে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। অর্থাৎ হিন্দুধর্ম নানা শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হলেও হিন্দু দর্শনের মূল সুরটি বিকৃত হয় নি। তবে বিভিন্ন শাখাকে অবলম্বন করে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার জন্তে বিভিন্ন পন্থা অনুসৃত হ'ল। এর প্রভাব নৃত্যের ওপরও এসে পড়ল। কারণ, হিন্দুধর্মে সঙ্গীতের একটি বিশেষ স্থান আছে, যার জন্তে শিব 'নটরাজ' এবং কৃষ্ণ 'নটবর' বলে অভিহিত হয়েছেন। যাই হোক্ কালক্রমে দেশভেদে, কালভেদে এবং ভৌগলিক প্রভাবে নৃত্যের রূপ নানাভাবে পরিবর্তিত হল। নৃত্যে বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব পড়ল এবং দেবদাসীরাও সেই প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পারলেন না। দেবদাসীরাও বৈষ্ণব, শৈব, প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হলেন। কারণ এই দুটি শাখাই বিশেষ প্রাধান্ত লাভ করেছিল। দেবদাসীদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য এক হলেও মত ও পথ ভিন্ন হল। দেবদাসীদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল সঙ্গীতের মাধ্যমে দেবতার আরতি করা। এমন কি ভারতের সন্ন্যাসী ও দার্শনিকরাও স্বীকার করেছেন যে, ভগবানকে পাবার একমাত্র পন্থা হ'ল সঙ্গীত। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে, "ঈশ্বরকে স্মৃতিপথে রাখিবার এই অভ্যাসের সর্বোৎকৃষ্ট সহায়ক সম্ভবতঃ সঙ্গীত। ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠ আচার্য নারদকে ভগবান বলছেন "নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগিনাং হৃদয়ে ন চ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ। হে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না, যোগিদের

হৃদয়েও বাস করি না, যেখানে আমার ভক্তগণ ভজন গান করেন, আমি সেখানেই অবস্থান করি। মনুষ্যমনের উপর সঙ্গীতের প্রচণ্ড প্রভাব—উহা মুহূর্তে মনকে একাগ্র করিয়া দেয়।" শ্রীমদ্ভাগবতে হিরণ্যকশিপুকে প্রহ্লাদ বলছেন—

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।"

অর্থাৎ-শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নববিধ ভক্তি যদি ভগবান বিষ্ণুতে অর্পিত হয়, তবে তাকেই উত্তম অধ্যয়ন বলে মনে করি। এছাড়া স্তুতি, শ্লোক ও ভজনের দ্বারাও ভক্তদের আরাধনা করতে দেখা যায়।

বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপ্তি সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। ভারতের পূর্বপ্রান্তে মণিপুরী নৃত্য বৈষ্ণবধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মণিপুরী নৃত্য যেমন ভাবময় তেমনি মাধুর্যময়। মৈতৈরা বিশেষ বিশেষ ধর্মোৎসবে মণিপুরী নৃত্য দেখে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করেন। মণিপুরী নৃত্যশিল্পীরা নৃত্যকে সাধনভক্তির পথ ও ধর্মের অঙ্গ মনে করতেন। এঁরা অধিকাংশই বৈষ্ণব এবং শ্রীকৃষ্ণ এঁদের আরাধ্যদেবতা।

ভঙ্গি পারেং ও লাইহারাওবা নৃত্যের সময় নৃত্যশিল্পীরা শুদ্ধ মন নিয়ে নৃত্য আরম্ভ করেন এবং দর্শকরাও তদ্‌গতচিত্ত হয়ে এই অপরূপ নৃত্যলীলা দর্শন করে নিজেদের ধন্য মনে করেন। মৈতৈদের নৃত্যে ভক্তিরসই প্রধান। ভারতীয় নৃত্যে ভক্ত ও ভগবানের সঙ্গে একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং ভক্তিরস ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হয়। মণিপুরীরা মনে করেন শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে নৃত্য করলে দেবতার আশীর্বাদ লাভ করা যায়। মণিপুরী নৃত্যশিল্পীদের কাছে নৃত্য দেবতার পুজোর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মতনই অপরিহার্য। মণিপুরী নৃত্য মণিপুরবাসীদের ওপর একটি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। কারণ ভক্তিমার্গের নববিধ লক্ষণের মধ্যে প্রথম লক্ষণটি দর্শকরা অনুসরণ করেন এবং দ্বিতীয়টি নৃত্যশিল্পীরা অনুসরণ করেন। তদগতচিত্তে শ্রবণ ও কীর্তনপ্রভৃতির দ্বারা ভক্তির উৎপত্তি হয় এবং সেই ভক্তি শেষ পরিণতি প্রাপ্ত করে প্রেমে। তাদের এই নাচ দর্শকদের মনে ভগবৎপ্রেমের অনুভূতি

জাগিয়ে তোলে। প্রেমভক্তি রস দিয়ে এই যে নৃত্যের মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা, তাতে নর্তক ও দর্শক উভয়ই অংশ গ্রহণ করেন। তখন তাঁরা মনে করেন যে, তাঁরা ভগবানের সেবক-সেবিকাদের সান্নিধ্য লাভ করছেন। ধর্ম ও নৃত্য তখন তাঁদের কাছে এক হয়ে যায়! নৃত্য মণিপুরীদের কাছে ধর্মের মত পবিত্র, ফুল চন্দনের মত নির্মল। তাতে কোন ক্লেদ নেই, কোন মালিন্য নেই। অবশ্য মণিপুরের রাজা মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রই মণিপুরী নৃত্যকে সমাজের এমন একটি উঁচুস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ভারতের অন্যান্য শাস্ত্রীয় নৃত্যের ওপরও ভগবৎপ্রেমের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভরতনাট্যম নৃত্যের উৎস খুঁজতে গেলে প্রথমেই দেবদাসীদের কথা স্মরণে আসে। দেবদাসীরা ভারতের বিভিন্ন মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। যাঁরা শিবমন্দিরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা শিবের আরাধনা করতেন, এবং যাঁরা বিষ্ণুমন্দিরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা বিষ্ণুর আরাধনা করতেন। পূর্বে ভরতনাট্যমকে 'দাসী অট্টম' বলা হত। নামের ভেতরই নৃত্যের মূলভাবটি প্রকাশ পাচ্ছে। অর্থাৎ দেবতার দাসী হয়ে তাঁরই প্রণতা হয়ে আমার বলতে যা কিছু সব নিবেদন করলাম। আমার বলতে আর কিছু নেই। এই যে সঙ্গীত চাতুর্য এও ভগবানের পায়ে নিবেদন করলাম। দেবতাই স্বামী, প্রভু ও জীবনসর্বস্ব। নৃত্যের সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই পবিত্র ভাবটি সঙ্গীতের মাধ্যমে মূর্ত হয়ে ওঠে। এতে যে সকল গীত ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তার ভাবার্থ হচ্ছে যে, নায়িকা তার নায়কের (দেবতার) সঙ্গে বিচ্ছেদের বিরহ যন্ত্রনা সহ্য করতে পারছে না।

কথিত আছে যে, কথাকলি ও কথকও এইরকম আধ্যাত্মিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ নৃত্যশৈলী। কালিকটের জামুরিন কৃষ্ণগোপালকে স্বপ্ন দেখেন ও কৃষ্ণ-অট্টম রচনা করতে আদিষ্ট হন। কৃষ্ণাদেশে এই নাটক রচিত বলে এই নাটকের কোন সংস্কার করা হয় নি। কথাকলি নৃত্যে রামায়ণ, মহাভারতের চরিত্রগুলি অধিকাংশই রূপায়িত হয়েছে।

ভরতনাট্যম্ নৃত্যকে সমৃদ্ধ করেছে তামিল ও তেলেগু সাহিত্য। তামিল ও তেলেগু সাহিত্য যেমন প্রাচীন তেমনি সমৃদ্ধ। সাতবাহন রাজত্বের শেষার্ধে তামিল ভাষায় সঙ্গম সাহিত্যের উদ্ভব হয়। সঙ্গমযুগে নৃত্য, নাটক ও সঙ্গীতের ওপর কতকগুলি পুস্তক রচিত হয়। এইগুলি হচ্ছে অগত্তম্,

মৃত্তুমূল, পঞ্চমরপুমখিভনর ইত্যাদি। তবে প্রাচীন তামিল সাহিত্যের ভেতর 'শিলপ্পদিকারম্' একটি সুপ্রাচীন তামিল নাট্যগ্রন্থ। এতে সঙ্গীতের প্রচুর উপকরণ পাওয়া যায়। তামিল সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে দ্রাবিড় ভাষা থেকে। পাণ্ড্য ও পল্লবযুগে এই ভাষার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। ভক্তিবাদ সম্বন্ধে এই সময় বহু কবিতা লেখা হয়েছিল। চালুক্য ও হোয়সল রাজত্বে কন্নড় ভাষা, পূর্বচালুক্য কাকতীয় ও তেলেগু এবং চোলের রাজত্বে তেলেগু ভাষা, চোল এবং পাণ্ড্য রাজত্বের সময় তামিল ভাষা বিশেষ উন্নত হয়। এই সব রাজাদের রাজত্বকালে সাহিত্যের যে রকম উন্নতি হয়েছিল, তার সঙ্গে নৃত্যেরও ক্রমোন্নতি হয়েছিল। তেলেগু ভাষার বহু পদ ভরতনাট্যম নৃত্যে দেখা যায়। তেলেগু শব্দটিরও একটি সুন্দর ব্যাখ্যা আছে। তেলেগু শব্দটি এসেছে ত্রিলিঙ্গ শব্দ থেকে। এর অর্থ এই, যে দেশ তিনটি লিঙ্গর দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই তিনটি লিঙ্গ হচ্ছে 'কলহস্তী', 'শ্রীশৈলম্', এবং 'দক্ষরাম',। এই জন্যে দেশটি তেলিঙ্গা নামে অভিহিত এবং পরে এর নাম হয়েছে 'তেলেগু,। তেলেগু ভাষা খুব প্রাচীন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে পাথরে উৎকীর্ণ এই ভাষার শিলালিপি এর প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে।

দক্ষিণভারতে প্রচলিত ভরতনাট্যমের অন্তর্গত 'ভাগবতমেলা নাটক' এবং 'কুচিপুড়ী' নৃত্যনাট্য তামিল ও তেলেগু ভাষার সাহিত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রধানতঃ দুজন ভক্তের অনুপ্রেরণায় এই নৃত্যনাট্যের সৃষ্টি। পুরাণ এবং ভাগবতের চিন্তাধারা এর মধ্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। পঞ্চদশ অথবা ষোড়শ শতাব্দীর ভক্তি যুগের মধ্যাহ্নে এই নৃত্যনাট্যগুলির অভ্যুদয়। পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে যে, ভক্তির উদ্ভব দ্রাবিড় দেশে, বৃদ্ধি কর্ণাটকে, মহারাষ্ট্রে স্থিতি এবং গুজরাটে জীর্ণতা।

দক্ষিণ ভারতে ভক্তিবাদের প্রচার করেছিলেন রামানুজ। একাদশ শতাব্দীতে এঁর প্রচারিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বৈষ্ণবধর্মে একটি যুগান্তর আনে। এর ফলে সমস্ত দাক্ষিণাত্য ভক্তির মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল এবং সেইজন্যেই পরবর্তীকালে সেখানকার সঙ্গীত ও নৃত্যনাট্যগুলি ভক্তিপ্রধান হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয় বৈষ্ণব-ধর্ম-প্রচারের মাধ্যমও হয়েছিল। যাঁরা 'ভাগবতমেলা নাটক' ও কুচিপুড়ী নৃত্যনাট্যের সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন তীর্থনারায়ণ জাতি এবং সিদ্ধেশ্বর স্বামী যোগী।

প্রথম মহেন্দ্রবর্মার সময় জৈনবাদ ও বৌদ্ধবাদের বিরুদ্ধে ভক্তিবাদের উদ্ভব হয় এবং আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। এই ভক্তিবাদের দলপতি ছিলেন নায়নমার ও আলোয়াররা। তাঁদের ভক্তিমূলক সঙ্গীতগুলি পরবর্তীযুগে 'দেবরাম' এবং 'দিব্যপ্রবন্ধম' নাম নিয়ে তামিল সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করেছে। সেইজন্যেই ভরতনাট্যম নৃত্যের সাহিত্য বেশ পুষ্ট এবং নৃত্যের অভিনয়াংশে শৃঙ্গাররসের সঙ্গে ফল্গুনদীর মত ভক্তিবাদও প্রবল হয়ে উঠেছে। ভরতনাট্যমের সাহিত্যকে 'লিরিক' বলা যেতে পারে। 'লিরিক' অর্থাৎ গীতিকাব্য স্বল্প পরিসরে হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করে।

ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের কথাকলি নৃত্য 'মালয়ালম' সাহিত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কথাকলি নৃত্যে যদিও ভক্তি ভাব প্রবল এবং নৃত্যের মূল উৎস ভক্তিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তবুও মণিপুরী বা ভরতনাট্যম নৃত্যের মত আত্মনিবেদনের ভাবটি—এতে নেই। পদ্মনাভ স্বামীর মন্দিরে আয়োজিত উৎসবে মন্দির প্রাঙ্গণে এই নৃত্যনাট্য হয়ে থাকে। ত্রিবাঙ্কুরের প্রায় প্রত্যেক মন্দিরের আঙ্গিনায় কথাকলি মণ্ডলের দ্বারা আয়োজিত কথাকলি নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। কথাকলি নৃত্যে মহাকাব্যের শৌর্য-বীর্য-প্রভৃতি ব্যক্ত হয়ে থাকলেও অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত ভক্তিরস অন্তরালে প্রবহমান।

মালয়ালম্ সাহিত্যকে বিশেষ প্রাচীন বলা যেতে পারে না। সঙ্গম যুগের তামিল ভাষার অনেক শব্দ মালয়ালমে পাওয়া যায়, যা পরবর্তী যুগে তামিলভাষা থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। মালয়ালম্ ভাষার উৎপত্তি নিয়ে মতবিরোধ আছে। কেউ বলেন 'কোডমতামিল' থেকে এর উৎপত্তি কেউ, বলেন সংস্কৃত ভাষা থেকে। তবে এটা ঠিকই যে, এতে প্রাচীন দ্রাবিড় ও সংস্কৃতভাষার সংমিশ্রণ রয়েছে। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কথাকলি নৃত্যনাট্যে সাহিত্য ছিল না। কালিকটের রাজা জামুরিণ কৃষ্ণগোপালকে স্বপ্নে দেখে 'কৃষ্ণঅট্টম' রচনা করেন। এই সময়ে সংস্কৃতে অনেক নাটক রচিত হয়। এই যুগকে কথাকলি নৃত্যের যুগসন্ধিক্ষণ বলা যেতে পারে। কারণ সাহিত্য নৃত্যনাট্যে একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছে। 'কৃষ্ণঅট্টম', স্বপ্নাদিষ্ট বলে এর কোন সংস্কার করা হয় নি। কোট্টরাকারার রাজা কেরল বর্মা রামঅট্টম রচনা করেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চাক্কিয়ার কুত্তু এবং নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণদের প্রচেষ্টায়

মালয়ালম্ সাহিত্যে একটি জোয়ার আসে। এর পূর্বে কুডিয়াট্টম নৃত্যের অপেক্ষাকৃত সরল সংস্করণ ছিল। কুডিয়াট্টমে সংস্কৃত পদ ব্যবহৃত হত। নৃত্যাভিনয়ের দ্বারা 'নাগানন্দম্', 'আশ্চর্য চূড়ামণি' প্রভৃতি নাটক অভিনীত হত। চাক্কিয়াররা নৃত্যাভিনয়কে পুষ্ট করবার জন্যে গদ্যে ও পদ্যে অনেক 'চম্পূ' (গদ্যপদ্যময়ী কবিতা) রচনা করেন। এই সব চম্পূতে সংস্কৃতের প্রভাব বিশেষ লক্ষ্য করা যায়। এগুলি সংস্কৃতছন্দের অনুকরণে লেখা এবং গদ্যাংশ-গুলিও কাব্যময়। পৌরাণিক কাহিনী থেকে এর আখ্যানভাগ গৃহীত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত রামায়ণ চম্পূ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কথাকলি নৃত্যনাট্যে এইরকম ২০০টি জনপ্রিয় চম্পূ যোজনা করা হয়েছে।

কথাকলি নৃত্য বিশেষভাবে বাস্তবধর্মী। নৃতনাট্যের ভেতরও জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়। কথাকলি নৃত্যনাট্যে মহা-কাব্যোচিত লক্ষণগুলি পরিস্ফুট। মহাকাব্যগুলি দেশের এবং জাতির ঐতিহ্য ও গৌরবকে প্রকাশ করে। ভারতের দুই মহাকাব্যে ভারতের আদর্শ, ঐতিহ্য, ভারতের দর্শন, গৌরব সবই প্রকাশ পেয়েছে। কথাকলি নৃত্যনাট্যের ভেতর এইরকম একটি আদর্শ দেখতে পাওয়া যায়। ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের এবং মঙ্গলের সঙ্গে অমঙ্গলের দ্বন্দ্ব; এবং শেষ পর্যন্ত ন্যায় ও মঙ্গলের জয় মানবমনকে ন্যায়ের পথে, সত্যের পথে এবং মঙ্গলের পথে চালনা করতে চায়; অধর্মের পরাজয় এবং ধর্মের জয় ঘোষণা করে ক্ষান্ত হয়। আমাদের প্রাচীন ভারতের এই হল আদর্শ এবং ঐতিহ্য। কথাকলি নৃত্যনাট্যে আমরা এরই প্রতিফলন দেখি।

কথকনৃত্যের সাহিত্য বা ভাষা সম্বন্ধে এক কথায় কিছু বলা কঠিন। কারণ কথক নৃত্য নৃত্যের ক্ষেত্রে সমস্ত উত্তর ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছে। প্রাচীনভারতে মধ্যযুগে অথবা অষ্টাদশ, উনবিংশ শতাব্দীতে এই নৃত্যের কি নাম ছিল তা বলা কঠিন; অথবা কি রূপ ছিল তা অনুমান করা কঠিন। কথক নৃত্য অন্যান্য নৃত্যের মত অনেক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আজকের রূপ নিয়েছে। এই নৃত্যের সাহিত্য হিন্দুস্থানী উর্দু, ব্রজভাষা, ভোজপুরী, মৈথেলী ও মাগধী ভাষার সংমিশ্রণ। কারণ একটি বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এর অবস্থান। রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে এবং নানাজাতির প্রভুত্বের ফলে, মনে হয় এই নৃত্য কোন একটি বিশেষ ভাষাকে অবলম্বন করতে পারে নি। সুতরাং এ

নৃত্যধারা বিশাল উত্তরাখণ্ডের প্রায় সকল ভাষার সাহিত্যকেই অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। পূর্বে কথক নৃত্যে গজল, ঠুংরী, অথবা দাদরা গানের সঙ্গে ভাও বাৎলানো (অভিনয়) হত। নবাবী যুগে উর্দুভাষার ওপর গজল গানের আমদানী হয়েছিল। উর্দুভাষার মাধুর্য গজল গানের সঙ্গে নৃত্যের মধ্যেও সঞ্চারিত হত। অযোধ্যার শেষ নবাব সঙ্গীত বিশারদ ওয়াজিদ আলি ঠুংরী গানের সৃষ্টি করেন। ঠুমক কথাটি থেকে ঠুংরীর উদ্ভব। ঠুমকের অর্থ হচ্ছে লাস্য সহকারে পদবিক্ষেপ। ঠুংরী গানে ব্রজভাষা, উর্দু ও হিন্দী শব্দ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কথকনৃত্যে বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী ও স্বভাবকবি বিন্দাদীন মহারাজের ভজন ও ঠুংরী গানও সন্নিবেশিত হয়েছে। উত্তরভারতের মন্দিরে রাসধারীরা অভিনয়ের সঙ্গে যে সকল নৃত্য করে থাকেন সেগুলি কথকনৃত্যের ভিত্তিতেই রচিত বলা যেতে পারে। সেগুলির থেকেই হয় তো আধুনিক কথক নৃত্য বর্তমান রূপ পেয়েছে। কথকনৃত্যের সাহিত্য মিশ্রভাষায় রচিত। তবে তার মধ্যে হিন্দী ও উর্দু প্রধান। মধ্যযুগের ভক্তশ্রেষ্ঠ সুরদাস ও মীরাবাঈয়ের রচনাও কথকনৃত্যের সাহিত্যকে অনেকাংশে পুষ্ট করেছে। কথকনৃত্যে আরাধ্য দেবতা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই বর্তমান কথক নৃত্যের মূল সুর।

ভারতের লোকনৃত্যেরও ধর্ম আছে। লোকনৃত্য কবে, কখন এবং কোথা থেকে সৃষ্টি হল তার কোন নির্দিষ্ট তারিখ অথবা ইতিহাস নেই। সামাজিক নীতিভেদে ও ভৌগলিক আকৃতিভেদে এই নৃত্য বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। সমস্ত সমাজের রূপ লোকনৃত্যে প্রতিফলিত হয়। লোকনৃত্য প্রকৃতির সমগ্র রূপটির সঙ্গে জড়িত। সামাজিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, মানব জীবনের বিকাশের পথে পরিপূর্ণ সহায়ক, আবার কখনও গ্রাম্যজীবনের অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ। বাংলার গাজন, গম্ভীরা, ধর্মমঙ্গল কাব্যের নৃত্যাভিনয় প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। এ ছাড়া এক শ্রেণীর সম্প্রদায় আছেন যাঁদের ধর্মোন্মাদনার প্রকাশ হয় নৃত্যের মাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ আমরা বাউল, কীর্তন প্রভৃতির উল্লেখ করতে পারি। ঝুমুর গানে 'চিকন কালার' কথা আছে, যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাণ্ডারী। উত্তর ভারতে সর্বত্র লোকনৃত্যের ভেতর নটখট কাহ্নাইয়ের কথা এসে পড়ে। দক্ষিণভারতের লোকনৃত্যের ভেতরও 'কৃষ্ণজী' সর্বত্রই বিদ্যমান।

লোকনৃত্য লোকসাহিত্যকে আশ্রয় করেছে। লোকনৃত্য কোন লোক বিশেষের সৃষ্টি নয়। লোকনৃত্য সমগ্র সমাজের সৃষ্টি। এ নৃত্য লোকপরম্পরায় চলে আসছে। লোকসাহিত্য সমাজের সুখদুঃখ, ব্যথাবেদনা, আশাআকাঙ্ক্ষা নিয়ে রচিত। এই প্রসঙ্গে মঙ্গলকাব্য, বিভিন্ন গাথা প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। যুগের পরিবর্ত্তনে অনেকসময় লোকনৃত্যের রূপ পরিবর্তিত হয়েছে; কিন্তু তবুও এই নৃত্য চিরকাল মানবমনকে রসসিঞ্চিত করছে যার ফলে লোকসঙ্গীত অথবা লোকনৃত্য এখনও শ্রোতৃবৃন্দ ও দর্শকবৃন্দের মনে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করে; নতুন শক্তির সঞ্চার করে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, ভারতবাসীর চোখে নৃত্য হচ্ছে সেই সত্য-শিব-সুন্দর-প্রেমময়-ভগবানের কাছে ভক্তের আত্মনিবেদনের একটি সুন্দরতম পথ। এই প্রেমের সাধনায় নিষ্ঠাবান ভারতীয় নৃত্যশিল্পী জাগতিক সবরকম আবিলতার উর্ধ্বে উঠে অনাবিল বিশ্বপ্রেমের সন্ধানলাভে ধন্য হন। সেইজন্যে নৃত্যশিল্পীরা বিশ্বপ্রেমিক।

ললিতকলা ও সমাজ

নৃত্তং তত্র নরেন্দ্রাণামভিষেকে মহোৎসবে।
যাত্রায়াং দেবযাত্রায়াং বিবাহে প্রিয়সঙ্গমে॥
নগরাণামগারাণাং প্রবেশে পুত্রজন্মনি।
শুভার্থিভিঃ প্রযোক্তব্যং মাঙ্গল্যং সর্ব্বকর্ম্মসু॥

ললিতকলা ও সমাজ

ভারতীয় সমাজের আদিতে ভারতীয় সঙ্গীত যে একটি মর্যাদাপূর্ণ বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস স্তব্ধ, অতীত বাক্যহারা; অতীতের দিকে দৃষ্টিগোচর হয় না। সভ্যতা যখন ভূমিষ্ঠ হয়েছিল মাত্র, তখন থেকেই ভারতবাসীর সঙ্গীতপ্রিয়তা দেখা যায়। তবে সে সঙ্গীতের রূপ অজানা। তা অতীতের অতল অন্ধকারময় গহ্বরে নিহিত।

প্রাচীন হিন্দু ধর্মশাস্ত্রগুলি থেকে বোঝা যায় যে, যাঁরা সঙ্গীতের চর্চা করে সঙ্গীতকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সমাজের এক শ্রেণীর কাছ থেকে শুধুমাত্র ঘৃণা ও অমর্যাদা পেয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এই অমর্যাদার কারণ কি? যে সঙ্গীতের উৎস দেবলোকে এবং যে সঙ্গীতপূজারীরা দেবতাদের অনুগৃহীত ছিলেন, তাঁদের ভাগ্যে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই বর্ষিত হয় নি কেন?

সকল নাট্যশাস্ত্রকাররা স্বীকার করেছেন যে, নৃত্যের জন্ম হয়েছিল দেবলোকে। কিন্তু আলোচনা করলে দেখা যায় যে, দেবভোগ্যা নৃত্যকুশলা অপ্সরা কিন্নরীরা দেবতাদের কাছে কোন মর্যাদা পেতেন না। ত্রিভুবনের মধ্যে দেবলোক শ্রেষ্ঠস্থান এবং দেবতারাই সেখানে বাস করবার অধিকারী। মহাদেবাদিদেব শিব নৃত্যের সৃষ্টি করেছিলেন, ব্রহ্মা এবং ভরতমুনি যথাক্রমে প্রচারকর্তা ও ধারক হয়েছিলেন। ইন্দ্রের দেবসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন নৃত্যকুশলা অপ্সর-অপ্সরা, কিন্নর-কিন্নরী ও গন্ধর্বদের দল। এঁরা নৃত্যগীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং দেবতাদের মনোরঞ্জন করাই এঁদের প্রধান কাজ ছিল। এইসব চিরযৌবনা, সুন্দরী অপ্সরাদের গার্হস্থ্য জীবন যাপন করবার অধিকার ছিল না। ভারতের প্রাচীন মন্দির, বিহার, চৈত্য ও গুহাশিল্পের পাথরে পাথরে এঁদের শিল্পকলা চর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রস্তরে খোদিত মূর্তিগুলি দেখলেই বোঝা যায় যে, এঁরা সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। এঁরা হৃদয়কে একটি বিশেষ পথের সন্ধান দিয়েছিলেন; সেই পথ হচ্ছে সৌন্দর্যের পথ, আনন্দের পথ। হেনরিচ্ জিমার এই মূর্তিগুলির সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর এই বিশ্লেষণ ভারতীয়

দর্শনের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। ইহজীবনে সৎকার্য করে পরজীবনে স্বর্গে গিয়ে মানবমন প্রাণভরে স্বর্গীয় আনন্দ ও সৌন্দর্য সুধা পান করতে পারবে। সৎকাজের ফলস্বরূপ এই তাদের প্রাপ্য। এই সব অপ্সর অপ্সরারা সৌন্দর্যের সুধা ভাণ্ড হাতে নিয়ে কৃতী মানবদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

রক্ষণশীল হিন্দুরা আবার অন্য অর্থ করে থাকেন। হিন্দু দর্শনে বলা হয়েছে যে, মন্দিরে প্রবেশ করতে হলে বা আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করতে হলে এবং বিগ্রহ দর্শন করতে হলে সকল রিপুকে দমন করে প্রলোভন ত্যাগ করতে হবে। এইসব সৌন্দর্য ও ভোগবিলাসের প্রলোভন ত্যাগ করে মোক্ষের পথে যিনি অগ্রসর হতে পারবেন তিনি ভগবানকে পাবার যোগ্য। স্বর্গের ভোগ্য এইসব নরনারীরা আত্মদান করে অপরকে আনন্দ দিতেন। জীবনকে পূর্ণভাবে স্বেচ্ছায় উপভোগ করবার অধিকার তাঁদের ছিল না। প্রতিটি মঙ্গলকার্যে আনন্দ দানের জন্যে তাঁদের উপস্থিতি কাম্য ছিল; কিন্তু তাঁরা সামাজিক ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে পারতেন না। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতিতে এর যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এমন কি প্রেমনিবেদনও দেবতাদের অনুমোদনসাপেক্ষ ছিল। দেবতা ও দেবতাদের অনুমোদিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারুর কাছে প্রেম নিবেদন করা নিষিদ্ধ ছিল। উদাহরণস্বরূপ উর্বশী ও পুরুরবার প্রেমের আখ্যানটি উল্লেখ করা যেতে পারে। পুরুরবার প্রতি আসক্তি-বশতঃ দেবনর্তকী উর্বশীকে নিদারুণ দণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। রাজকার্যেও এঁদের অস্ত্রহিসেবে ব্যবহার করা হত। বিশ্বামিত্র যখন ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্যে তপস্যা সুরু করলেন তখন ইন্দ্রের আদেশে অপ্সরা মেনকাকে বিশ্বামিত্রের 'ধ্যানভঙ্গ করে নিজেকে উৎসর্গ করতে হয়েছিল। কিন্তু কন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র হৃদয়ের সকল কোমল বৃত্তিকে দমন করে মাতৃত্ব বিসর্জন দিয়ে কন্যাকে পরি-ত্যাগ করে স্বর্গে ফিরে যেতে হয়েছিল। নারীর মোহিনীরূপ ছাড়া অন্য-কোন রূপেই আমরা এঁদের দেখতে পাই না সাহিত্যে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয়—

"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী"।

সামাজিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত এই সব নারীরা যদিও দেবরাজ ইন্দ্র প্রভৃতির হাতের ক্রীড়নক ছিলেন, তবুও তাঁদের শিল্পচাতুর্য সকলের কাছেই

বিশেষভাবে সমাদৃত হত।

নৃত্য শুধুমাত্র অপ্সর-অপ্সরা, কিন্নর-কিন্নরীদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল তা নয়, দেবকুলের শ্রেষ্ঠা দেবীদের ভেতরও প্রসারিত ছিল। শিবজায়া পার্বতী নৃত্যকুশলা ছিলেন এবং লাস্য নৃত্যের সৃষ্টি করেছিলেন। বাণকন্যা উষ ছিলেন নৃত্যপটীয়সী, সরস্বতী সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। এমন কি বিষ্ণুও মোহিনীরূপ ধরে বিশেষ নৃত্য-চাতুর্য-প্রদর্শন করেছিলেন। শিব নৃত্যের সৃষ্টি করেছিলেন। এই সব দেবদেবী, অপ্সর, অপ্সরা, দেবলোক, ইন্দ্রসভা প্রভৃতি মনুষ্যলোকে অজানা রয়ে গেছে। সংস্কৃত নাটকে, পুরাণে, মহাভারতে, রামায়ণে, হিন্দুধর্মগ্রন্থে আমরা এঁদের কথা জানতে পেরে কল্পনার জাল বুনি। মানুষ আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এই সব দেবদেবীদের মহৎ চরিত্র ও তখনকার সমাজের চিত্র অঙ্কিত করেছে। এর সত্যমিথ্যা বিচার আমরা করি না। আমরা জানি, দেবতারা তাঁদের কীর্তি রেখে গিয়েছেন এবং ভক্তরা তাই প্রচার করেছেন পরবর্তীকালে। সুতরাং দেবলোক আমাদের কাছে একটি রহস্যময় কল্পনার বস্তু রয়ে গিয়েছে।

যে সব নৃত্যপটীয়সী অপ্সরারা দেবসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মঞ্জুকেশী, সুকেশী, মিশ্রকেশী, সুলোচনা, সৌদামিনী, দেবদত্তা, দেবসেনা, মনোরমা, সুদতী, সুন্দরী, বিদগ্ধা, সুমালা, সন্ততি, সুনন্দা, সুমুখী, মাগধী, অর্জুনী, সরলা, কেরলা, ধৃতি, নন্দা, সপুষ্কলা, কলমা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ছিলেন উর্বশী, তিলোত্তমা, মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি।

সঙ্গীতের ইতিহাসে গন্ধর্বদের নাম বিশেষভাবে পরিচিত। এঁরা দেবলোকে বিচরণ করতেন এবং সঙ্গীতের সাধনা করতেন। দেবতা ও মানুষের মধ্যে সকল শ্রেণীর সঙ্গে এঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। শিল্পী হিসেবে সকল সমাজেই এঁরা সমাদর পেতেন এবং ত্রিভুবনের সর্বত্রই এঁদের গতি ছিল। কিন্তু এ তো স্বর্গের কথা। মর্ত্যেও শিল্পীরা সমাদর পেতেন।

প্রাচীন ভারতে সঙ্গীত পূজার উপচার হিসেবে দেবতার চরণে নিবেদিত হত। যাঁরা দেবতার পাদপদ্মে নিবেদিত সঙ্গীতের অধিকারিণী হতেন, তাঁদের দেবতার চরণে চিরদিনের জন্য উৎসর্গ করা হত। এঁদের বলা হত দেবদাসী। এই প্রথা অনুমান করা হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে চলে আসছে। এই প্রসঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক যুগের দেবদাসী মূর্তি এবং নর্তকের মূর্তিটি বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। এইসব দেবদাসীরা সমাজে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন বলেই এঁদের মূর্তি পাষাণ ফলকে খোদিত হয়েছিল।

সেই যুগে সমাজে বোধহয় জাতিভেদ প্রথা বৃত্তি অনুযায়ী নির্ধারিত হত। সুতরাং উচুনীচু ভেদাভেদের প্রশ্ন ওঠে না। তবে দেবতার পায়ে সব থেকে পবিত্র বস্তুকে নিবেদন করা মানুষের স্বভাবজাত প্রেরণা। সেইজন্যে দেবদাসীরাও দেবতার কাছে নিবেদিত বলে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

দেবদাসী প্রথা কি ভাবে প্রবর্তিত হ'ল তার একটি সুন্দর কিংবদন্তী আছে। একবার ইন্দ্রসভার নৃত্যবাসরে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা ও নৃত্যপটীয়সী উর্বশীর দৃষ্টি ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের সঙ্গে মিলিত হ'ল। এতে প্রেমমুগ্ধা উর্বশীর তালভঙ্গ হ'লে অগস্ত্যমুনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে দেবদাসী হয়ে মানবজন্ম ধারণ করতে বললেন এবং জয়ন্তকে বংশদণ্ড হও বলে অভিশাপ দিলেন। উর্বশী ও জয়ন্ত অত্যন্ত কাতর ও ভীত হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন। তাঁদের কাতরতায় ব্যথিত মুনি বললেন যে, দেবতার সম্মুখে নৃত্য করবার জন্যে যখন উর্বশীকে বংশদণ্ডের (থালাই কোল) সঙ্গে দেবতার সম্মুখে উৎসর্গ করা হবে তখন সেই শুভ মুহূর্তে তাঁদের অভিশাপ মোচন হবে। এ তো কিংবদন্তী। কিন্তু ঐতিহাসিক পটভূমিকায় আলোচনা করলে দেখা যায় যে, আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মিশ্রণে দেবদাসী প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। অনার্যরা খুবই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং তাঁদের সভ্যতা থেকে মাতৃপূজা, দেবদাসী প্রথা প্রভৃতি প্রচলিত হয়েছিল।

দাক্ষিনাত্যে অনার্যদের মধ্যে মাতৃতন্ত্রতার প্রাবল্য ছিল। অনেকসময় নারীরা পুরোহিতের স্থান অধিকার করতেন। দেবার্চনার অঙ্গ স্বরূপ নৃত্যগীতও করতেন। আর্য অভিযানের ফলে অনার্যরা পরাজিত হলেন। ফলস্বরূপ এই দুই সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিলন হল। আর্যরা অনার্যের দেবতাদের পুজো করবার জন্য ব্রাহ্মণদের নিযুক্ত করতে লাগলেন। এর ফলে পুজোর অংশটুকু ব্রাহ্মণের হাতে এলো এবং নারীরা শুধুই সঙ্গীতের দায়িত্বটুকু পেলেন এবং দেবদাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। মনে হয়, এই কারণেই দ্রাবিড় সভ্যতায় দেবদাসীর মূর্তি দেখা যায়।

প্রাচীন সমাজে শিল্পীদের স্থান—

প্রাচীনভারতে সামাজিক অবস্থায় বিশ্লেষণ করলে নৃত্যশিল্পী অথবা সঙ্গীত শিল্পীদের স্থান কোথায় ছিল তার একটি সাধারণ ধারণা জন্মায়। বৈদিক

যুগে আর্য সভ্যতার বিকাশ ঘটে। আর্যরা দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করতেন। নারীরাও পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার ভোগ করতেন। যজ্ঞক্রিয়ায় পুরনারীরা সঙ্গীত ও নৃত্য প্রভৃতির মাধ্যমে অংশ গ্রহণ করতেন। দেখা যায় যে, সঙ্গীত নিন্দার্হ ছিল না এবং এতে সঙ্গীত শাস্ত্রের নিয়মও কঠোরভাবে অনুসরণ করা হত না। কারণ মনে হয়, তখনও পর্যন্ত সঙ্গীত সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোন বিধিবদ্ধ শাস্ত্র রচিত হয় নি। কিন্তু বেদই যে ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের মূল এ কথা পূর্বেও আলোচিত হয়েছে। সেই যুগে সামাজিক অনুশাসন এত কঠোর ছিল না। পেশার গ্রহণে ও পরিবর্তনে কোন বাধাই ছিল না। সমাজের সেই সদ্য প্রসূত শিশু অবস্থায় নৃত্যকলা বিশেষ কোন শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল না। মানবিক আবেগে সকলে নৃত্য করতেন।

বৈদিক যুগের অন্তে সামাজিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শেষার্ধে জাতিভেদের প্রথা প্রখর হয়ে ওঠে। বৃত্তিকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও সূদ্র এই চার বর্ণের সৃষ্টি হল। আর্য-অনার্যের বিবাদের ফলস্বরূপ পরাজিত অনার্যরা দাস অথবা শূদ্রে পরিণত হলেন এবং তাঁদের জন্য দাসত্ব ব্যতীত আর কোন বৃত্তিই থাকল না। এক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্যে সমাজ প্রগতিবিরোধী হল। কালক্রমে এই শূদ্ররাই নটবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য অপ্রতিহত ছিল। খৃঃ পূঃ প্রথম সহস্রকের প্রথমদিকে আর্য ও অনার্যের মিশ্রণের ফলে হিন্দুধর্মের উৎপত্তি হয়। তখনই আর্যদের মধ্যে পুরোহিত শ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণদের উদ্ভব হয়। এর সংকেত ঋগ্বেদে আছে। বেদে যদিও শ্রেণীবিভাগের কথা বলা হয়েছে, তবুও কর্মহিসাবে বর্ণ বিভাগের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আছে—

ব্রাহ্মণোহস্য মুখং হ্যাসীদ্বাহু রাজন্যকঃস্মৃতঃ।
উরুস্তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রস্বজায়ত ॥

সেই পরমপুরুষের মুখ হচ্ছেন ব্রাহ্মণ, বাহুযুগল রাজন্য (ক্ষত্রিয়), উরুদ্বয় বৈশ্য এবং পদযুগল শূদ্র বলে অভিহিত হয়। কিন্তু এই বেদ তো বিজেতা আর্যরাই তৈরী করেছেন। এই বেদেই ক্ষত্রিয়রাজ জনক পাণ্ডিত্যের গুণে ব্রাহ্মণ হলেন। সুতরাং আর্যরাই জম্বুদ্বীপের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন এবং কাজের মাধ্যমে বর্ণবিভাগ করেছিলেন। ক্ষত্রিয়রা কর্মগুণে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন

কিন্তু শূদ্ররা যখনই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে গিয়েছেন, তখনই তার বিনাশ হয়েছে। সুতরাং এ কথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, বিজেতা আর্যরা বিজিত অনার্যদের নিম্নবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করেছিলেন। যাই হোক বৈদিকযুগের প্রথমার্ধে জাতি বিভাগের কেবলমাত্র সূচনা হয়েছিল বলে তা এত প্রবল ছিল না। তার কারণ, আর্যরা যখন ভারতে প্রথম বসতি স্থাপন করেন, তখন সমাজও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল বলেই কোনও সার্মাগ্রিক রূপ ধরতে পারে নি।

খৃষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে পাণিনির ব্যাকরণে 'কৃশাশ্ব' ও 'শিলালির' উল্লেখ পাওয়া যায়। ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, শিলালি প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। যাঁরা গান গাইতেন এবং নাচতেন তাঁদের 'কৃশাশ্ব' এবং যাঁরা শুধুই গান করতেন তাঁদের 'শিলালি' বলা হত। রাজসনেয় সংহিতায় 'সূত' ও 'শৈলূষ' শব্দ দুটি পাওয়া যায়—"নৃত্যায় সূতং গীতায় শৈলূষং।" মনু সংহিতার দশম অধ্যায়ের দশম শ্লোকে বর্ণিত আছে যে, ক্ষত্রিয় কর্তৃক ব্রাহ্মণ কন্যাতে জাত সন্তান 'সূত' বলে পরিচিত। ব্রহ্মপুরাণেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যথা—বৃত্তান্বেষী নটানান্ত স তু শৈলূষিকঃ স্মৃতঃ।" অর্থাৎ নটদের মধ্যে যে নট (শৈলষিক) নাট্যকে জীবিকারূপে গ্রহণ করেছে তাকে শৈলূষিক বলে। তখনও পর্যন্ত এই সব সঙ্গীতশিল্পীরা সমাজে নিন্দার্হ ছিলেন না। কারণ ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকাররা এঁদের বিরুদ্ধাচারণ করেন নি।

এর পরবর্তী যুগ থেকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে এই সকল নট নটীরা একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হয়ে সামাজিক অধিকার হারালেন। মনে হয়, এই সময় বিশেষ সামাজিক আলোড়নের ফলে এই ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। আর্য ও অনার্য সভ্যতার সংমিশ্রণের ফলে আর্যদের ভেতর যে মূর্তি পুজোর প্রচলন হয়েছিল তা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণসমাজ মূর্তি পুজো গ্রহণ করতে পারলেন না। মনে হয়, এঁরাই সঙ্গীতের বিরোধিতা করেছিলেন। এঁরা বেদের অনুগামী রইলেন। যাঁরা মূর্তি পুজো গ্রহণ করলেন তাঁদের মধ্যেও নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হল। তবে অনুমান করা যেতে পারে যাঁরা প্রাচীন রক্ষণশীল পন্থী ছিলেন তাঁরা সঙ্গীতের বিরোধিতা করেছিলেন। মনুর সময় জাতিভেদ প্রথা প্রবল আকার ধারণ করে এবং হিন্দুধর্মের বিধিনিষেধগুলিও প্রবল হয়ে ওঠে। মনুর বিধানে বলা

হয়েছে যে, ব্রাহ্মণরা সাত্ত্বিক হবেন এবং দেবার্চনা ব্রাহ্মণদের পক্ষে নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণরা শুধুমাত্র বেদগান করতে পারেন। শিব ও বিষ্ণুর আরাধনার জন্যে ব্রাহ্মণদের সঙ্গীত নিষিদ্ধ ছিল। যদিও আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মিশ্রণ হয়েছিল তবুও রক্ষণশীল আর্যরা অনার্য সংস্কৃতিকে মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারছিলেন না। সেইজন্যে যখন আর্য সংস্কৃতি অনার্য সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে লাগল, তখনই রক্ষণশীল আর্যরা তার বিরোধিতা করতে লাগলেন। পরাজিত অনার্যরা যে সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন সে কথা আগেই বলেছি। ক্রমশঃ আর্য সমাজেও সঙ্গীত জনপ্রিয় হয়ে উঠল। কিন্তু তা হ'লেও শূদ্রবংশজাত নট অথবা নটীরা সামাজিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হতে থাকলেন।

খৃষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র রচিত হয়েছিল। কৌটিল্যের সময় রাজতন্ত্র বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজনীতি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ আছে। রাজা কি রকম হবেন এবং রাজার কর্তব্য কি তা পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। চতুর্বর্ণের জন্যে নির্দিষ্ট জীবিকা অনুসারে শূদ্র সবথেকে নিম্নস্তরের বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল। কৌটিল্য বলেছেন যে, নট নটীরা শূদ্র বংশোদ্ভব হবে। নাট্যশালা গ্রামের ভেতরে হওয়া উচিত নয়। কারণ এতে গ্রামবাসিদের বাধা সৃষ্টি হয়। কুশীলবদের শূদ্র বলা হয়েছে এবং তাঁরা বহিষ্কারের যোগ্য ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ২০০ অব্দে রচিত মনুসংহিতায় নটনটীদের হেয় জ্ঞান করা হয়েছে এবং ব্রাহ্মণদের এই পেশা গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। অভিনেতার স্ত্রীর সঙ্গে কারো অবৈধ সম্বন্ধ হলেও মনু তার মৃদু দণ্ডের ব্যবস্থা করেছেন। কারণ অভিনেতা স্বয়ং অর্থের লোভে স্ত্রীকে অন্যের কাছে সমর্পণ করে আবার গ্রহণ করতেন। এইজন্যে নটের নামান্তর 'জায়াজীব'। মনু নট ও মল্লের পেশা সবথেকে নিম্ন শ্রেণীর বলেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য এবং মনু উভয়ই বলেছেন যে, কুশীলবের কথা বিশ্বাস করা উচিত নয়। কৌটিল্য ও মনুর সময় জাতিভেদ প্রথা যে প্রবল আকার ধারণ করেছিল এবং নটনটীরা যে ব্রাহ্মণদের ঘৃণার পাত্র হয়েছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। মনু বলেছেন, কোন ব্রাহ্মণের রঙ্গমঞ্চের অভিনেতার সঙ্গে ভোজন করা উচিত নয়। এর কারণ নটনটীদের উৎপত্তি শূদ্র থেকে। পতঞ্জলির 'মহাভাষ্যে' বলা হয়েছে যে, নটের স্ত্রী যাকে প্রয়োজন তাকেই ভজনা করে। এইজন্য নটী ব্যাপক অর্থে গণিকার সঙ্গে সমার্থক।

তবে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, অনার্যরা বিজিত ছিলেন বলে দাস অথবা শূদ্র শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। দাসরা স্বাধীন ছিলেন না। অন্যান্য তিন বর্ণ তাঁদের ওপর প্রভুত্ব করতেন। অনেক সময় ইচ্ছের বিরুদ্ধে নটনটীদের হীন পন্থা অবলম্বন করতে হত এবং তাঁদের সকল সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হত। এইভাবে জাতিভেদের প্রাবল্যে বৈদিকযুগের সহজ সরল অনাড়ম্বর গ্রাম্য জীবন জটিল হয়ে উঠেছিল। সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গীতেরও বিবর্তন হতে লাগল এবং জটিলতর হয়ে উঠতে লাগল। সঙ্গীত অন্য রূপ ধারণ করল। ভরত, নট, নটী, কুশীলব, কৃশাশ্ব, শিলালি, সূত্রধর প্রভৃতি সঙ্গীতজীবিরা সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হয়ে সঙ্গীতকে জীবিকারূপে গ্রহণ করে একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হলেন। অমরকোষে দেখা যায় যে, নটদের বহু নামে অভিহিত করা হত,—

"শৈলালিনস্তু শৈল্‌ষা জায়াজীবাঃ কৃশাশ্বিনঃ।
ভরতা ইত্যপি নটাশ্চারণাস্তু কুশীলবাঃ ॥"

'ভরত' বলতে সাধারণতঃ নটদেরই বোঝায়। কিন্তু 'ভরত' বলে একটি জাতির উল্লেখও পাওয়া যায়। অথর্বসংহিতার যুগে আর্যরা মধ্যভারত ও পূর্ব ভারতের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। ভরতরাই এর পুরোধা ছিলেন। সুতরাং সেই জাতি থেকে উদ্ভূত নটরা ভরত নামে অভিহিত হয়েছেন কি না তা ভাববার বিষয়। যাই হোক, সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের মনোরঞ্জনের জন্যে এই সকল নটী ও নটরা সঙ্গীতশিল্পের প্রয়োগ করতে লাগলেন। বেদ থেকে জাত সঙ্গীতকে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিতে অনুসরণের দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হ'ল। এইভাবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের উদ্ভব হ'ল।

কিন্তু একটি আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, বিভিন্ন ধর্মের উদ্ভব ও গৃহযুদ্ধের ফলে সঙ্গীতের কোন হানি হয় নি। সেইজন্য বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী রাজাদের সময়েও সঙ্গীতের রথচক্র অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হয়েছে। শুদ্ধোদনের অন্তঃপুরে নর্তকীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এঁরা উদাসীন রাজকুমারের মন হরণ করবার জন্যে নৃত্য করতেন। ধ্যানমগ্ন বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করবার জন্যে 'মার'-এর কন্যাদের নৃত্য করতে হয়েছিল। বুদ্ধের উপদেশে বহু নটী পূর্ব জীবিকা এবং জীবনের সকল সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে ভিক্ষুণী হয়েছিলেন। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এরকম বহু উদাহরণ পাওয়া যায়।

ষোড়শ শতাব্দীতে 'জীবে দয়া' করবার জন্যে আর একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল। 'আমিয় নিমাই চরিতে' আছে যে, দাক্ষিণাত্যে মহাপ্রভু যখন 'জিজরী' নগরের 'খাণ্ডবা'কে দর্শন করতে গিয়েছিলেন, তখন তিনি 'মুরারি'দের উদ্ধার করেছিলেন। যে কন্যাদের বিবাহ হত না, তাঁদের খাণ্ডবার সঙ্গে বিবাহ হত। খাণ্ডবার মন্দির কর্তৃপক্ষ এঁদের পালন করতেন এবং এঁরা ঠাকুরের সামনে নৃত্য করতেন। এঁদের 'মুরারি' বলা হত। কালক্রমে এঁদের ভেতর ব্যভিচার প্রবেশ করে এবং এঁরা সমাজে ঘৃণিত, নিন্দিত এবং পৃথক শ্রেণীভুক্ত হয়ে নির্দিষ্ট এলাকায় বাস করতে থাকেন। মহাপ্রভুর কৃপায় এঁরাও উদ্ধার পেয়েছিলেন।

বহু প্রাচীনকালে জনসাধারণের জন্যে যে আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করা হত, তাতে আনন্দদানের জন্যে নটনটীদের অংশ গ্রহণ করতে হত। মৌর্যযুগে বিম্বিসারের রাজত্বকালে এই রকম একটি অনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন হত। একে পালি ভাষায় 'গিরগ্‌গা সমজ্জা' বলা হত। 'গিরগ্‌গা সমজ্জা'তে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হত। নটনটীরা অভিনয়ের দ্বারা উৎসবকে আনন্দোজ্জ্বল করে তুলতেন। এতে নৃত্যগীতেরও আয়োজন করা হত। অশোকের সময় পর্যন্ত এই 'সমজ্জা'র ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তী সময়ে অশোক কিন্তু একে ধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী কয়েকটি বিশেষ যুগে সঙ্গীত রাজা মহারাজদের কাছে প্রিয় হওয়ায় অভিজাত শ্রেণীর মহিলা মহলেও এর বিস্তৃতি ঘটে। মহাকবি কালিদাসের রচিত 'মালবিকাগ্নিমিত্রম' নাটকে পাওয়া যায় যে, রাজা অগ্নিমিত্র মালবিকাকে বিয়ে করবার পূর্বে তার নৃত্যকলাদির পরীক্ষা করেছিলেন। কথাসরিৎসাগরে আছে যে, বৎসরাজ উদয়ন একজন উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। উজ্জয়িনীরাজ চন্দ্রমহাসেন তাঁর কন্যা বাসবদত্তাকে সঙ্গীতে পারদর্শিনী করবার জন্যে কৌশলে উদয়নকে বন্দী করেছিলেন এবং সঙ্গীত শিক্ষা দেবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। উদয়নের সঙ্গীতচাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে বাসবদত্তা তাঁকে বিয়ে করেন। অভিজাত শ্রেণীর স্ত্রী ও পুরুষরাও যে বিলাস হিসেবে সঙ্গীতের চর্চা করতেন, তার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। কালক্রমে নটনটীরা এইরকম উচ্ছৃঙ্খল হয়েছিলেন যে, তাঁরা জনসাধারণের ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। সেইজন্যে কঠোর সামাজিক অনুশাসনের ফলে পরবর্তীকালে সঙ্গীত অভিজাত শ্রেণীর মহিলা মহল থেকে বিদায় নিয়েছিল।

কতকগুলি গ্রন্থের উল্লেখ করা যেতে পারে যাতে নাট্যকার অথবা অভিনেতা-দেরও সম্মানিত করা হত। হর্ষচরিতে বাণভট্ট অভিনেতা অভিনেত্রীদের মিত্রস্থানীয় বলে গণ্য করেছেন। 'প্রাকথনে' ভবভূতি অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মিত্রস্থানীয় বলে দাবী করেছেন। তাঁর নাটকের সূত্রধার ও অভিনেত্রীরা অবশ্যই সুশিক্ষিত এবং সংস্কৃতজ্ঞ হবেন। অতএব যাজ্ঞবল্ক্য ও মনু নটনটীদের বিরুদ্ধে বিধান প্রস্তুত করে তাঁদের যতখানি নিন্দনীয় ও সামাজিক মর্যাদা থেকে বিচ্যুত করেছিলেন প্রকৃতপক্ষে তাঁদের তা প্রাপ্য ছিল না। বরং বলা যেতে পারে, বিজিতের ওপর বিজেতার মনোভাব নিয়েই তাঁরা এই সুন্দর ললিতকলা ও তার একনিষ্ঠ সেবকদের দমন করতে চেয়েছিলেন। কারণ আর্যরা ছিলেন বিজেতা। সেইজন্যে আর্য কর্তৃক আরোপিত উদ্দেশ্য-মূলক সামাজিক অনুশাসনের ফলেই বিজিত শূদ্রদের দ্বারা বৃত্তিরূপে গ্রহনীয় সঙ্গীত বিজেতৃসমাজে নিন্দনীয় ছিল। কিন্তু আর্যরা একে বৃত্তি রূপে নয়, বিলাস রূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং সেইজন্যে মনে হয় সঙ্গীত অভিজাত শ্রেণীতে দূষনীয় ছিল না।

নটীরা যে বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। যোগীমারা গুহায় এক দেবদাসী ও চিত্রকরের নাম খোদিত আছে। এই দেবদাসীর নাম সুতনুকা এবং চিত্রকরের নাম ছিল দেবদত্ত। সুতনুকা অভিনেত্রী ও নর্তকী ছিল। এখানে দেবদাসী অর্থে গণিকা অথবা অভিনেত্রী। এতে খোদিত আছে যে, সুতনুকা বালক বালিকাদের বিশ্রামের জন্যে এই গুহা নির্মাণ করিয়েছিলেন এবং দেবদত্ত এর চিত্রকর ছিল। সীতাবেঙ্গা গুহাও রঙ্গশালা, নৃত্যশালা; প্রেক্ষাগৃহ প্রভৃতিরূপে ব্যবহৃত হত। এখানে কাব্যপাঠ হত এবং রূপ-রস-আনন্দকে উপভোগ করবার এটি প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল। কালোচিত প্রথানুসারে এই সব গুহা, গ্রাম নগরের বাইরে থাকত। সুতরাং এর থেকে নটীদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। এ কথা সহজেই অনুমেয় যে, খৃষ্টপূর্ব থেকে ব্রাহ্মণদের দ্বারা নটনটীদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছিল এবং নট-নটীরাও সমাজপ্রদত্ত এই কলঙ্কময় জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ভরত কর্তৃক প্রচারিত নাট্যশাস্ত্র মনে হয়, এই বিধানের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অবশ্য নন্দিকেশ্বরের অভিনয় দর্পণের উল্লেখও করতে পারি। কারণ অনেকে মনে করেন অভিনয় দর্পন নাট্যশাস্ত্র থেকে অধিকতর

প্রাচীন। অবশ্য এর সঙ্গত কারণ সম্পর্কে অনেকে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করেন। যাই হোক, এই সকল সঙ্গীতশাস্ত্রগুলিতে নট, নটী, সূত্রধর, নায়ক নায়িকা, পারিপার্শ্বিক, সভাপতি ইত্যাদির নিজ নিজ ভূমিকায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, রঙ্গভূমি নির্বাচন, রঙ্গশালা শুদ্ধিকরণ, রঙ্গপূজা, ইত্যাদির দ্বারা বিপথগামী নটসমাজকে সচেতন করে তুলবার চেষ্টা করা হয়েছে। বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তিকেও খণ্ডন করবার জন্যে শুভলগ্নে দেবতাশ্রেষ্ঠ মহেশ্বর কর্তৃক সঙ্গীতের যে জন্ম হয়েছিল তার বর্ণনাও করা হয়েছে। সঙ্গীত শাস্ত্রগুলিতে দেব, দেবী, মুনি ও ঋষিদের উল্লেখ করা হয়েছে। খৃষ্টীয় প্রথম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিভিন্ন সঙ্গীতশাস্ত্রকাররা সঙ্গীতের মহান আদর্শ ও অনুশাসনগুলি লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। সঙ্গীত শাস্ত্রকারদের মধ্যে ভরত, নন্দিকেশ্বর, কোহল, নারদ শার্ঙ্গদেব প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কালক্রমে অনার্যদের অপাংক্তেয় সঙ্গীত অভিজাত শ্রেণীর ভেতরও মর্যাদা লাভ করে, এ কথা যে পূর্বেও বলা হয়েছে তার মূলে ছিল সঙ্গীত ও নাট্যশাস্ত্রকারদের সাধনা ও প্রচার। তাঁদের মতে দেবকুল থেকে সঙ্গীতের জন্ম বলে সঙ্গীত দেবতার ভোগ্য এবং সঙ্গীত-শিল্পীরাও দেবতারই চরণে নিবেদিত হবার উপযুক্ত। এ কথা সত্য যে, শুধু অভিজাত শ্রেণী নয়, বর্ণ ও শ্রেণী নির্বিশেষে ভরত সকলকেই নাট্যে সমান অধিকার দিয়েছিলেন। এইভাবে নাট্যকার, নট, নটী, সূত্রকার, নর্তক, নর্তকী সকলেই যথাযোগ্য সম্মান পেয়েছিলেন।

দেবদাসী—

আনুমানিক একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত দেবদাসীদের ভেতর কোন ব্যাভিচার প্রবেশ করে নি। এই সময় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মন্দির তৈরী হতে থাকে। ভারতীয় রাজারা এর উদ্যোক্তা ছিলেন। এই সব রাজাদের ভেতর রাষ্ট্রকূট, চোল ও পল্লব বংশীয়রা প্রধান ছিলেন। ঐ সব মন্দিরে দেবদাসীদের নিযুক্ত করা হত। দেবদাসী প্রথা শুধু ভারতে নয়, এশিয়া এবং ইউরোপেও প্রচলিত ছিল। Ruby Ginner তাঁর 'The Gateway to the Dance' এ গ্রীক দেবদাসীদের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, গ্রীক দেবদাসীরা বেগুনী রঙের পাড়ওয়ালা সাদা রঙের পোষাক পরতেন। তাঁদের মাথায় ওড়না থাকত। তাঁরা মন্দিরের আগুন প্রজ্বলিত রাখতেন, উপচার আনতেন এবং প্রার্থনা করতেন। গ্রীসে দেবদাসীদের ভেতর যে

সব নৃত্য প্রচলিত ছিল, তার ভেতর 'ভেষ্টাল ভার্জিন' সবথেকে উল্লেখযোগ্য। এক জায়গায় ginner উল্লেখ করেছেন—"Long robed Ionians delighted the god with dancing and song "

ভারতের মন্দিরের দেবদাসীরা বিশুদ্ধ নাট্যশাস্ত্রমতে নৃত্য করতেন। এক একটি মন্দিরে প্রায় চারশ থেকে পাঁচশ জন দেবদাসী থাকতেন। দেবদাসীদের সঙ্গে নৃত্যশিক্ষক ও বাদ্যকরও থাকতেন। ১০০৩ থেকে ১০০৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজরাজা যে বৃহদেশ্বরের মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন তার গায়ে খোদিত আছে যে, তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৪০০ দেবদাসী, নৃত্যশিক্ষক ও বাদ্যকর আনিয়েছিলেন। প্রত্যেক দেবদাসীর পরিচয় ওই মন্দিরের গায়ে খোদিত আছে। মন্দিরের অর্থকোষ থেকে এঁদের ব্যয়ভার বহন করা হত এবং এঁরা শিল্পচর্চার দ্বারা মন্দিরের দেবতার সেবা করতেন। এই সব দেব-দাসীদের জীবন মন্দিরের দেবতার পায়ে সমপর্ণ করা হত। দেবতাকে এঁরা স্বামী বলে গ্রহণ করতেন। এঁদের 'নিত্যসুমঙ্গলী' বলা হত; অর্থাৎ এঁরা চিরসৌভাগ্যবতী ছিলেন। দেবদাসীদের প্রধান নিত্যকর্ম ছিল দেবতার সেবা করা। দেবতার সঙ্গে বিবাহের সময় এঁদের গলায় টালি অথবা বটু বাঁধা হত।

দেবদাসী প্রথা পূর্বে ভারতের প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত ছিল। কালক্রমে ঘটনাচক্রে এই প্রথা বিশেষভাবে দাক্ষিণাত্যের মাদ্রাজ অঞ্চলে ও উড়িষ্যায় কেন্দ্রীভূত হয়।

দেবদাসী যদিও একটি সম্প্রদায় বিশেষ তবুও এর মধ্যে কয়েকটি ভাগ ছিল এবং তাঁদের কাজও পৃথক ছিল। এই দেবদাসীরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন —দেবদাসী, রাজদাসী ও অলঙ্কার দাসী। দেবদাসীদের কাজ ছিল মন্দিরের অভ্যন্তরে নৃত্য করা ও সেবা করা। মন্দিরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঘটনা ও উৎসবকে কেন্দ্র করে এঁদের নৃত্য অনুষ্ঠিত হত। নটরাজ শিবের মন্দিরে ধ্বজা-রোহণ একটি বাৎসরিক উৎসব এবং এই উৎসবে নৃত্য-গীতের ব্যবস্থা হত। এই উৎসবে দেবদাসীরা নববস্ত্র পরে এবং অলঙ্কার ও ফুলে ভূষিত হয়ে 'নবসন্ধি' নৃত্য করতেন। নয়টি সন্ধিস্থলের দেবতাদের উদ্দেশ্য করে এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হত। যখন শিবমূর্তির অবগাহন হত তখন দেবদাসীরা তাণ্ডবপদ্ধতিতে 'মালাপ্পু' নৃত্য করতেন। এর সঙ্গে 'পঞ্চমুখ' বাদ্যে সঙ্গত করা হত। 'পঞ্চমুখ' বাদ্যে শিবের 'পঞ্চমুখ' অনুকরণে' পাঁচটি মুখ থাকত। এই পাঁচটি মুখে একাধারে তালও.

স্বর নির্গত হত। এর সঙ্গে শঙ্খ, মন্দিরা ও 'একলম' (ধাতব বাঁশী) সহযোগিতা করত। এছাড়া অন্যান্য বাদ্যও সহযোগিতা করত। এর মধ্যেও নৃত্য থাকত। এই বাদ্যানুষ্ঠানটিকে 'সর্ববাদ্য' বলা হত। রাজদাসীরা রাজ্যের এবং অন্যান্য উৎসবে নৃত্য করতেন। অলঙ্কারদাসীরা সামাজিক উৎসবে যথা বিবাহ, পুত্র-জন্মোৎসব, ইত্যাদিতে নৃত্য করতেন। এই উৎসবে দেবদাসীদের নৃত্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বলে পরিগণিত হত। নাট্টুবানেরা মন্দিরে দেবদাসীদের সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। এঁরা অব্রাহ্মণ নট্টুভমেলা সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত। এঁরা জন্মসূত্রে প্রতিভাবান, নৃত্যজ্ঞ ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তৃতীয় কোলাথুঙ্গার রাজত্বের সময় দেবদাসীদের 'নট্টুভ নিলাই' ও 'নট্টুভকনি' প্রভৃতি বৃত্তি দেওয়া হত। পরবর্তী জীবনে এই দেবদাসীরা গার্হস্থ্যজীবন যাপন করতে পারতেন এবং স্ত্রীধন লাভ করতেন। এই প্রথা অনেকদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

নৃত্যশিক্ষা আরম্ভের সময় দেবতার পুজো করা হত ও পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হত। পায়ে ঘুঙুর বেঁধে দেবদাসীরা হাতে রেশমী কাপড় মণ্ডিত একটি বংশদণ্ড ধারণ করে নৃত্যশিক্ষা পর্ব আরম্ভ করতেন। এই বংশদণ্ডটি শাপভ্রষ্ট জয়ন্তের প্রতীক। সাত বছর পর শিক্ষা সমাপনান্তে মন্দিরে দেবতা ও রাজাদের সম্মুখে দেবদাসীদের 'আরাঙ্গাট্রেল'[১] হত। দক্ষিণভারতে এখনও পর্যন্ত-'আরাঙ্গাট্রেল' হয়ে থাকে'।

চোড়গঙ্গদেব কর্তৃক নির্মিত উড়িষ্যার পুরীর মন্দিরে দেবদাসী নৃত্য অপরিহার্য ছিল। ভুবনেশ্বরে খোদিত লিপি থেকে জানা যায় যে, নবম শতাব্দীতে উড়িষ্যায় দেবদাসী প্রথা প্রচলিত ছিল। রাজনৈতিক গোলযোগ ছাড়া একদিনের জন্যেও মন্দিরের নাচ বন্ধ হয় নি। উড়িষ্যার এই সকল দেব-দাসীদের 'মাহারী' বলা হত। এই সকল মাহারীরা স্বর বেশ্যা অথবা 'নাচুনী' বলেও পরিচিত ছিলেন। দেবদাসীদের ভেতরও শ্রেণীভেদ ছিল। যাঁরা সঙ্গীতপারদর্শিনী তাঁদের 'গীতগণি' এবং যাঁরা চামরধারিনী তাঁদের 'গৌরগণি' বলা হয়ে থাকে। পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের দেবদাসীরা বৈষ্ণব এবং ভুবনেশ্বরের একলিঙ্গের মন্দিরের দেবদাসীরা শৈব। মাহারীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন

১। আরাঙ্গাট্রেল—শিক্ষা সমাপনান্তে দেবতার সম্মুখে শিক্ষার্থীর দ্বারা প্রদর্শিত প্রথম নৃত্যোৎসব।

—'ভিতরগণি' ও 'বাহারগণি'। ভিতরগণিরা রাত্রিতে শৃঙ্গারের সময় বড় দেউলে প্রবেশ করতে পারতেন এবং নৃত্য গীতের দ্বারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করতেন। বাহারগণিরা মন্দিরের সংলগ্ন নাটমন্দিরে নৃত্য করতেন। এঁদের অস্তিত্ব এখনও পর্যন্ত রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এ ছাড়া মাহারীদের ভেতর আরও চারটি শ্রেণী ছিল—(১) পাতুয়ারী, (২) রাজঅঙ্গিলা (৩) গহন ও (৪) নাচুনী। ঐতিহাসিক গবেষণাগার থেকে যে তথ্য প্রকাশ পেয়েছে তাতে জানা যায় যে, পূর্বে মাহারীরা সাত্ত্বিক জীবন যাপন করতেন। তাঁরা বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং পুরুষ সঙ্গ বর্জন করতেন। মন্দিরের দেবতাদের সঙ্গে তাঁদের বিয়ে হত এবং মন্দিরে দুবার করে তাঁদের নাচতে হত। নাচবার পূর্বে স্নান করে পবিত্র হয়ে তাঁরা মন্দিরে প্রবেশ করতেন। সেখানে রাজগুরু স্বর্ণমণ্ডিত দণ্ড নিয়ে উপস্থিত থাকতেন। মাহারীরা প্রথম দেবতা ও পরে রাজ-গুরুকে প্রণাম করে নৃত্য আরম্ভ করতেন। নাচবার সময় একমাত্র দেবতা ছাড়া আর কিছু চিন্তা করবার নিয়ম ছিল না এবং সুযোগও ছিল না। মাহা-রীদের জীবনযাত্রা প্রণালী থেকে আমরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের দেবদাসীদের সম্বন্ধেও সাধারণভাবে একটা ধারণা করে নিতে পারি। এ কথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এককালে এঁরা ধর্মপ্রবণ ও সৎ ছিলেন।

দক্ষিণ ভারতীয় দেবদাসীদের মধ্যেও শ্রেণী বিভাগ ছিল। প্রচলিত রীতি-নীতিও প্রায় একই রকম। এঁরা দেবদাসী, রাজদাসী ও অলঙ্কারদাসী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। এখানেও দেবদাসীরা মন্দিরের ভেতর দেবতার সম্মুখে নৃত্য করতেন। বাহারগনিদের মত রাজদাসীদেরও মন্দিরের ভেতর প্রবেশের অধিকার ছিল না। তাঁরা ধ্বজস্তম্ভের সম্মুখে নৃত্য করতেন। অলঙ্কার-দাসীরা রাজকীয় উৎসবেও নৃত্য করতেন। অলঙ্কার দাসীরা বিয়ে অথবা সামাজিক উৎসবে নৃত্য করতেন। দক্ষিণ ভারতীয় দেবদাসীদের মধ্যে অধিকাংশই শৈব।

ভারতের পূর্বপ্রান্তে মনিপুরেও দেবদাসী প্রথার প্রচলন ছিল এবং এখনও পর্যন্ত আছে। যদিও মন্দিরের ভেতর কঠিন নিয়মাবলীর মধ্যে তাঁদের নৃত্য গীত করতে হত না, তবুও এঁদের সাত্ত্বিক জীবন যাপন করতে হত এবং দেবস্থানে নৃত্যগীতে প্রধান অংশ গ্রহণ করতে হত। এঁদের যথাক্রমে 'এ্যামাইবী' ও 'এ্যামাইবা' বলা হয়। অর্থাৎ এঁরা দেবদাসী ও দেবদাস। কখনও কখনও

এঁরা মূৰ্ছিত হয়ে ভবিষ্যৎবাণী করেন। এই সকল ম্যাইবী ও ম্যাইবারা বিবাহাদি করে সংসার করেন না। শিশু বয়স থেকেই এঁদের দেহে ম্যাইবী ও ম্যাইবা হবার লক্ষণ প্রকাশ পায়। কারুর মাথায় জটা দেখা দেয়; আবার কেউ হয় তো বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে পড়েন। কেউ হয় তো ভগবানের নাম শোনামাত্র সাত্বিক ভাবাছন্ন হয়ে পড়েন। তখন তাঁদের ম্যাইবী ও ম্যাইবা করা হয়। সব রকম বিলাসিতা বর্জন করে এঁরা শ্বেতবস্ত্র পরেন। লাইহারাওবা নৃত্যের সময় এঁরা প্রধান অংশ গ্রহণ করেন ও নৃত্যমণ্ডলী পরিচালনা করেন। লাইহারাওবা নৃত্যের পূর্বে একটি ঘোড়াকে শ্বেত পতাকা দিয়ে সজ্জিত করে শোভাযাত্রার পুরোভাগে রেখে শোভাযাত্রীরা নদী অভিমুখে যাত্রা করে। সেখানে এ্যামাইবী জল থেকে জীবের সৃষ্টি করে গ্রামের প্রান্তে (অভিনয়ের মাধ্যমে) উমঙ্গলাইর (বনদেব—লাইনিংথো, ও বনদেবী—লাইরেম্বীর) পুজো করেন। এর পর দশদিকের পুজো (পূর্বরঙ্গ) করে তাণ্ডব ও লাস্য ভঙ্গী সহকারে নৃত্য করেন। ম্যাইবী প্রথম গান সুরু করে নৃত্য করেন এবং অন্যান্য নর্তকীরাও তাঁকে অনুসরণ করে। এইভাবে এ্যামাইবী ও এ্যামাইবারা লাইপোক (লাই—দেবতা, পোক—জল) এবং লসিং (তুলা) নৃত্যের মাধ্যমে দেখান; অর্থাৎ জলের ভেতর প্রথম জীবসৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে তুলোর চাষের রূপায়ণের মাধ্যমে মানব জন্মের ক্রম বিকাশ ও পরিণতি পর্যন্ত একটি সংক্ষিপ্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া প্রদর্শন করে পুজো সমাপনান্তে তাঁরা শুদ্ধচিত্তে নৃত্য করেন। এই সকল এ্যামাইবীরা ইচ্ছে করলে এই জীবন পরিত্যাগ করে সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করতে পারেন। কিন্তু তখন তাঁরা আর এ্যামাইবী থাকেন না। ভারতের অন্যান্য প্রান্তে দেবদাসী প্রথা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে; কিন্তু মণিপুরে এ্যামাইবা ও এ্যামাইবীরা এখনও পর্যন্ত এই জীবন অতিবাহিত করে থাকেন।

সেই সময় নটী ও দেবদাসীদের মধ্যে একটি প্রভেদ ছিল। দেবদাসীরা কেবলমাত্র দেবতার ভোগ্যা ছিলেন এবং মন্দির কর্তৃপক্ষ এঁদের ব্যয়ভার বহন করতেন। তাঁরা ধর্মের জন্যে শুদ্ধ, পবিত্র ও সৎজীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য ছিলেন। আধ্যাত্মিকতা তাঁদের জীবনকে মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ করত। ভক্তমণ্ডলী তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাত। দেবদাসীদের কোন সামাজিক দায়িত্ব ছিল না এবং এঁরা কোনদিনই বিবাহ করতে পারতেন না।

অপরপক্ষে নটীরা এইরকম কোন ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।

পুরুষসঙ্গ তাঁদের কাছে বর্জনীয় ছিল না। তাঁদের সঙ্গীত ছিল জনসাধারণের জন্যে। রাজা, মহারাজ, অমাত্য, প্রজা সকলেই অর্থের বিনিময়ে সঙ্গীতরস ও সৌন্দর্যসুধা উপভোগ করতে পারতেন। প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে এঁরা নৃত্যগীত করতেন ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন। এঁরা ছিলেন গণিকাশ্রেণীভুক্ত।

দেবদাসীরাও কালক্রমে সামাজিক মর্যাদা ও শ্রদ্ধা হারালেন। এঁদের ভেতরেও ব্যভিচার প্রবেশ করল। এঁরা দেবনর্তকী থেকে রাজনর্তকীতে পরিণত হলেন। রাজা ও অমাত্যদের মনোরঞ্জনের জন্যে রাজসভায় নৃত্য করতে লাগলেন। দেবভোগ্যা রাজভোগ্যা হয়ে উঠলেন। লোকবৃদ্ধির প্রয়োজনেও তাঁরা ধীরে ধীরে অধঃপতনের দিকে যেতে লাগলেন। বৈদেশিক আক্রমণ এঁদের অধঃপতনকে আরও ত্বরান্বিত করে তুলল।

১১০০ খৃষ্টাব্দে মুসলমানরা সোমনাথের মন্দির আক্রমণ করে এবং বহু দেবদাসী বিদেশী শাসনকর্তাদের হাতে বন্দিনী ও ধর্মচ্যুতা হয়ে বিদেশে প্রেরিত হয়েছিলেন। উত্তর ভারত বারবার বিদেশীদের দ্বারা আক্রান্ত হলে সেখানে দেবদাসী প্রথা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এইভাবে উত্তরভারতে দেবদাসী প্রথা একেবারে বিলুপ্ত হলেও দক্ষিণ ভারতে ও উড়িষ্যায় এই প্রথা আরও কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

ঐস্লামিক অভিযানের ফলে পরাজিত রাজন্যবর্গ দেবদাসীদের সভানর্তকী ও রাজনর্তকীতে রূপান্তরিত হতে বাধ্য করলেন। উদাহরণস্বরূপ খুরদা রাজ্যের রামচন্দ্রদেবের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে মোগলরা রামচন্দ্রদেবকে জগন্নাথমন্দিরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করল। রামচন্দ্রদেব মাহারীদের খুরদার সভানর্তকী করলে তাঁরা 'খুরদানির্যোগ' বলে পরিচিত হ'লেন এবং অচিরে পুরীর রাজসভারও সভানর্তকী হলেন।

তাঞ্জোরের প্রথম ও দ্বিতীয় কোলাথুঙ্গা, দ্বিতীয় রাজরাজন ও তৃতীয় কোলাথুঙ্গা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সঙ্গীত শিল্পকলার বিশেষ উন্নতি করেন। তৃতীয় কোলাথুঙ্গার রাজত্বের সময় তিরুভিদামারুবুর মন্দিরে নর্তক নর্তকীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। তাদের 'নট্টুভ নিলাই এবং 'নট্টুভক্কনি' নামে বৃত্তি দেওয়া হত। এই নর্তক নর্তকীদের মধ্যে কেউ কেউ বিয়ে করতে পারতেন এবং স্ত্রীধন[১] লাভ করতেন। এ কথা সহজেই অনুমেয় যে, বৈদেশিক

[১] বিয়ের সময় প্রাপ্য বহুমূল্য অলঙ্কার প্রভৃতি ও অস্থাবর সম্পত্তিকে স্ত্রীধন বলে।

আক্রমণের প্রভাবে ভারতের জীবনযাত্রা যখন বিপর্যস্ত এবং ধর্ম আক্রান্ত, তখনই এই সকল দেবদাসীদের ভেতর অনাচার প্রবেশ করে তাঁদের ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁদের ভেতর আর্থিক সমস্যা এমন প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল যে, তাঁরা বিকল্প জীবিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। এঁদের মধ্যে অনেক নর্তক, নর্তকী, নাট্যকার ও শিক্ষাগুরু ছিলেন। এঁদের জন্যে সঙ্গীতের প্রবাহ শত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও কখনও রুদ্ধ হয় নি; যার ফলস্বরূপ বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের যুগেও মানুষ ভারতের সঙ্গীত সুধা পান করে তাপিত হৃদয়কে শীতল করছে। পুরাকালে যাঁরা নটনটী অথবা দেবদাসী ছিলেন, কালক্রমে মুসলমান ও ইংরাজ যুগে তাঁরাই বাঈজী এবং তাঁদের শিক্ষাদাতারা ওস্তাদ অথবা গুরু বলে অভিহিত হ'লেন। এঁরাই বর্তমানে ভারতীয় সঙ্গীতের ধারক ও বাহক।

ইংরেজ রাজত্বের প্রথমার্ধে সঙ্গীত প্রবাহ প্রায় রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। জমিদার অথবা রাজা মহারাজ উপাধিধারী ব্যক্তিরা এই সকল বাঈজীদের রক্ষিতা হিসাবে রাখতেন। এই রাজা মহারাজরাই পারিষদ্‌দের সঙ্গে এই সঙ্গীত সুধা পানের অধিকারী ছিলেন। জনসাধারণ এর থেকে বঞ্চিত হল। শুধু তাই নয়, এই সকল সঙ্গীত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণাও পুঞ্জীভূত হতে লাগল। সুতরাং জনসাধারণের ভেতর এর চর্চাও বন্ধ হয়ে গেল। স্বাধীনতা পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সঙ্গীত এইরকম একটি পঙ্কিলময় আবর্তের মধ্যে রুদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাওয়ার পর জমিদারী প্রথা লোপ পেল এবং সঙ্গীতও পঙ্কিলময় গহ্বর থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়ে দুকূল ভাসাতে লাগল।

আধুনিক যুগে সঙ্গীতদেবী আবার নবরূপে পূজিতা হচ্ছেন। নবজাগরণের যুগে সমাজের বন্ধন কেটে গিয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের সঙ্গীত গ্রহণে কোন বাধা নেই। সঙ্গীত পিপাসুমাত্রই সঙ্গীতকে গ্রহণ করতে পারেন। ললিতকলার উপাসকরা ভেদাভেদ ভুলে সিদ্ধিলাভের জন্যে ব্যাপকভাবে বাগ্‌দেবীর আরাধনা করছেন। ইংরেজ রাজত্বে যা সঙ্কুচিত হয়ে লোপ পেতে বসেছিল, তা পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। তাই আজ এই কলার ব্যাপক অনুশীলন দেখা দিয়েছে।

নৃত্যে রসবিচার

"ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ় দর্পকন্দর্পদর্পহা।
জয়তি শ্রীপতির্গোপীরাসমণ্ডলমণ্ডিতঃ।"

নৃত্যে রসবিচার

হাসি কান্না মানুষের জীবনে চক্রনেমিক্রমে নিরন্তর আবর্তিত হচ্ছে। এই আবর্তনের ফলে মানবমনে আলো ছায়ার সৃষ্টি করে গভীর আবেগের সঞ্চার করছে। সেই আবেগ জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে প্রতিহত হয়ে সমুদ্রের তরঙ্গের মত উদ্বেলিত হয়ে মুক্তোর মত ঝরে পড়ছে। ব্যক্তিগত জীবনের এই আবেগ মথিত হৃদয়ের ভাব যখন কাব্য অথবা নাটকে রসঘন হয়ে ফুলের সুরভির মত বিশ্বমনকে সরস করে তোলে তখনই তা হয় অপূর্ব, অনবদ্য এবং তখনই সার্থক হয় রসসৃষ্টি। এই রসসৃষ্টি হয় ভাবের অবলম্বনে। ভাব হল মানসিক উপাদান। মানসিক উপাদানের জন্ম হয় বাস্তব জগতে। কিন্তু নাট্য অথবা কাব্যের মাধ্যমে এই ভাব পরিণতি লাভ করে রসের সৃষ্টিতে। এ. কে. কুমারস্বামী রস সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন—"শব্দ, ভঙ্গী ও উপস্থাপনার দ্বারা নাটকের গূঢ় অর্থ প্রকাশিত হয়।" যার দ্বারা অর্থ প্রকাশিত হয় তাই ভাব। ভাব হচ্ছে 'কারণ'। ভাবের পরিণাম হচ্ছে 'রস'। মানুষের মনে বহুপ্রকার ভাবের সমাবেশ হয়ে থাকে। এই সকল ভাবই কাব্যে, শিল্পে ও নাট্যে রসনিষ্পত্তির কারণ হয়। এই রসনিষ্পত্তি যখন হয়, তখন কারোর ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ থাকে না; তা সকলের ভেতর সঞ্চারিত হয়ে সর্বজনীনতা লাভ করে। আস্বাদ্যমান রস যখনই রসিকমনে চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করে, তখনই তা সার্থকতা লাভের যোগ্য হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা, ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা।" সাহিত্যের, কাব্যের অথবা আর্টের সামগ্রী হচ্ছে 'রস'। মন প্রাকৃতিক সামগ্রীকে মানসিক করে নিয়ে তাই অন্যের মনে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করে এবং তাই রস। রস যখন পরিণতি লাভ করে তখনই রসনিষ্পত্তি ঘটে।

আলঙ্কারিকরা নানাভাবে রসের ব্যাখ্যা করেছেন। রসের সঙ্গে কয়েকটি শব্দ নিত্য ব্যবহার্য; যথা রসবস্তু, রসিক ও রসাস্বাদন। রসের বিষয় আলোচনা করতে হলেই এই শব্দগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় থাকা আবশ্যক। যিনি রসে পূর্ণ তিনি রসবস্তু, (নাট্যকার, কবি, প্রভৃতি রসের স্রষ্টা), রসিক (যিনি

রস উপভোগ করেন), এবং রসের গ্রহণ বা অনুভূতিকে রসাস্বাদন বলা হয়। রসাস্বাদন ব্যাপার নৃত্যেও প্রযোজ্য। আলঙ্কারিকরা বলেছেন যে, সকলে রসের আস্বাদন করতে পারে না। কেবলমাত্র সহৃদয় সংবাদী মনই (অন্তের হৃদয়ের সংবাদ সম অনুভূতি দিয়ে গ্রহণ কবতে পারে যে মন) রসের আস্বাদন করতে পারে। এইরকম মন যখনই রসাস্বাদন করে পরিতৃপ্তি লাভ করে, তখনই রসসৃষ্টি সার্থক হয়।

স্থায়ীভাব থেকে রসের সৃষ্টি হয়। যে ভাবটি মনের ভেতর অবিচল অবস্থায় থাকে তাই 'স্থায়ী' ভাব। বিরুদ্ধ অথবা অবিরুদ্ধ কোন রকম সঞ্চারী ভাবই স্থায়ীভাবের তিরোধান ঘটাতে পারে না। আট রকম স্থায়ীভাবের উল্লেখ আছে, যথা—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুসা ও বিস্ময়।

স্থায়ীভাব, বিভাব ও অনুভাবের সাহায্যে রসসৃষ্টি হয়।

"রত্যাদ্যুদ্বোধকা লোকে
বিভাবাঃ কাব্যনাট্যয়োঃ ঃ।"

লৌকিক জগতে যা রতিভাবাদির উদ্বোধক, কারণ বা হেতু, কাব্য ও নাট্য জগতে তাই বিভাব। শকুন্তলার রূপ, গুণ প্রভৃতির দ্বারা রাজা দুষ্মন্তের মনে রতিভাবের উদয় হ'ল। এই সকল কারণগুলি কাব্য ও নাট্যে বিভাব। এই বিভাব আবার দুটি ভাগে বিভক্ত,—'আলম্বন' ও 'উদ্দীপন'। যাকে অবলম্বন করে রতিভাবের উদয় হয় তাকে আলম্বন বিভাব বলে, যথা শকুন্তলা, দুষ্মন্ত ইত্যাদি। যা রসকে উদ্দীপ্ত করে তাই উদ্দীপন বিভাব; যেমন বেশভূষা, রূপ, দেশ, কাল, ভ্রমর, ঝঙ্কার, মলয় পবন ইত্যাদি।

আলম্বন, উদ্দীপন প্রভৃতি কারণসমূহের দ্বারা উদ্দীপ্ত রতিভাবের বহিঃ-প্রকাশরূপ কাজকে অনুভাব বলে, যথা সলজ্জ হাসি, ভ্রূকুটী, কটাক্ষ, ইত্যাদি। এক কথায় বলা যেতে পারে বিভাব কারণ, অনুভাব কার্য। পণ্ডিতরা তিন রকম অনুভাবের কথা বলেছেন—অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর, বাচিক। সাধাণতঃ উদ্ভাস্বর ও বাচিক নৃত্যে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু নৃত্যে অলঙ্কারের প্রয়োগ হয়ে থাকে। রমণীদের সত্ত্বগুণজনিত অলঙ্কার কুড়ি রকম। উজ্জ্বল নীলমণিতে অলঙ্কার সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে "নায়িকাদের যৌবন অবস্থায় কান্তের প্রতি সর্বপ্রকারে অভিনিবেশের জন্তে যে সকল সত্ত্বগুণজনিত অলঙ্কার উদিত হয়, তাদের সংখ্যা বিংশতি।" তার ভেতর ভাব, হাব, হেলা—এই তিনটি অঙ্গজ।

শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য ও ধৈর্য এই সাতটি 'অযত্নজ'। অর্থাৎ এগুলি স্বতঃপ্রকাশ পায়। লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত এবং বিকৃত এই দশটি স্বভাবজ অর্থাৎ নায়িকাদের স্বভাবতই ঘটে থাকে।

ভাব—শৃঙ্গার রসে নির্বিকার চিত্তে রতি নামক স্থায়িভাবের প্রাদুর্ভাব হ'লে যে প্রথম বিক্রিয়া হয় তাকেই 'ভাব' বলে। নৃত্যে ভাবের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

হাব—যা গ্রীবার তির্যগ্‌ভাবযুক্ত ভ্রূনেত্রাদির বিকাশকারী এবং ভাব থেকে কিঞ্চিৎ প্রকাশক তাকে 'হাব' বলে।

হেলা—ঐ ভাব যদি অধিকতর পরিপুষ্ট ও শৃঙ্গারসূচক হয় তা হ'লে তাকে 'হেলা' বলে।

শোভা—রূপ ও ভোগাদি দ্বারা অঙ্গের বিভূষণকে 'শোভা' বলে।

কান্তি—রতিভাবের দ্বারাই এই শোভা উজ্জ্বলতর হলে তাকে 'কান্তি' বলে।

দীপ্তি—বয়স, ভোগ, দেশ, কাল ও গুণ প্রভৃতির দ্বারা যে কান্তি বিশেষভাবে বিস্তৃতি লাভ করে, তাকে 'দীপ্তি' বলে।

মাধুর্য—সব রকম আচরণের মধ্যে দিয়ে সামগ্রিকভাবে যে চারিত্রিক সুষমা ব্যক্ত হয় তাকে 'মাধুর্য' বলে।

প্রগল্‌ভতা—সম্ভোগ বিষয়ে নিঃশঙ্কভাবকে 'প্রগল্‌ভতা' বলা হয়।

ঔদার্য—সকল অবস্থাতেই বিনয় প্রদর্শন করাকে 'ঔদার্য' বলে।

ধৈর্য—উন্নত অবস্থায় চিত্তের যে স্থিরতা তাকে 'ধৈর্য' বলে।

লীলা—রমনীয় বেশ ও ক্রিয়ার দ্বারা প্রিয় ব্যক্তির যে অনুকরণ তাকে 'লীলা' বলে।

বিলাস—প্রিয় মিলনের জন্যে স্থান, আসন, মুখ ও নেত্রাদিতে কর্মের যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, তাকে 'বিলাস' বলে।

বিচ্ছিত্তি—যে বেশ রচনা অল্প হয়েও দেহকান্তির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে থাকে, তাকে 'বিচ্ছিত্তি' বলে।

বিভ্রম—প্রিয়ের কাছে অভিসারকালীন প্রেমের আবেগবশতঃ হার, মালা ইত্যাদি ভূষণ ও অলঙ্কারের যে স্থান বিপর্যয় তার নাম 'বিভ্রম'।

কিলকিঞ্চিত—হর্ষ হেতু গর্ব, অভিলাষ, হাসি, কান্না, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ, এই সাতটির একসঙ্গে প্রকাশের নাম 'কিলকিঞ্চিত।'

মোট্টায়িত—কান্তের স্মরণে ও তার বার্তা শ্রবণে স্থায়ীভাবের জন্যে হৃদয়ের মধ্যে যে অভিলাষের উদয় হয় তাকে 'মোট্টায়িত' বলে।

কুট্টমিত—কামবশতঃ হৃদয়ে প্রীতির উৎপত্তি হলেও প্রকাশ্যে ব্যথিতের মত কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশকে 'কুট্টমিত' বলে।

বিব্বোক—গর্ব ও মানের জন্যে ইষ্টবস্তু বা প্রিয়ের প্রতি যে অনাদর তাকে 'বিব্বোক' বলে।

ললিত—অঙ্গসমূহের বিন্যাসভঙ্গী যদি ভ্রূবিলাসে মনোহর ও সুকুমার হয়, তবে তাকে 'ললিত' বলে।

বিকৃত—লজ্জা, মান ও ঈর্ষ্যা প্রভৃতির দ্বারা যদি বক্তব্য বিষয় প্রকাশিত না হয়, তবে তা 'বিকৃত' আখ্যা লাভ করে।

অনেকে এই কুড়ি রকম অলঙ্কার ছাড়া আরও অনেক রকম অলঙ্কারের কথা বলেছেন। কিন্তু ভরত মুনির তা অভিপ্রেত নয়। তবে 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থে এ ছাড়া আরও দুটি অলঙ্কারের কথা বলা হয়েছে, যথা 'মৌগ্ধ' ও 'চকিত'।

মৌগ্ধ—প্রিয়তমের কাছে জ্ঞাত বস্তুর প্রতি অজ্ঞের মত যে জিজ্ঞাসা তাকে 'মৌগ্ধ' বলে।

চকিত—প্রিয়তমের সামনে ভয়ের অযোগ্য স্থানে যে গুরুতর ভয়, তার নাম 'চকিত'।

সাত্ত্বিকভাব—সাত্ত্বিকভাব অনুভাবেরই অন্তর্গত। মন সমাহিত হলেই সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। সমাহিত মন বস্তু জগতের প্রতি বিমুখ হয়ে ওঠে এবং একটি গভীর অনুভূতির মধ্যে ডুবে যায়। এই অনুভূতি গাঢ় হলে বাহ্যজ্ঞান লোপ করে দেয়। সাত্ত্বিকভাব অনুভাবের অন্তর্গত হ'লেও একে অনুভাব বলা যায় না। সাত্ত্বিকভাব আট রকমের—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ, অশ্রু ও প্রলয় (মূর্ছা)।

স্থায়ী ব্যতীত আরও অনেক রকম ভাব আমাদের মধ্যে উদিত হয় এবং রসসৃষ্টিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এদের 'ব্যভিচারী' অথবা 'সঞ্চারী' ভাব নাম দেওয়া হয়েছে। সঞ্চারী ভাবের নিজস্ব রসমূর্তি নেই। এরা

স্থায়ীভাবের পরিণতি আটটি রসকে পরিপুষ্ট করে। সঞ্চারীভাব তেত্রিশ রকম —নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্ত, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মার, ব্যাধি, মোহ, স্মৃতি, আলস্য, জড়তা, ব্রীড়া, অবহিত্থা, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঔগ্র, অমর্ষ, অসূয়া, চাপলা, নিদ্রা, সুপ্তি, বোধ ও মরণ।

এদের পরিচয়—

নির্বেদ—খেদ, মহার্তিজাত ঈর্ষ্যাহেতু স্বঅবমাননায় এর উৎপত্তি।

বিষাদ—ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তিজনিত দুঃখ

দৈন্য—অদর্শনের জন্যে দুঃখ হেতু দীনভাব।

গ্লানি—দুই রকম, শ্রমের থেকে ও মনের পীড়া হেতু। অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীরে গ্লানি হয়। বিরহজনিত দুঃখে মনে গ্লানি আসে। (উজ্জ্বল নীলমণি)

শ্রম—পরিশ্রম হেতু শ্রম, পদভ্রমণজনিত শ্রম, নৃত্যহেতু শ্রম।

মদ—মধুপানজ মত্ততা (ভক্তিরসামৃত)

গর্ব—অহংকার; সৌভাগ্য থেকে এর জন্ম।

শঙ্কা—চৌর্যহেতু অথবা অপরাধ হেতু (আশঙ্কা)।

ত্রাস—বিদ্যুৎচমক, উগ্র শব্দ শ্রবণ, বা ভয়ানক জন্তু দর্শনাদির জন্যে ভয়।

আবেগ—প্রিয়দর্শনহেতু এর উৎপত্তি (ললিত মাধব)

উন্মাদ—মহানন্দ অথবা বিরহাদির জন্যে চিত্তবিকার।

অপস্মার—গভীর বিরহের জন্যে চিত্তবিকার।

ব্যাধি—জ্বরাদির প্রতিরূপ বিকার, বিয়োগজনিত ব্যাধি।

মোহ—হর্ষ বা বিষাদের জন্যে অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভাব।

মরণ—এখানে মরণের উদ্যমমাত্র বর্ণনা করা হয়; সাক্ষাৎ মৃত্যু কাম্য নয়।

আলস্য—সামর্থ সত্ত্বেও কর্তব্য বস্তু না করার ইচ্ছে।

জড়তা—ইষ্ট অথবা অনিষ্ট শুনে জড়ভাব।

ব্রীড়া—নব প্রেম, অন্যায় আচরণ অথবা স্তব হেতু লজ্জা।

অবহিত্থা—লজ্জা বা কপটতা হেতু ভাব গোপন।

স্মৃতি—তুল্য বস্তু দর্শনজনিত অনুভূত অর্থের স্ফূর্তি।

বিতর্ক—সংশয় হেতু কোন বস্তু সম্বন্ধে স্বরূপ নির্ণয়ে সন্দিগ্ধ মনোভাব।

চিন্তা—ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি অথবা অনিষ্টবস্তুর প্রাপ্তি হেতু ভাবনা।
মতি—বিচারপূর্বক কর্তব্য নির্ধারণ।
ধৃতি—মনের স্থৈর্য সম্পাদন।
হর্ষ—অভীষ্ট দর্শনহেতু আনন্দ।
ঔৎসুক্য—ইষ্ট দর্শনের স্পৃহা।
ঔগ্র্য—অপরাধ ও কটু বাক্যাদি থেকে জাত উগ্রভাব।
অমর্ষ—পরিহাস বাক্য প্রভৃতি শ্রবণে অপমানহেতু অসহিষ্ণুতা।
অসূয়া—পর সৌভাগ্যে বিদ্বেষ।
চাপল্য—চিত্তের লঘুতাহেতু গাম্ভীর্যের অভাব।
নিদ্রা—ক্লম প্রভৃতির জন্যে চিত্তের নিমীলন।
সুপ্তি—স্বপ্ন।
বোধ—জাগৃতি

বৈষ্ণব শাস্ত্র 'উজ্জ্বল নীলমণি'তে আলস্য ও উগ্রতাকে ব্যভিচারী ভাবের ভেতর ধরা হয় নি। তবে আরও তিনটি ভাবের কথা বলা হয়েছে, যথা সন্ধি, শাবল্য ও শান্তি।
সন্ধি—দুই ভাবের একত্রীকরণ।
শাবল্য—চপলতা, শঙ্কা, ঔৎসুক্য ও অমর্ষ ইত্যাদি ভাবের উত্তরোত্তর সংঘাত।

পূর্বে রসাস্বাদনের কথা বলা হয়েছে। ব্যভিচারী, বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক প্রভৃতি ভাবগুলির দ্বারা কাব্য, নাটক যখন রসিকজনের দ্বারা আস্বাদ্য হয়, তখনই রসসৃষ্টি সার্থক হয়, এই রসাস্বাদন সহৃদয়সংবাদী মনকে লোকোত্তর জগতের সংবাদ দেয়। শ্রুতি বলেছেন 'রসো বৈ সঃ'। তাত্ত্বিকবিচারে ব্রহ্মরসের মতনই কাব্যরস বা নাট্যরস মনকে লোকোত্তর জগতের আনন্দ দেয়। রস বিভক্ত হলেও এক এবং অখণ্ড। আমরা ব্রহ্মরস তখনই উপলব্ধি করতে পারি, যখন আমাদের মন বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে অন্তর্মুখী হয়। সুতরাং রসাস্বাদন যখন ঘটে, আমাদের মনও তখন এক অনির্বচনীয় আনন্দে নিমগ্ন হয়ে যায়। রসোৎপত্তি সম্বন্ধে শারদাতনয় 'ভাবপ্রকাশনে' একটি সুন্দর আলেখ্য দিয়েছেন। ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করে অতীতের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি মনশ্চক্ষে শিবের কার্যাবলী দেখতে লাগলেন; এবং সেই অতীত ইতিহাস নিয়ে 'ত্রিপুরদহ' নাটক রচনা করলেন।

ভরত মুনি যখন 'ত্রিপুরদহ' নাটক মঞ্চস্থ করছিলেন তখন ব্রহ্মার চতুর্মুখ থেকে চারটি রসের উৎপত্তি হয় এবং চারটি রস থেকে বৃত্তির উৎপত্তি হয়। এই চারটি রস হচ্ছে শৃঙ্গার, বীর, রুদ্র ও বীভৎস। রসের মধ্যে এরাই প্রধান। এ ছাড়া হাস্য, করুণ, ভয়ানক ও অদ্ভুত নামে আরও চারটি রসের উল্লেখ আছে। মুনি ভরতের পরবর্তীকালে শান্ত রসকে যোগ করে নয়টি রসের উল্লেখ করা হয়েছে। ভরতমুনি শান্ত রসের উল্লেখ কোথাও করেন নি। তবে এক জায়গায় তিনি তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। চক্ষুতারকার ৯টি ক্রিয়ার আলোচনায় ৮টি রসের উল্লেখ করে অবশেষে "প্রাকৃতং শেষ ভাবেষু" এই উক্তির দ্বারা পরোক্ষভাবে অন্যান্য ভাবের স্বীকৃতি দিয়েছেন। নাট্যশাস্ত্রের (বরোদা ২য় সংস্করণ) ভূমিকাতে বলা হয়েছে যে, যদিও আচার্য ভরত শান্তরসের উল্লেখ করেন নি তথাপি তিনি ঐ জাতীয় একটি রসের ইঙ্গিত করেছেন। যেখানে তিনি শম, বীতরাগ, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মোক্ষ প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন, সেখানেই শান্তরসের স্পর্শ এসে পড়ে। ভরত বলেছেন—

"ধর্মকামোঽর্থকামশ্চ মোক্ষকামস্তথৈবচ।"

শান্তরসের বিভাব ও অনুভাবকে অবলম্বন করে নাট্য রচিত হয়। আচার্য ভরত শান্তরসের স্থায়ীভাব 'শমের' পরোক্ষভাবে আংশিক উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাই বলে তিনি 'শান্ত'কে স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন নি। মুনি ভরত বলেছেন নাটক হবে—

"কচিদ্ধর্ম কচিৎ ক্রীড়া কচিদর্থঃ কচিচ্ছমঃ"

"দুঃখার্তানাং শ্রমার্তানাং শোকার্তানাং তপস্বিনাম্।
বিশ্রান্তিজননং কালে নাট্যমেতদ্ ভবিষ্যতি।"

সুতরাং সব রকমের দর্শকদের জন্যে বিভিন্ন রস সমন্বিত নাটক হওয়া উচিত। নাট্য হবে বিনোদজন। কিন্তু যে নাট্যে 'শম' ভাব প্রধান তা হয় তো অনেক সময় বিনোদজন নাও হতে পারে। কারণ 'শম' মানে জাগতিক সকল অনুভূতি থেকে মুক্ত। তার অর্থ বৈরাগ্য। এইরকম অবস্থা নাট্যে প্রতিফলিত করা যায় না। এইরকম অনেক রসই মঞ্চে দেখানো হয় না, যথা শৃঙ্গার রসের 'সমপ্রয়োগ' অথবা হত্যার দৃশ্য ইত্যাদি। মনে হয়, নাট্যে এই রসের অবতারণা সম্ভব নয় বলেই আচার্য ভরত এই বিষয় মৌন ছিলেন। তা না হ'লে, শান্ত রসের বিষয় তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতেন।

নাট্যশাস্ত্রের প্রথম টীকাকার উদ্ভট তাঁর "কাব্যালঙ্কার সার সংগ্রহে" প্রথম শান্তরসের উল্লেখ করেন। তাঁর এই মতকে সমর্থন করেন আনন্দবর্ধন এবং অভিনব গুপ্ত। কেউ কেউ এই মতের বিরোধিতাও করেছেন। এঁদের মধ্যে ধনঞ্জয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সপ্তম শতাব্দীতে বৈদিক ও অবৈদিক মতবাদের বিরোধের সময় শান্তরস সাধারণ্যে স্বীকৃতি লাভ করে। অনেকে মনে করেন, মুনি ভরতের শান্তরসের অধ্যায়টি সংযোজিত। এই সংযোজিত অংশে শান্তরসের স্থায়ী ভাবকে বলা হয়েছে 'শম'। আনন্দ বলেছেন, মুনি ভরতের শান্তরসের অধ্যায়টি সংযোজিত নয়। আনন্দবর্ধনের মতে শান্তরসের স্থায়ীভাব হচ্ছে—"তৃষ্ণা-ক্ষয়-সুখ।।'

শারদাতনয়ের মতে নাট্যশাস্ত্রকার বাসুকী প্রথম শান্ত রসের উল্লেখ করেন। লোল্লটও শান্তরসের কথা বলেছেন। অভিনব গুপ্ত বলেন শান্তরস অপ্রধান, অর্থাৎ সঞ্চারী অথবা অঙ্গীরস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

যাই হোক, পূর্বোক্ত চারটি প্রধান রস থেকে আরও চারটি অঙ্গী অথবা সঞ্চারী রসের উদ্ভব হয়েছে, যথা শৃঙ্গার থেকে হাস্য, রৌদ্র থেকে করুণ, বীর থেকে অদ্ভুত ও বীভৎস্য থেকে ভয়ানক। রস অনুসারে ভরত লয়েরও নির্দেশ দিয়েছেন। হাস্য ও শৃঙ্গার রসে মধ্যলয়, করুণ রসে বিলম্বিত এবং বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত, বীভৎস ও ভয়ানক রসে দ্রুত লয় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আটটি রসের অবলম্বন আটটি ভাব। রতি থেকে শৃঙ্গার, হাস থেকে হাস্য, শোক থেকে করুণ, ক্রোধ থেকে রৌদ্র, উৎসাহ থেকে বীর, ভয় থেকে ভয়ানক, জুগুপ্সা থেকে বীভৎস এবং বিস্ময় থেকে অদ্ভুত রসের উদ্ভব হয়েছে। অনেকে এক্ষেত্রেও আবার শান্ত রসের উল্লেখ করেন। তাঁদের মতে শান্তরসের অবলম্বন 'শম' ভাব।

এই নয়টি রস ছাড়া বাৎসল্য ও ভক্তিকেও দশম ও একাদশ রসের অন্তর্গত করা হয়। বাৎসল্য বলতে পরস্পরের প্রতি কামহীন আকর্ষণ। সন্তানের প্রতি পিতামাতার এই ধরণের আকর্ষণ জন্মায়। কেউ কেউ করুণা অথবা কারুণ্যকে এর স্থায়ীভাব বলেন। কবি কর্ণপুর গোস্বামী যশোদা ও কৃষ্ণের আকর্ষণকে বাৎসল্যরস বলেছেন এবং স্থায়ীভাব হচ্ছে 'মমকার'। ভক্তিকেও রসের ভেতর গণ্য করা হয়েছে। পিতা-মাতা, গুরুজন অথবা ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাকে বলা হয়েছে 'ভক্তি'। ভক্তির স্থায়ী ভাব হচ্ছে 'প্রীতি'। এর উল্লেখ করেছেন রুদ্রভট,

দণ্ডী এবং আরও অনেকে। পরবর্তী কালে বৈষ্ণব সাহিত্যে এর বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং তাতে সখ্যসমেত বারোটি রসের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

শৃঙ্গাররস—শৃঙ্গারের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আলোচনা করলে দেখা যায় যে, শৃঙ্গ শব্দটি নানার্থবোধক। আলোচ্যস্থলে এটি হিংসার্থে প্রযুক্ত হয়েছে। যা চরম দশায় উপনীত করে কামুকদের ধ্বংস করে, তাই 'শৃঙ্গ' (শৃ-হিংসায়াম) বলে কথিত হয়। শৃঙ্গ শব্দের নামান্তর মন্মথোদ্ভব অর্থাৎ কামের উদ্ভব। এই কাম-ভাব বা রতিভাবই হেতু যার তাই শৃঙ্গার। অথবা স্বীয় উৎপত্তির কারণ রূপে যা (রস) শৃঙ্গকে অর্থাৎ রতিভাবকে প্রাপ্ত হয় তাই শৃঙ্গার। "ইয়র্তি শৃঙ্গং যস্মাৎ স শৃঙ্গারঃ।" ভাবের মধ্যে এই রস শ্রেষ্ঠ বলে 'শৃঙ্গার'। শৃঙ্গার রস সম্বন্ধে ভরতমুনি বলেছেন যে এটি 'উজ্জ্বলবেশাত্মক'। স্থায়ীভাব রতি থেকে এর জন্ম। স্ত্রী ও পুরুষ এর হেতু এবং এটি উত্তম যুবপ্রকৃতি। শৃঙ্গাররসকে বিশ্বসৃষ্টির কারণ বলা হয়। শৃঙ্গার তাণ্ডবে ভগবান আত্মহারা হয়ে সৃষ্টি করেছিলেন বলে এতে প্রসন্নতা ও কোমলতা বিরাজমান। সংস্কৃত নাটকে অথবা নাট্যশাস্ত্রে শৃঙ্গার রসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অশ্লীলতা অথবা লঘুতা এতে বর্জনীয়। 'বিদগ্ধমাধব' নাটকে শ্রীরূপ গোস্বামী বলেছেন—"সকল রসের সারভূত আদ্য-রস বা শৃঙ্গার রসই রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" বিবেকানন্দ একে উচ্চতম ও প্রবলতম বলেছেন। তাঁর ভাষায় "দিব্যপ্রেমের মধুরভাবে ভগবান আমাদের পতি।" বৈষ্ণবশাস্ত্রে একেই 'উজ্জ্বল' রস বা 'মধুর রস বলা হয়েছে। শৃঙ্গার রস প্রেম-প্রধান।

শৃঙ্গার রস দু'রকম—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ।

বাৎসায়ন প্রভৃতি কলাশাস্ত্রের রীতি অনুসারে দর্শন ও আলিঙ্গন প্রভৃতি আচরণ দ্বারা নায়ক নায়িকার পারস্পরিক সুখোদয় চিত্তে যে অত্যধিক উল্লসিত ভাব জন্মায়, তার নাম 'সম্ভোগ' বলেছেন।

বিপ্রলম্ভ—'উজ্জ্বলনীলমণিতে' আছে যে, নায়ক-নায়িকার সংযুক্ত বা বিযুক্ত অবস্থায় পরস্পরের অভীষ্ট-আলিঙ্গন প্রভৃতির অপ্রাপ্তিতে যে ভাব বিশেষভাবে প্রকটিত হয়, তাকে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার বলে। সম্ভোগশৃঙ্গার চার রকম—সংক্ষিপ্ত শৃঙ্গার, সংকীর্ণ শৃঙ্গার, সম্পন্নসম্ভোগ শৃঙ্গার ও সমৃদ্ধিমানসম্ভোগ শৃঙ্গার। বিপ্রলম্ভ চার রকম—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, ও প্রবাস।

বীররস—শক্তি, দয়া, শৌর্য, উদারতা, প্রভৃতি কাজে বীররসের অভিব্যক্তি হয়ে.

থাকে। এতে নায়ক উদ্ধত, অশান্ত ও উচ্ছৃঙ্খল হতে পারে না। নায়ককে শান্ত, অবিচল ও গম্ভীর থাকতে হয়। ব্যভিচারী ভাব হচ্ছে মদ, স্মৃতি, ধৃতি, হর্ষ, গর্ব, আবেগ, অমর্ষ, উগ্রতা, মতি, বিরোধ ও বিতর্ক। অনুভাব হচ্ছে স্বেদ, রোমাঞ্চ, বিবর্ণ, অশ্রু ও মোহ।

বীভৎস রস—দুর্গন্ধ, কুবচন, বিশ্রী অথবা অশ্লীল কাজ থেকে বীভৎস রসের সঞ্চার হয়। ব্যভিচারী হচ্ছে মদ, গর্ব, আবেগ, অমর্ষ, উগ্রতা ও ব্যাধি। অনুভাব হচ্ছে রোমাঞ্চ ও প্রলাপ।

রৌদ্ররস—ক্রোধ, উন্মত্ততা, ভীতি প্রদর্শন, আক্রমণাত্মক অঙ্গ বিক্ষেপ অথবা হিংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে রৌদ্র রসের উৎপত্তি। ব্যভিচারী হচ্ছে অসূয়া, মদ, স্মৃতি, অমর্ষ, উগ্রতা ও উন্মাদ। অনুভাব হচ্ছে স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বিবর্ণ, প্রলাপ ইত্যাদি।

হাস্যরস—হাস্যরসের উদ্ভব হয় বিনোদপূর্ণ কাজ, বিচিত্র বেশভূষা, হাস্য করা অথবা অপরকে হাসান থেকে। অনেক রকম হাসির উল্লেখ আছে—স্মিত, হসিত, বিহসিত, উপহসিত, অপহসিত এবং অতিহসিত।

ভয়ানক রস—ভয়ানক দৃশ্যের দর্শনে ভীত অথবা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে স্বেদ, কম্পন প্রভৃতি হয়। মুখমণ্ডল শুকিয়ে যায়। এই ভাব থেকে ভয়ানক রসের উৎপন্ন হয়েছে। অনুভাব হচ্ছে স্বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বিবর্ণ, অশ্রু ও প্রলাপ।

অদ্ভুতরস—বিস্ময় অথবা আশ্চর্যের অভিব্যক্তি হচ্ছে 'অদ্ভুত' রস। বিচিত্রবস্তুর দর্শনে ও বিচিত্রধ্বনির শ্রবণে কম্পন, স্বেদ প্রভৃতির দ্বারা এই রসের অভিব্যক্তি বোঝায়। ব্যভিচারী ভাব হচ্ছে স্বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ ; স্বরভঙ্গ, কম্প ও বিবর্ণ।

করুণ রস—বিপত্তি, দুর্ঘটনা প্রভৃতির দ্বারা অশ্রু, দীর্ঘনিশ্বাস প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ব্যভিচারী ভাব হচ্ছে শঙ্কা, আলস্য, অসূয়া, শ্রম, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, ক্রীড়া, বিষাদ, উৎকণ্ঠা, স্বপ্ন, অবহিত্থ, ব্যাধি, মরণ ও ত্রাস। নৃত্যে নবরস দেখানোর সময় অথবা কোন একটি বিশেষ রসকে প্রস্ফুটিত করবার সময় এই সব অভিব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজন হয়। নাট্যশাস্ত্রকার এমন গভীর ভাবে ও সূক্ষ্মভাবে এর আলোচনা করে গিয়েছেন যে বাস্তব ক্ষেত্রে এর সম্যক জ্ঞান না থাকলে প্রয়োগ সাফল্যমণ্ডিত হয় না।

প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রে প্রত্যেক রসের বর্ণ ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম দেওয়া হয়েছে।

রস	বর্ণ	অধিদেবতা
শৃঙ্গার	শ্যাম	বিষ্ণু
হাস্য	সিত (সাদা)	প্রমথ
করুণ	কপোত	যম
বীর	হেম	মহেন্দ্র
ভয়ানক	কৃষ্ণ	কাল
রৌদ্র	রক্ত	যম
বীভৎস	নীল	মহাকাল
অদ্ভুত	পীত	ব্রহ্মা

এই প্রসঙ্গে নায়ক-নায়িকা ভেদের উল্লেখ করা হচ্ছে। নৃত্যের আলোচনায় এই বিষয়টি বিশেষ প্রয়োজনীয়। নায়িকা আট রকম—অভিসারিকা, বাসক-সজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকা। নায়িকার এই সকল অবস্থার বিশ্লেষণে উজ্জ্বলনীলমণিতে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

অভিসারিকা—

যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং ব্যভিসরত্যপি
সা জ্যোৎস্নীতামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিকা।
লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিলমণ্ডনা
কৃতাবগুণ্ঠিতা স্নিগ্ধৈকসখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ।"

যে নায়িকা কান্তকে অভিসার করায় অথবা স্বয়ং অভিসার করে, তাকে 'অভিসারিকা' বলা হয়। জ্যোৎস্না ও তামসীভেদে অভিসারিকা দুই রকম হয়। অভিসারিকা লজ্জাবশতঃ স্বীয় অঙ্গ সঙ্গোপন করে, সব ভূষণ নিঃশব্দ করে এবং অবগুণ্ঠিত হয়ে একটি মাত্র সখীর সঙ্গে অভিসার করে। জ্যোৎস্না রাত্রে অথবা অন্ধকার রাত্রে সেইরকম অভিসারের যোগ্যবেশ ধারণ করতে হয়।

বাসকসজ্জা—

'স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা।'

নায়কের আগমণের আশায় দেহ ও গেহ সজ্জিত করে নায়িকা যদি অপেক্ষা করে, তাহলে তাকে 'বাসকসজ্জা' বলে।

উৎকণ্ঠিতা—

অনাগসি প্রিয়তমে চিরয়ত্যুৎসুকা তু যা
বিরহোৎকণ্ঠিতা ভাববেদিভিঃ সা সমীরিতা।"

নিরপরাধ প্রিয়ের আগমনের বিলম্বহেতু নায়িকা যদি উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অবস্থান করে, তাকে 'উৎকণ্ঠিতা' বলা হয়।

খণ্ডিতা—

"উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্।
ভোগলক্ষাঙ্কিতঃ প্রাতরাগগচ্ছেৎ সা হি খণ্ডিতা।"

পূর্ব সঙ্কেতিত কাল অন্তে যদি প্রিয়তম অন্য নায়িকার ভোগচিহ্ন অঙ্গে ধারণ করে প্রাতঃ কালে সমাগত হয়, তা দর্শন করে পূর্ব নায়িকা 'খণ্ডিতা' অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

বিপ্রলব্ধা—

"কৃত্বা সঙ্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে।
ব্যথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ॥

সঙ্কেত করে প্রিয়তম যদি না আসে, তাহ'লে, যে নায়িকার অন্তর ব্যথিত হয় তাকে 'বিপ্রলব্ধা' বলে।

কলহান্তরিতা—

"যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা।
নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা।

যে নায়িকা ক্রোধভরে সখীজনের সম্মুখে পদানত বল্লভকে পরিত্যাগ করে পরে অতিশয় অনুতপ্ত হয়, তাকে 'কলহান্তরিতা' বলা হয়।

প্রোষিতভর্তৃকা—

"দূরদেশং গতে কান্তে ভবেৎ প্রোষিতভর্তৃকা।"

নায়ক দূরদেশে গমন করলে সেই নায়িকাকে প্রোষিতভর্তৃকা বলা হয়।

স্বাধীনভর্তৃকা—

"খায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্তৃকা।"

কান্ত যে নায়িকার অধীন হয়ে সকল সময় কাছেই অবস্থান করে সেই

নায়িকাকে 'স্বাধীনভর্তৃকা' বলা হয়। এ ছাড়া চার রকমের নায়কের উল্লেখ ও আছে, যথা—ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরশান্ত, ধীরোদ্ধত।

ধীরোদাত্ত—যে নায়ক সুদৃঢ়, গাম্ভীর্যগুণসম্পন্ন, বিনয়ী ও করুণ তাকে 'ধীরোদাত্ত' বলে।

ধীরললিত—যে নায়ক কিশোর, পরিহাসবিশারদ, প্রেয়সীবশ এবং সংসার দায়িত্ব থেকে মুক্ত ; তাকে 'ধীরললিত' বলে।

ধীরশান্ত—যে নায়ক শমপ্রকৃতি, ক্লেশসহিষ্ণু, বিবেচক ও বিনয়প্রভৃতি গুণযুক্ত তাকে 'ধীরশান্ত' বলে।

ধীরোদ্ধত—যে নায়ক মাৎসর্যবান, অহংকারী, মায়াবী ও চঞ্চল তাকে 'ধীরোদ্ধত' বলে।

প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রকাররা এইভাবে নাটকের রসবিচার এবং নায়ক নায়িকা ভেদ প্রভৃতির বিচার করেছেন। ভারতীয় নৃত্যেও এই সকল নায়ক নায়িকা ভেদের প্রয়োগ হয়ে থাকে। এখন বিচার্য বিষয়, ভারতীয় নৃত্য কি ভাবে রসপুষ্ট হয়েছে এবং এতে নায়ক-নায়িকা ভেদের প্রয়োগই বা কিভাবে হয়।

ভারতের চারটি অঞ্চলের নৃত্যশৈলী নিয়ে আলোচনা করা যাক। পূর্বাঞ্চলের মণিপুরী 'রাস' নৃত্য প্রভৃতিতে দর্শক ও শিল্পীরা গোপীভাবে বিভাবিত হন এবং তাঁরা মনে করেন যে, ত্রিভঙ্গমুরারিই একমাত্র রসিক পুরুষ। গোপীভাবে বিভাবিত মণিপুরী দর্শকরা সেই রসিকপুরুষের রসাস্বাদন করেন। কিন্তু এই রসাস্বাদন একমাত্র সহৃদয়সংবাদী মনই করতে পারে। রতিভাব বিভাব, অনুভাব ও স্থায়ীভাবের সাহায্যে রসিকজনের রসাস্বাদনের ফলে শৃঙ্গার রসে পরিণত হয়। রাসনৃত্যের প্রবর্তক শ্রীশ্রীভাগ্যচন্দ্র মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের রাসনৃত্যের ভাবটি মণিপুরী রাসনৃত্যের অন্তর্গত' ভঙ্গী পারেঙ,' এর ২৩, ২৫ ও ২৭ পর্যায়ে প্রদর্শন করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত শ্লোকটি হচ্ছে—

> "পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈ
> র্ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ।
> স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররসনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো
> গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ॥"

পাদবিক্ষেপ, করসঞ্চালন, সুমধুর হাসির সঙ্গে ভ্রূবিলাস, স্বাভাবিক কৃশতাহেতু নৃত্যকালীন পরিবর্তন প্রভৃতির দ্বারা ঈষৎ ভুগ্নভাবাপন্ন কটির মৃদু

সঞ্চালন, ভ্রূভঙ্গীর সঙ্গে মুখে মৃদু হাসি, শ্লথবক্ষঃস্থলের দোদুল্যমান দুকূল ও গণ্ডে দোদুল্যমান কুণ্ডলের সঙ্গে স্বেদবিন্দুযুক্ত বদনমণ্ডলে শোভিত শ্রীকৃষ্ণের গুণগানে রত গোপীদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন মেঘের কোলে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এই শ্লোকের ভাবটিই উক্ত রাসনৃত্যে প্রতিফলিত হয়। এর রস হচ্ছে শৃঙ্গার এবং স্থায়ীভাব হচ্ছে রতি। এই রতিভাব গোপী ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়কেই অবলম্বন করেছে। গোপীদের অবলম্বন হলেন শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের অবলম্বন হলেন গোপীরা। পরস্পরের হাত সংবদ্ধ অবস্থায় নৃত্য হ'ল অনুভাব। মণিপুরী রাসনৃত্যের ভেতরও শৃঙ্গার রসই প্রধান। তবে মণিপুরী রাসনৃত্যে শৃঙ্গার রসের সঙ্গে ভক্তিরসেরও মিশ্রন থাকে; যদিও পূর্বোক্ত আটটি রসের মধ্যে ভক্তি রসের উল্লেখ নেই, তবুও বৈষ্ণবাচার্যরা ভক্তিরসকে স্বীকার করেছেন।

নায়ক ও নায়িকা প্রকরণের প্রায় সকল অবস্থাই মণিপুরী নৃত্যে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। তার কারণ, বাংলা দেশে প্রচলিত লীলা কীর্তনের সঙ্গে এই নৃত্য হয় বলে রাধাকৃষ্ণের সকল লীলাই এতে রূপায়িত হয়ে থাকে। সেইজন্যে নায়ক নায়িকার ভেদ এতে পরিবেশন করবার বিশেষ সুযোগ রয়েছে। নাট্যশাস্ত্রে মুনি ভরত বলেছেন, ভারতের পূর্বাঞ্চলে ভারতী ও আরভটী বৃত্তির প্রয়োগ ছিল। কিন্তু আচার্য ভরতের এই উক্তি মণিপুরী রাসনৃত্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। কারণ মণিপুরী রাস মধ্যযুগের পরবর্তীকালে সৃষ্টি হয়েছে। সেইজন্যে এতে মুনি ভরত কথিত পূর্বোক্ত ভারতী অথবা আরভটী বৃত্তির প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। তবে কৈশিকীবৃত্তির প্রয়োগ আছে। এতে মধুর রসের প্রাবল্য থাকলেও ভরতনাট্যম্ নৃত্যের মত সেরকম উচ্ছল ও অভিনয় প্রধান নয়। কারণ মণিপুরী নৃত্যে অভিনয়ের স্থান অতি অল্প। যদিও এক একটি লীলা নিয়ে এই নৃত্য হয়ে থাকে, তবুও মুখের অভিব্যক্তি নেই বললেই হয়।

দক্ষিণ-ভারতের মাদ্রাজ অঞ্চলের ভরতনাট্যম্ নৃত্য শৃঙ্গাররসপ্রধান। মুনি ভরত দেশে দেশে বৃত্তির প্রয়োগ সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে, দাক্ষিণাত্যে শৃঙ্গাররসের আধিক্য—"তত্র দাক্ষিণাত্যাস্তাবদ্বহুনৃত্যগীতবাদ্যাঃ কৈশিকীপ্রায়াঃ চতুর-মধুরললিতাঙ্গাভিনয়াশ্চ।" দাক্ষিণাত্য বলতে দক্ষিণ সমুদ্র থেকে বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যবর্তী দেশগুলি। এই নৃত্যে, নৃত্য ও অভিনয় এই দুটি অংশেই শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য দেওয়া হয়। নৃত্যাংশে গ্রীবাসঞ্চালন ও ভ্রূসঞ্চালন দৃষ্টিসঞ্চালন প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা

রতিভাবের সৃষ্টি হয়। এই রতিভাবই শৃঙ্গাররসে পরিণত হয়। দেবতা প্রেমিকের আসন গ্রহণ করেন এবং নর্তকীরা প্রেমিকার স্থান গ্রহণ করেন। ভরতনাট্যম্ নৃত্যে শৃঙ্গার রস ছাড়া অন্যান্য রসের স্থান অতি অল্প। তামিল সঙ্গীতশাস্ত্রের গ্রন্থ 'নটনাদি-বাদ্যরঞ্জনম'-এ দ্বাদশ তাণ্ডবের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাতে আছে যে,—ভরতনাট্যম্ নৃত্য শৃঙ্গার তাণ্ডবের ভিত্তিতে সৃষ্ট। পদম অথবা শব্দম প্রভৃতি সঙ্গীতের ভেতর 'বিপ্রলম্ভ' ও 'সম্ভোগ' শৃঙ্গারের যে উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, ভরতনাট্যম নৃত্যের গুরুদের মতে তার ভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়। তাঁদের মতে সম্ভোগ শৃঙ্গারে নায়কের বিরহে নায়িকার প্রত্যক্ষ-ভাবে বিরহ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়।

বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারে কোন রকম নিমিত্ত অবলম্বন করে নায়িকার বিরহ জাগ্রত হয়। যেমন মলয় পবন, ভ্রমরের গুঞ্জন, পূর্ণিমা চাঁদের আলো ইত্যাদি নায়িকার মনে পরোক্ষভাবে বিরহভাব জাগ্রত করে তোলে, একেই বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার বলা হয়।

রসতত্ত্ব বিচার করলে দেখা যায় যে, এই নৃত্যশৈলীতে শৃঙ্গাররসের পূর্ণ বিকাশ হয়েছে। সাধারণতঃ 'শব্দম' গানে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের যে ৪টি ভেদ আছে, তার ভেতর দুটি ভাগ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়; যথা মান ও প্রেমবৈচিত্ত্য। মানের ভেতর প্রিয় অঙ্গে ভোগচিহ্ন দর্শন, স্বপ্নে প্রিয় ও অন্য নায়িকার সঙ্গ দর্শন প্রভৃতি রূপায়িত হয় এবং প্রেমবৈচিত্ত্যের ভেতর নিজের প্রতি আক্ষেপ, সখীর প্রতি আক্ষেপ, কন্দর্পের প্রতি আক্ষেপ প্রভৃতি নৃত্যের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়। সম্ভোগের ভেতর সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ (হস্তাকর্ষণ, বস্ত্রাকর্ষন, অকস্মাৎ চুম্বন) ও সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের (স্বপ্নে মিলন, ভাবোল্লাস, একত্রে নিদ্রাবস্থা) বিষয়ও নৃত্যে পরিবেশিত হয়। ভরতনাট্যম্ নৃত্যকে নায়িকা প্রধান বলাযেতে পারে। নায়িকার সকল অবস্থাই এতে সুন্দরভাবে ও বিশদ ভাবে প্রদর্শিত হয়। হাস্যে, লাস্যে, মান ও অভিমানে নায়িকা যেন মূর্ত হয়ে ওঠে।

কেরালার কথাকলি নৃত্য বীররস প্রধান। বীররস প্রধান এইজন্যে বলছি যে, এতে মহাকাব্য অথবা পুরাণের নায়কের শৌর্য, বীর্য, দয়া, দাক্ষিণ্য অথবা ঈশ্বরে ভক্তি ইত্যাদি বিশদভাবে প্রদর্শিত হয়। পূর্বে এই নৃত্যনাট্যে পুরুষের দ্বারা স্ত্রীভূমিকা অভিনয় করে রতিভাবের অবতারণা করা হত। কিন্তু এই নৃত্যনাট্য শৃঙ্গাররসপ্রধান নয়। সেইজন্যে রতিভাব সঞ্চারীভাবের মত ক্ষণস্থায়ী।

শার্ঙ্গদেব নাট্যধর্মী বলতে নৃত্যকেই বুঝিয়েছেন। আচার্য ভরত নাট্যধর্মী বলতে স্পষ্টভাবে নৃত্য বলেন নি, তবে অঙ্গহারাভিনয়ের প্রাধান্য দিয়েছেন। নাট্যধর্মীর বিবরণে তিনি বলেছেন যে, স্ত্রী ও পুরুষ চরিত্রে একই শিল্পী অভিনয় করতে পারেন। কথাকলি নৃত্যেও আমরা দেখি নারীচরিত্রগুলি সাধারণতঃ পুরুষরা অভিনয় করে থাকেন। প্রতিনায়ক অথবা অন্যান্য চরিত্রেরদ্বারা বীভৎস অথবা রৌদ্ররসেরও অবতারণা করা হয়। 'ভীমের রক্তপান', 'পুতনাবধ' ইত্যাদি অংশগুলি বীভৎস রসের সৃষ্টি করে। এই সকল দৃশ্য সাধারণতঃ অন্যান্য নৃত্যশৈলীতে দেখা যায় না। এই নৃত্যনাট্য অভিনয় প্রধান বলে নবরসের প্রায় সবগুলিই প্রদর্শিত হয়ে থাকে। একে 'আরভটী' বৃত্তির অন্তর্গত বলা যেতে পারে। কারণ সঙ্গীতরত্নাকরে আরভটী বৃত্তির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, ক্রোধ প্রভৃতি প্রকাশ করতে 'আরভটী' বৃত্তির প্রয়োজন হয়। এই নৃত্যে অনুভাবের প্রকাশভঙ্গী সুন্দরতর। কথাকলিকে নায়কপ্রধান নৃত্যনাট্য বলা যেতে পারে।

কথক নৃত্যকেও শৃঙ্গার রসপ্রধান বলা যেতে পারে। খণ্ড খণ্ডভাবে রাধাকৃষ্ণের মধুর প্রেমলীলা এই নৃত্যে অভিব্যক্ত হয়। যেমন 'যমুনাপুলিনে', মাখনচুরি, 'গোবর্ধনধারণ' ইত্যাদি মধুর রসের সৃষ্টি করে; অপর পক্ষে দেবতাদের স্তব-স্তুতি মনে সাত্ত্বিকভাবেরও প্রেরণা দান করে। যদিও বিচ্ছিন্ন-ভাবে প্রদর্শিত হয় বলে এই নৃত্য রসঘন হবার আগেই শেষ হয়ে যায়, তবু একটি মধুর আবেশের সৃষ্টি করে দর্শকমনকে উদ্বেলিত করে তোলে। কিন্তু যখন ঠুমরী গানের সঙ্গে 'ভাব' প্রকাশ করা হয় (অভিনয়), তখন রসসৃষ্টি সার্থক হয়। কারণ নায়িকা ভেদের সকল প্রকরণগুলি এতে ব্যক্ত হয়। কথকনৃত্যে পালা কীর্তনের মত নায়িকার ভেদ প্রদর্শিত হয় না বটে, কিন্তু ছিন্ন ছিন্নভাবে নায়িকার অবস্থাগুলি প্রদর্শিত হয়। অবশ ঠুমরী গানে নানা রকম সঞ্চারীভাবের সঙ্গে নায়িকার বিভিন্ন অবস্থা রূপায়িত হয়। এতে নায়ক নায়িকা উভয়ই প্রধান। এই নৃত্য তাল লয় প্রধান বলে এতে অভিনয়ের প্রদর্শন অপেক্ষাকৃত কম। অনুভাবের প্রকাশও সুন্দরতর।

ভারতের চারটি নৃত্যধারার আলোচনা করে দেখা গেল, 'কথাকলি' ব্যতীত অন্যান্য নৃত্যগুলিতে শৃঙ্গাররসই প্রধান। শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, আলঙ্কারিক প্রত্যেকেই শৃঙ্গার রসের অনুপম মাধুর্য স্বীকার করেছেন। নৃত্যনাট্যে

অথবা নৃত্যে রসসৃষ্টি সার্থক তখনই, যখন তা সুন্দরভাবে মঞ্চে উপস্থাপিত হয় ও দর্শক মনকে নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করে। আখ্যানবস্তু, মুদ্রা, আঙ্গিকাভিনয় মুখের অভিব্যক্তি, বেশভূষা ও মঞ্চসজ্জার ওপর এই রসসৃষ্টি অনেকাংশে নির্ভর করে। শিল্পীর মনে গভীর অনুভূতি না থাকলে রসসৃষ্টি সার্থক হয় না।

মঞ্চে যা প্রদর্শিত হয়, নাট্যকাররা তাকে 'অবস্থান' বলেছেন। জাগতিক সুখ দুঃখের গভীর অনুভূতিকে শিল্পী যখন অঙ্গভঙ্গী ও ভাবের দ্বারা দর্শকের মনে রসের সঞ্চার করে গভীর আবেগের সৃষ্টি করেন, তখনই নৃত্যে অথবা নাট্যে রসসৃষ্টি সার্থক হয়। প্রাচীন নাট্যকাররা একে বলেছেন 'অনুকৃতি'। নাটকে অথবা নৃত্যে আমরা লোকবৃত্তির অনুকরণ বা অনুসরণ করি অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত ভাবটিকেই প্রকাশ করি। অভিনব গুপ্ত বলেছেন— 'অনুকার ইতি হি সদৃশকরণম্।" শিল্পী লোকবৃত্তির অনুকরণ করবেন বটে, কিন্তু ভাবাবেগের আতিশয্যে আত্মহারা হয়ে অভিনেয় বস্তু সম্বন্ধে কখনই সচেতনতা হারাবেন না। মুনি ভরত বলেছেন "তদন্তে অনুকৃতিবর্দ্ধা"। নান্দীর পর অনুকৃতিকে (অভিনয়কে) বাঁধতে হয় অর্থাৎ নাট্যের প্রস্তাবনা করতে হয়। দশটি রূপকের ভেতর কোনটি অভিনীত হবে তারই পূর্বাভাষ দিতে হয়। এ. কে. কুমারস্বামী এই কথাটিই সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন— "The actor should not be carried away by the emotions he represents, but should rather be the over conscious master of the puppet show performed by his own body on the stage." সুতরাং এ কথা ঠিক যে, শুধুমাত্র হাসি, কান্না প্রভৃতির অনুকরণেই রসসৃষ্টি হয় না। যখন তা শিল্পীর শিল্প প্রতিভার গুণে সুষমামণ্ডিত হয়ে মঞ্চে উপস্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সহৃদয়সংবাদী মনকে সরস করে তোলে, তখনই রসসৃষ্টি সার্থক হয়।

ভরতমুনি বলেছেন—

"নানাভাবোপসম্পন্নং নানাবস্থান্তরাত্মকম্।
লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যমেতন্ময়া কৃতম্।"

সুতরাং আদর্শ শিল্পীর পক্ষে রসবিচার শক্তি এবং ক্ষেত্রানুসারে তার সার্থক পরিবেশন একান্তই আবশ্যক। তা না হ'লে রসদুষ্ট অভিনয় সামগ্রিক ভাবে নাট্য প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়।

রঙ্গমঞ্চ ও পূর্বরঙ্গ

নমস্কৃত্য মহাদেবং সর্বলোকোদ্ভবং ভবম্ ।
জগৎপিতামহং চৈব বিষ্ণুমিন্দ্রং গুহং তথা ॥
এতাংশ্চান্যাংশ্চ দেবর্ষীন প্রণম্য রচিতাঞ্জলিঃ ।
যথাস্থানান্তরগতান্ সমাবাহ্য ততো বদেৎ ॥

যবনিকার অর্থ।

আধুনিক রঙ্গমঞ্চ ও তার আধুনিক বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম দেখে আমাদের মনে হতে পারে যে, রঙ্গমঞ্চের ব্যবহার আমরা বিদেশাগতদের কাছ থেকে শিখেছি। কেউ কেউ মনে করেন যে, আইওনিয়ান প্রভাব আমাদের ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ গঠনে সহায়তা করেছে। 'যবনিকা' কথাটি আমাদের এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। তাঁদের মতে য়ুনীয়ন শব্দটি এসেছে 'যবন' শব্দটি থেকে। 'যবনিকা' শব্দের অর্থ হচ্ছে পর্দা। সুতরাং যবন কর্তৃক ব্যবহৃত পর্দা ; এই কথা মনে করাই স্বাভাবিক। 'যবন' বলতে বিদেশাগতদের বোঝাত। সুতরাং এ কথা স্বাভাবিক ভাবেই বিশ্বাসযোগ্য যে, যবনিকা তাঁরাই ব্যবহার করতেন এবং রঙ্গমঞ্চের প্রচলন তাঁরাই করেছিলেন।

প্রাচীন রঙ্গমঞ্চ :—

কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। প্রথমতঃ সংস্কৃত শব্দকোষে আমরা 'যমনিকা' শব্দটি পাই। এর অর্থ হচ্ছে 'বন্ধন'। রঙ্গমঞ্চের পর্দাকেও এক রকম বন্ধন বলা যেতে পারে। কারণ রঙ্গমঞ্চ ও নেপথ্যবিন্যাসকে লোকচক্ষুর অন্তরাল করবার জন্য পর্দা দিয়ে আবেষ্টনের সৃষ্টি করা হয়। সুতরাং যমনিকার অপভ্রংশ যবনিকা হতে পারে এ কথা মনে করা অসঙ্গত নয়। এ ছাড়া আচার্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রে যে বিবরণ আছে তা পড়ে আমাদের এই বিশ্বাস জন্মায় যে, প্রাচীন যুগেও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ভারতে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত হত। এই রঙ্গমঞ্চগুলির ক্ষেত্র ছিল সাধারণতঃ পর্বত গুহা। যোগীমারা গুহা ও সীতাবেঙ্গা গুহার রঙ্গমঞ্চ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ছাড়া প্রাচীন সংস্কৃত নাটকেও রঙ্গমঞ্চের বহু উল্লেখ আছে। প্রাচীন ভারতে রঙ্গমঞ্চের নির্মাণ পদ্ধতি পর্বত গুহার আকারে ছিল।

মুনি ভরত বলেছেন—

"কার্যঃ শৈলগুহাকারো দ্বিভূমির্নাট্যমণ্ডপঃ।"

এই নির্মাণ পদ্ধতির বিজ্ঞানসম্মত সার্থকতাও যথেষ্ট রয়েছে। তার কারণ

গুহার ভেতরে মধ্যবর্তী ছাদ যদি উঁচু হয় এবং দুই পাশ ক্রমশঃ নীচু হয়ে আসে, তাহলে শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে গুহার যে কোন জায়গা থেকে স্পষ্ট শোনা যায়। এই কারণে নাট্য গৃহ গুহার আকৃতিবিশিষ্ট হওয়া উচিত।

মুনি ভরত রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুতের সমস্ত বিবরণই অতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। এখানে সংক্ষেপে তার আলোচনা করছি। প্রথমেই তিনি ভূমি মনোনয়ন ব্যাপারে পাঁচ রকম ভূমির উল্লেখ করেছেন; যথা—সমা, স্থিরা, কঠিনা, কৃষ্ণা ও গৌরী। 'সমা' বলতে নাতি-নিম্ন ও নাতি-উচ্চ ভূমি নির্দেশ করে। 'স্থিরা' হচ্ছে অচলস্বভাবা অর্থাৎ যা সহজে ধ্বসে যায় না। 'কঠিনাকে' অনুর্বরা বলা হয়েছে অর্থাৎ উর্বরাশক্তিসম্পন্না। 'কৃষ্ণা' ও 'গৌরী', মাটীর বর্ণ অনুসারে নাম ধরে। সর্বপ্রথমে এই সকল ভূমিকে শোধন করে লাঙ্গল দিয়ে লতা, গুল্ম, পাথর উঠিয়ে ফেলতে হয়।

ভূমি শোধনের বিস্তৃত বিবরণের পর প্রেক্ষাগৃহ তৈরীর বিস্তৃত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাতে দেখা যায় যে, প্রেক্ষাগৃহ তিনরকমের—বিকৃষ্ট, চতুরস্র ও ত্র্যস্র। আয়তন অনুসারে এদের জ্যেষ্ঠ (বড়), মধ্য (মাঝারি), অবর (ছোট) এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে।

শতং চাষ্টৌ চতুঃ ষষ্টিহস্তা দ্বাত্রিংশদেব চ।
অষ্টাধিকং শতং জ্যেষ্ঠং চতুঃষষ্টিস্তু মধ্যমম্।
কনীয়স্তু তথা বেশ্মহস্তা দ্বাত্রিংশদিষ্যতে॥'
"দেবানাং তু ভবেজ্জ্যেষ্ঠং নৃপাণাং মধ্যমং ভবেত্।
শেষানাং প্রকৃতীনাং তু কনীয়ঃ সংবিধীয়তে।"

'জ্যেষ্ঠ' ১০৮ হস্ত, 'মধ্যম' চৌষট্টি হস্ত এবং কনিষ্ঠ বত্রিশ হস্ত হবে। দেবতাদের জন্যে জ্যেষ্ঠ, নৃপদের জন্যে 'মধ্যম' এবং সাধারণ প্রজাদের জন্যে 'কনিষ্ঠ' প্রেক্ষাগৃহ নির্দিষ্ট ছিল। বিকৃষ্ট (আয়তাকৃতি) হচ্ছে জ্যেষ্ঠ, চতুরস্র (বর্গাকৃতি) হচ্ছে মধ্যম, এবং ত্র্যস্র (ত্রিকোন) হচ্ছে কনিষ্ঠ।

"প্রেক্ষাগৃহাণাং সর্বেষাং প্রশস্তং মধ্যমং স্মৃতম্।
তত্র পাঠ্যং চ গেয়ং চ সুখশ্রাব্যতরং ভবেত্॥"

আচার্য ভরত মধ্যম প্রেক্ষাগৃহ সব থেকে প্রশস্ত বলেছেন। এতে পাঠ্য এবং গেয় সুখশ্রাব্য হয়। টীকাকার অভিনব গুপ্তের মতে 'সমবকার' রূপায়ণে জ্যেষ্ঠ নাট্যগৃহই শ্রেয়। নাট্যশাস্ত্রে মধ্যম প্রেক্ষাগৃহ তৈরীর পূর্ণ বিবরণ আছে।

একটি চৌষট্টি হাত পরিমাণ জায়গাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করতে হবে। যে সুতো দিয়ে পরিমাপ করা হবে তা কার্পাস, তূলা, বাবজ ঘাস এবং মুঞ্জা ঘাস অথবা বল্কলজাত রজ্জু, দিয়ে নির্মিত হবে। কোন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে তৈরী করাতে হবে। এমনিভাবে সুতোটি তৈরী করতে হবে যে, যাতে এর ভেতর কোন জোড়া না থাকে অথবা না ছেঁড়ে। যদি এর মধ্য ভাগ ছিঁড়ে যায় তাহলে সত্বাধিকারীর মৃত্যু হয়। যদি তৃতীয় ভাগ ছেঁড়ে, তাহলে রাষ্ট্রকোপ হয় এবং চতুর্থভাগ ছিঁড়ে গেলে প্রধান নাট্যাচার্যের মৃত্যু হয়। হাত থেকে পড়ে গেলেও ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং অত্যন্ত সাবধানের সঙ্গে এই সুতো ব্যবহার করা উচিত। দুইভাগে বিভক্ত প্রেক্ষাগৃহের একটি ভাগকে চারভাগে বিভক্ত করে তার একটি ভাগকে রঙ্গশীর্ষের জন্যে অবশ্যই রাখতে হবে। সবথেকে পেছনভাগ (পশ্চিম) নেপথ্য গৃহের জন্যে রাখতে হবে। পূর্বভাগে দর্শকদের জন্যে স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকবে। নাট্যশাস্ত্রের গায়কোয়ার সংস্করণে ডি. সুব্বারাও যে মন্তব্য করেছেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন যে, রঙ্গপীঠ অথবা মত্তবারনীর জন্য কোন স্থান ভাগ করা নেই।

শুভ তিথিতে ও অনুকূল মুহূর্তে ব্রাহ্মণদের তৃপ্তি বিধান করে 'পুন্যাহ' বাক্য উচ্চারণ ও শান্তিবারি সেচন করে তারপর সুতো বিস্তার করতে হবে। শঙ্খ, দুন্দুভি, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যধ্বনির সঙ্গে নাট্যগৃহের ভিত পুজো করতে হবে এবং অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে। নানারকম খাদ্যবস্তু ও ফুলের অর্ঘ্য সাজিয়ে নক্ষত্র রাজিত রাত্রে দশদিকে দশদিকপালকে নিবেদন করতে হবে। পূর্বদিকে শুক্ল অন্ন, পশ্চিমদিকে পীত অন্ন, দক্ষিণদিকে নীল অন্ন, ও উত্তর দিকে লোহিত অন্ন মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক নিবেদন করতে হবে। দ্বারোদ্ঘাটনের সময় ব্রাহ্মণদের ঘৃতসংযুক্ত পরমান্ন, রাজন্যবর্গকে মধুপর্ক এবং অন্যান্যদের গুড়ের সঙ্গে অন্ন বণ্টন করতে হবে। অনুকূল মুহূর্তে, শুক্লপক্ষে, মূলা নক্ষত্র যখন শুভ, তখন কোন সুধীজনের দ্বারা এই দ্বারোদ্ঘাটন করতে হবে। এর পর প্রাচীর গাঁথা হলে রোহিণী অথবা শ্রবণা :নক্ষত্রযোগে, শুক্লপক্ষে' শুভকরণে, সূর্যোদয়ের মুহূর্তে সুশিক্ষিত আচার্য (যিনি ত্রিরাত্রি উপবাস করেছেন) দ্বারা স্তম্ভ স্থাপন করতে হবে। প্রথম ব্রাহ্মণ স্তম্ভ আগ্নেয় কোণে হওয়া উচিত। এই স্তম্ভে ঘৃত ও মন্ত্রপূত শ্বেতসর্ষপ এবং ব্রাহ্মণদের পায়স দিতে হবে। এতে সকল দ্রব্যই সাদা হবে। ক্ষত্রিয় স্তম্ভে রক্তবর্ণ

বস্ত্র, রক্তবর্ণ ফুলের মালা, ও রক্তচন্দন দিতে হবে। ব্রাহ্মণকে গুড়ান্ন দান করতে হবে। বৈশ্য স্তম্ভ উত্তরপশ্চিমমুখী হবে। ব্রাহ্মণদের ঘৃতান্ন দান করতে হবে। এর সকল দ্রব্যই হলদে বর্ণের হবে। শূদ্র স্তম্ভ উত্তরপূর্বমুখী হবে এবং এর সকল দ্রব্যই নীল রঙের হবে। ব্রাহ্মণস্তম্ভের মূলদেশে স্বর্ণকর্ণাভরণ, ক্ষত্রিয়স্তম্ভের মূলদেশে তাম্রকর্ণাভরণ, বৈশ্যস্তম্ভের মূলদেশে রৌপ্য কর্ণাভরণ এবং শূদ্র স্তম্ভের মূলদেশে লোহার কর্ণাভরণ রাখতে হবে। কিন্তু প্রত্যেক স্তম্ভের মূলেই সোনা রাখতে হবে। স্তম্ভগুলি স্থাপন করবার সময় ব্রাহ্মণদের প্রচুর পরিমাণে রত্নদান, গোদান ও বস্ত্রদান করতে হবে। এই স্তম্ভগুলির ভেতর কোনটি যদি তুলে ফেলা হয়, তাহলে নানারকম কুফল ফলে। স্থানান্তরিত হ'লে দেশে বৃষ্টি হয় না, যদি নড়ে যায়, তাহলে মৃত্যুভয় থাকে এবং যদি কাঁপে তবে পররাজ্যের দ্বারা ভীতি প্রদর্শনের সম্ভাবনা থাকে। স্তম্ভ স্থাপনের সময় জয়ধ্বনি করতে হবে। ব্রাহ্মণ স্তম্ভ স্থাপনের সময় গোদান এবং অন্যান্য স্তম্ভ স্থাপনের সময় সত্ত্বাধিকারী সাধ্যমত ভোজন করাবেন। এইসকল কাজ নাট্যাচার্যের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া উচিত। এই স্তম্ভগুলি রঙ্গমণ্ডপের কোণের দিকে স্থাপন করা উচিত।

রঙ্গমণ্ডপ—রঙ্গমঞ্চকে 'রঙ্গমণ্ডপ' বলা হয়েছে। রঙ্গমণ্ডপের উচ্চতা মত্তবারনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করতে হবে। অভিনয় দর্পণে 'রঙ্গ' সম্বন্ধে বলা হয়েছে— 'তদগ্রে নর্টনং কুর্য্যাৎ-তৎস্থলং রঙ্গ উচ্যতে।' অর্থাৎ যার আগে নর্তন ও অভিনয় করতে হবে, সেই জায়গাকে 'রঙ্গ' বলা হয়ে থাকে।

মত্তবারনা—এর অর্থ হচ্ছে মত্ত হস্তীর শ্রেণী। চারটি স্তম্ভের সঙ্গে এদের পাগুলি বাঁধা থাকবে। এর দৈর্ঘ্য-রঙ্গশীর্ষের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী হবে। এগুলি রঙ্গপীঠের দুপাশকে আবৃত করে রাখবে। মত্তবারনীর একটি গূঢ় অর্থ আছে। দেবরাজ ইন্দ্র 'জর্জর' দিয়ে বিঘ্ননাশ করতেন বলে তিনি স্বয়ং রঙ্গপীঠের পাশে উপস্থিত থাকতেন। মত্তবারনীতে দৈত্যানিষূদনী' বিদ্যুৎ রাখা হত। ঐরাবত হচ্ছে মহেন্দ্রের প্রতীক। বিদ্যুতের শক্তির সঙ্গে ঐরাবতের শক্তি তুলনীয়। সুতরাং ঐরাবত রঙ্গমঞ্চকে সবরকম বাধাবিঘ্ন থেকে রক্ষা করবে। সেইজন্যে এই মত্তবারনী রঙ্গপীঠের স্তম্ভের উভয়দিকের সম্মুখভাগে এমনভাবে স্থাপিত হবে যাতে দৃশ্যমান হয়। আরও বলা হয় যে, হিন্দুশাস্ত্রমতে হাতী শুভসূচক মাঙ্গলিক দ্রব্যের অন্যতম।

রঙ্গশীর্ষ—রঙ্গশীর্ষ বলতে রঙ্গের শীর্ষদেশ অথবা উপরিভাগ বোঝায়। সুতরাং রঙ্গপীঠের জন্যে পৃথকভাবে কোন স্থান নির্দেশ করা হয় নি। এতে উত্তর ও দক্ষিণে ছুটি দরজা নেপথ্য গৃহ থেকে রঙ্গপীঠে প্রবেশের জন্যে নির্দিষ্ট থাকবে। নাট্যাচার্য ১৮ রকমের নাট্যমণ্ডপের নির্মাণপদ্ধতি বিশেষভাবে উল্লেখ করে উপসংহারে বলেছেন যে, এইভাবে আরও বহুরকম নাট্যমণ্ডপের পরিকল্পনা করা যেতে পারে। রঙ্গশীর্ষ এমনভাবে তৃণ ও পাথরশূন্য করতে হবে, যেন স্থান আয়নার মত সমতল ও মসৃণ হবে। মুনি ভরত রঙ্গশীর্ষ সম্বন্ধে স্পষ্টই বলেছেন যে

"কূর্মপৃষ্ঠং ন কর্তব্যং মৎস্যপৃষ্ঠং তথৈব চ।"

এই নাট্যগৃহকে নানারকম চিত্র ও রত্নাদি দিয়ে সাজাতে হবে এবং নাটক অভিনীত হবার উপযোগী করে নিতে হবে। এইরকম রঙ্গশীর্ষই সাবলীল নৃত্যের উপযোগী এবং এতেই গীতবাদ্যাদির ধ্বনি সহজেই প্রতিধ্বনিত হয়। নাট্যশাস্ত্রে আছে যে, রঙ্গশীর্ষ ষড়্দারু দিয়ে তৈরী হবে অর্থাৎ ৬টি কাঠের খণ্ডের দ্বারা এর অবয়ব নির্মাণ করতে হবে। রঙ্গপীঠ ও রঙ্গশীর্ষের মধ্যদেশ ফাঁপা হলে নৃত্য ও সঙ্গীতের উপযোগী হয়। ষড়্দারু বলতে ছয়খানি কাঠের তৈরী স্তম্ভ। নটনটীদের রঙ্গশীর্ষের ওপর সমস্ত স্থান নিয়ে নৃত্য অথবা অভিনয় করতে হত। এইজন্য সর্বত্র ভারসাম্য রক্ষা করবার জন্য এই ধরণের ষড়দারু
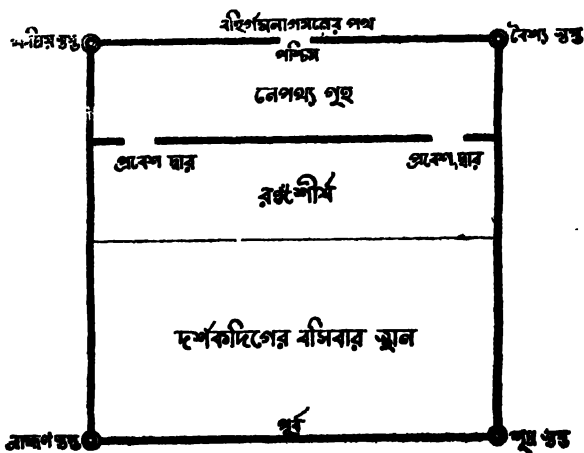
ব্যবহৃত হত। এতে মূল্যবান পাথরও ব্যবহৃত হত। পূবে হীরকখণ্ড, দক্ষিণে বৈদূর্যমণি, পশ্চিমে স্ফটিক, এবং উত্তরে প্রবাল স্থাপনের বিধান ছিল।

মুনিভরত বলেছেন যে, বিচক্ষণতার সঙ্গে চিন্তা করে স্থির করবার পর নাটক মঞ্চস্থ করলে তা দর্শকের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। রঙ্গশীর্ষের ওপরতলা ও নীচের তলা থাকত। বায়ুচলাচল এবং শব্দনিয়ন্ত্রণের জন্যে নাট্যগৃহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জানলা থাকত। দর্শকরা ইট অথবা কাঠের নির্মিত উঁচুভূমিতে বসতেন।

চতুরস্র (চতুষ্কোণ) রঙ্গমঞ্চও এই প্রথায় নির্মিত হত। কিন্তু এর দৈর্ঘ্য হত ৩২ হাত। ত্র্যস্র (ত্রিকোন) রঙ্গমঞ্চ প্রায় একই রকমের হত। কিন্তু এতে জনসাধারণের প্রবেশের জন্যে মঞ্চের সম্মুখভাগে ও পেছনের দিকে দুটি দরজা থাকত। এর আকার ত্রিভুজাকৃতি। ত্রিভুজাকৃতি রঙ্গমঞ্চের সংকীর্ণ দিকটিতে রঙ্গমঞ্চ তৈরী হত এবং বিস্তৃত দিকটি দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট থাকত।

এইভাবে সর্বলক্ষণসম্পন্ন নাট্যগৃহ প্রস্তুত হলে তাতে রঙ্গপুজোর বিধান ছিল। ব্রাহ্মণরা পুজো করতেন। নিশাগমে মন্ত্রপূত বারিসিঞ্চনে রঙ্গমঞ্চ দেবতাদের অধিবাসের যোগ্য করে নিতে হত। নাট্যাচার্য নতুন বস্ত্র পরে ত্রিরাত্রি উপবাস করে স্থানান্তরে গমন করে সংযমী হয়ে এবং নিজেকে

বারিসিঞ্চনে শুদ্ধ করে রঙ্গমঞ্চকে শুদ্ধ করতেন। প্রথমে সর্বলোকেশ্বর মহাদেব, জগৎপিতামহ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রকে নমস্কার করে পরে সরস্বতী, লক্ষ্মী, সিদ্ধি, মেধা, ধৃতি, স্মৃতি, সোম, সূর্য, মরুৎ ও লোকপালদের নমস্কার করতে হত। অগ্নি, সুর, রুদ্র, কাল, কলি, মৃত্যু, নিয়তি, কালদণ্ড, বিষ্ণুপ্রহরণ, নাগরাজ বাসুকী, বজ্র, বিদ্যুৎ, সমুদ্র, গন্ধর্ব, অপ্সরা, মুনি, ভূত, পিশাচ, যক্ষ ও গণপতিকে প্রণাম করে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হত। 'জর্জর' পুজোর সময় 'কুতপ', স্থাপন করতে হত। জর্জর হচ্ছে মহেন্দ্র প্রহরণ। যখন 'ত্রিপুরদহন' নাটক

অভিনীত হচ্ছিল, সেই সময় নাটকে দৈত্যকুলের পরাজয় দেখে দৈত্যরা ক্রুদ্ধ হয় এবং নাটক পণ্ড করবার জন্যে নটনটীদের অদৃশ্যভাবে আক্রমণ করে তাদের স্মৃতিশক্তি বিনষ্ট করে। মহেন্দ্র ধ্যানের দ্বারা সে কথা জানতে পেরে একখানি বংশদণ্ড দিয়ে তাদের জর্জর অথবা স্থবির করে দেন এবং সকলকে রক্ষা করেন। সেই থেকে এই 'প্রহরণের' নাম হয় জর্জর এবং অভিনয়ের পূর্বে এর পুজোও প্রচলিত হয়। জর্জর একটি বাঁশের লাঠি। এই বংশখণ্ডটিকে পাঁচটি রঙে রঙ করা হত; যথা শুক্লবর্ণ (সাদা), নীলবর্ণ, পীতবর্ণ, রক্তবর্ণ এবং নানা বর্ণ। প্রথম অংশে ব্রহ্মা, দ্বিতীয় অংশে শঙ্কর, তৃতীয় অংশে বিষ্ণু, চতুর্থ অংশে স্কন্দ (কার্তিকেয়) এবং পঞ্চম অংশে মহানাগ, শেষ, বাসুকি প্রভৃতির স্থিতি কল্পনা করা হত। তারপর দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রক্ষ, দশদিকপাল, প্রভৃতির যথাযথ পুজো করবার পর নাট্যাচার্য প্রদীপ দিয়ে রঙ্গভূমি প্রদীপ্ত করতেন। এইভাবে রঙ্গদেবতাদের পুজো অর্থাৎ রঙ্গপুজো শেষ করে পূর্বরঙ্গ সমাপ্ত করবার রীতি ছিল।

পূর্বরঙ্গ—অভিনব গুপ্তের মতে রঙ্গে যা পূর্বে প্রযুক্ত হয় তাই 'পূর্বরঙ্গ'। অর্থাৎ গীত, তাল, বাদ্য, নৃত্য ও পাঠ্যের ব্যস্ত ও সমস্তভাবে প্রয়োগকে পূর্বরঙ্গ বলা হয়। সাহিত্য দর্পণে বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন—

> "যন্নাট্য বস্তুনঃ পূর্বং রঙ্গবিঘ্নোপশান্তয়ে।
> কুশীলবাঃ প্রকুর্বন্তি পূর্বরঙ্গঃ স উচ্যতে॥"

সঙ্গীতদামোদরে বলা হয়েছে—

> "পূর্বরঙ্গঃ সভাপূজা কবের্গোত্রাদিকীর্তনম্।
> নাটকাদেস্তথা সংজ্ঞা সূত্রধারোঽপ্যথামুখম্॥"

'নাট্যারম্ভে শুদ্ধভাবে সভাপূজা হবার পর কবির গোত্রাদির পরিচয় এবং নাটকের নাম প্রভৃতির দ্বারা সূত্রধার প্রস্তাবনা (আমুখ) করবেন। একে 'পূর্বরঙ্গ' বলা হয়। যাই হোক, ভরতমুনির মতে পূর্বরঙ্গের উনিশটি অঙ্গ। এর মধ্যে নয়টি হচ্ছে অন্তর্যবনিকা এবং দশটি হচ্ছে বহির্যবনিকা। অন্তর্যবনিকা হচ্ছে প্রত্যাহার, অবতরণ, আরম্ভ, আশ্রাবণা, বক্ত্রপাণি, পরিঘট্টনা, সঙ্ঘোটনা, মার্গাসারিত ও আসারিত।

প্রত্যাহার—কুতপের বিন্যাসকে 'প্রত্যাহার' বলা হয়েছে।

কুতপ—বীণাদি চতুর্বিধ বাদ্যযন্ত্র ও বাদ্যযন্ত্রীদের সমাবেশকে 'কুতপ' বলা হয়েছে। আচার্য ভরত, বৈপঞ্চিক (বীনাবাদক), বংশীবাদক, মৃদঙ্গ, পণব

ও দর্দুরবাদক প্রভৃতি শিল্পীদের সমাবেশকে 'কুতপ বিন্যাস' বলেছেন। শার্ঙ্গদেব মৃদঙ্গজাতীয় একটি বাদ্যযন্ত্রকে 'কুতপ' বলেছেন। নাট্য বা অভিনয়ের জন্যে নির্দিষ্ট কুতপের নাম 'নাট্য কুতপ'। এই নাট্যকুতপ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—উত্তম, মধ্যম ও অধম। শার্ঙ্গদেব তিনটি কুতপের সমাবেশকে 'বৃন্দ' বলেছেন। সিংহভূপাল 'বৃন্দ' অর্থাৎ 'সংঘাত' বলেছেন। শার্ঙ্গদেবের মতে যে বৃন্দে চারজন মূল গায়ক, আটজন সমগায়ক, চারজন বংশীবাদক ও চারজন মৃদঙ্গবাদক থাকত তার নাম 'উত্তম বৃন্দ'। যে বৃন্দে দুজন মূল গায়ক, চারজন সমগায়ক, দুজন বংশীবাদক ও দুজন মৃদঙ্গবাদক থাকত, তার নাম 'মধ্যমবৃন্দ।' কনিষ্ঠ বা 'অধমবৃন্দে' একজন মূল গায়ক, তিনজন সমগায়ক, দুজন বংশীবাদক ও দুজন মৃদঙ্গবাদক থাকত। 'কুতপ বিন্যাস' প্রসঙ্গে মুনি ভরত 'ত্রিসামের' কথাও বলেছেন। বাদ্যযন্ত্রগুলি বাজাবার আগে রঙ্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তিনজনের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর) মন্ত্র-গান করা হত, তাকে 'ত্রিসাম' বলা হয়েছে।

অবতরণ—আচার্য ভরত বলেছেন—"গায়কানাং নিবেশনম্"! গায়কদের প্রবেশ ও উপবেশন হচ্ছে "অবতরণ"। পশ্চিমে পূর্বাভিমুখী হয়ে কুতপদল বসবেন। গৃহদ্বারদ্বয়ের মধ্যেখানে পূর্বাভিমুখী হয়ে মৃদঙ্গবাদক বসবেন। এদের বামদিকে পাণিকদ্বয় থাকবেন। রঙ্গপীঠের দক্ষিণে উত্তরাভিমুখী গায়করা এবং তার আগে উত্তরদিকে দক্ষিণাভিমুখী গায়িকারা বসবেন। এর বামদিকে বৈণিক (বীণাবাদক) বসবেন। নেপথ্যগৃহের মাঝখানে কুতপ বিন্যাস হবে।

আরম্ভ—"পরিগীত-ক্রিয়ারম্ভ আরম্ভ ইতি কীর্তিতঃ। কণ্ঠসঙ্গীতে আলাপের আরম্ভকে 'আরম্ভ' বলা হয়।

আশ্রাবণা—'আতোদ্যরঞ্জনার্থং তু ভবেদাশ্রাবণাবিধিঃ। অর্থাৎ নাট্যের উপযোগী করবার জন্যে বাদ্যযন্ত্রগুলিতে রঞ্জনাশক্তি সৃষ্টি করবার নাম 'আশ্রাবণা'।

আতোদ্য—চার রকম বাদ্যকে আতোদ্য বলা হয়। এই চার রকম বাদ্য হচ্ছে—তত (বীণা প্রভৃতি বাদ্য), আনদ্ধ (মুরজা ইত্যাদি), শুষির (বাঁশী প্রভৃতি বাদ্য), ও ঘন (কাংস্য তাল প্রভৃতি বাদ্য)।

বক্ত্রপাণি—"বাদ্যবৃত্তিবিভাগার্থং বক্ত্রপাণির্বিধীয়তে।" বাদ্যবৃত্তি বলতে বাদন পদ্ধতি বোঝাচ্ছে। অভিনব গুপ্ত বলেছেন—"বক্ত্রে প্রারম্ভে হস্তাঙ্গুলি ব্যাপারঃ"।

বেণু প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রগুলির ওপর সঙ্গীতের প্রারম্ভে হস্তাঙ্গুলি চালনার ব্যাপারকে 'বক্তুপ্রাণি' বলা হয়।

পরিঘট্টনা—"তন্ত্র্যোজঃকরণার্থং তু ভবেচ্চ পরিঘট্টনা"। শক্তি সঞ্চারের জন্যে তন্ত্রীগুলির যথাযথ চালনাকে 'পরিঘট্টনা' বলে।

সঙ্ঘোটনা—"তথা পাণিবিভাগার্থং ভবেৎ সংঘোটনাবিধিঃ।" পাণিবিভাগকে 'সঙ্ঘোটনা' বলা হয়। বীণাবাদ্যের সহায়করূপে মৃদঙ্গজাতীয় বাদ্যযন্ত্রের প্রহার-পঞ্চকের ক্রিয়াকে 'সঙ্ঘোটনা' বলা হয়।

মার্গাসারিত—"তন্ত্রীভাণ্ডসমাযোগান্মার্গাসারিতমিষ্যতে"। সমান তালে ও লয়ে একই সঙ্গে বীণা ও মৃদঙ্গ বাজাবার প্রণালীকে 'মার্গাসারিত' বলা হয়।

আসারিত—"কলাপাতবিভাগার্থং ভবেদাসারিত ক্রিয়া।" সঙ্গীতের সঙ্গে তাল রক্ষা করার নাম 'আসারিত।' এরপর বহির্যবনিকা। এর দশটি অঙ্গ—গীতবিধি, উত্থাপন, পরিবর্তন, নান্দী, শুষ্কাবকৃষ্টা, রঙ্গদ্বার, চারী, মহাচারী, ত্রিগত ও প্ররোচনা।

গীতবিধি—দেবতাদের স্তুতি ও মহিমাকীর্তন-'গীতবিধি' বলে পরিচিত। এতে বর্ধমান প্রভৃতি গীতের প্রয়োগ হয়।

উত্থাপন—নান্দীপাঠকরা সর্বপ্রথমেই প্রয়োগের উত্থাপন করেন বলে একে 'উত্থাপন' বলা হয়।

পরিবর্তন—চতুর্দিকে ঘুরে লোকপালদের বন্দনা করা হয় বলে এর নাম 'পরিবর্তন'। পরিবর্তন চার রকমের হয়—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ। প্রথম পরিবর্তন স্থিত লয়ে করতে হয়। প্রথমে সূত্রধার শুভ্রবস্ত্র পরে পুষ্পাঞ্জলি হাতে প্রবেশ করবেন। তাঁর সঙ্গে দুজন পারিপার্শ্বিক 'ভৃঙ্গার' ও 'জর্জর' হাতে প্রবেশ করবেন। সূত্রধার মাঝখানে থাকবেন। তাঁরা বৈষ্ণবস্থানে দণ্ডায়মান হয়ে সৌষ্ঠবের লক্ষণ পরিস্ফুট করবেন। এরূপ র রঙ্গস্থলের মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে অভিবাদন করবেন। তারপর জর্জর গ্রহণ, বন্দনা প্রভৃতি হবে। সূত্রধারের প্রবেশ থেকে বন্দনা পর্যন্ত প্রথম পরিবর্তন। দ্বিতীয় পরিবর্তন মধ্যলয়াশ্রিত। তৃতীয় পরিবর্তনে মণ্ডপ প্রদক্ষিণ, আচমন করে জর্জর গ্রহণ ও বিঘ্ননাশ প্রভৃতির জন্যে শ্লোক উচ্চারণ। চতুর্থ পরিবর্তনে চতুর্থকার যথাবিধি বৈষ্ণবস্থানে অবস্থান করে পুষ্পের দ্বারা যথাক্রমে জর্জর, কুতপ ও সূত্রধারের পুজো করবেন। এতে গান থাকবে না। শুধুমাত্র

শুষ্কাক্ষরের গান থাকবে। এই গান দ্রুত লয়ে গীত হবে। এর পর মধ্যস্বরকে আশ্রয় করে নান্দীপাঠ হবে।

নান্দী—আশীর্বচনযুক্ত শ্লোককে "নান্দী' বলা হয়। এতে আশীর্বাদ, নমস্ক্রিয়া অথবা বস্তুনির্দেশের কোন একটি থাকবে। দেব, দ্বিজ, নৃপ অথবা গুরুজনের স্তুতি কীর্তনই নান্দী। যেহেতু এটি কাব্য এবং কবীন্দ্র (নাট্যকার), কুশীলব, পারিষদবর্গ এবং অন্যান্য সাধুসজ্জনকে আনন্দ দান করে, সেহেতু এর নাম 'নান্দী'। রঙ্গবিঘ্ন উপশমের জন্য এর অবশ্যকর্তব্যতা কীর্তিত হয়েছে। "তথাপ্যবশ্যং কর্তব্যা নান্দী বিঘ্নোপশান্তয়ে।"

শুষ্কাবকৃষ্টা—এতে শুষ্কাক্ষর দ্বারা জর্জর স্তুতিমূলক শ্লোক পাঠ করা হয়। একে মুনিভরত 'জর্জর-শ্লোক-'দর্শিকা' বলেছেন।

রঙ্গদ্বার—রঙ্গদ্বার হচ্ছে বাচিক অভিনয়াত্মক। যে স্থান থেকে অভিনয়ের সর্বপ্রথম অবতারণা করা হয়, তাকে 'রঙ্গদ্বার' বলা হয়।

চারি—অভিনয়ের যে অংশে মহাদেবীর সঙ্গে মহাদেবের শৃঙ্গার প্রধান চরিত্র অঙ্গহার প্রভৃতি দ্বারা প্রদর্শিত হয়, তাকে 'চারী' বলে। চারী প্রয়োজনমত ত্র্যস্র, চতুরস্র ও মধ্যলয়ান্বিত হবে। চারীর শেষে দর্শকদের আনন্দদানের জন্যে দেবদ্বিজাদির স্তবস্তুতি বিষয়ক নানা ভাবসমন্বিত মধুর শ্লোক পাঠ করতে হবে। এরপর কবির নাম ও গুণাবলী কীর্তন করতে হবে। দর্শকদের অবগতির জন্যে কোন্ জাতীয় নাটক অভিনীত হবে প্রস্তাবনায় তার উল্লেখ করতে হবে।

মহাচারী—যে অভিনয়ে মহাদেবের দ্বারা ত্রিপুর মর্দনাদি বিষয়ক রৌদ্ররস প্রধান গীত উদ্ধত মণ্ডলাঙ্গহারের মাধ্যমে রূপায়িত হয়, তাকে মহাচারী বলে।

ত্রিগত—বিদূষক, সূত্রধার ও পারিপার্শ্বিক কর্তৃক ভবিষৎ নাটকের সূচনা দেওয়াকে 'ত্রিগত' বলে।

প্ররোচনা—কাব্যের প্রথম উত্থাপনের হেতু সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করে সামাজিকদের আমন্ত্রণ ও নিমন্ত্রণ সিদ্ধিকে 'প্ররোচনা' বলা হয়। আশ্রাবণার দ্বারা দৈত্যদের তুষ্ট করা হয়, বক্ত্রপাণির দ্বারা দানবদের, পরিঘট্টনার দ্বারা রাক্ষসদের, সঙ্ঘোটনার দ্বারা গুহ্যকদের, মার্গাসারিত দ্বারা যক্ষদের, গীতক দ্বারা দেবতাদের, বর্ধমান দ্বারা সানুচর রুদ্রকে, উত্থাপন দ্বারা ব্রহ্মাকে, পরিবর্তনের দ্বারা লোকপালদের, নান্দী প্রয়োগের দ্বারা চন্দ্রকে, অবকৃষ্টের

দ্বারানাগদের, শুভাবকুন্টের দ্বারা পিতাদের, রঙ্গদ্বার দ্বারা বিষ্ণুকে, জর্জর দ্বারা বিঘ্নবিনায়কদের, চারীর দ্বারা উমা এবং মহাচারীর দ্বারা ভূতদের সন্তুষ্ট করা হয়, এবং একেই পূর্বরঙ্গ বলে। সর্বদেবতার তুষ্টির জন্যে, যশ প্রাপ্তির জন্যে, আয়ুঃপ্রাপ্তির জন্যে, বিঘ্নাশের জন্যে পূর্বরঙ্গের প্রয়োজন। এইভাবে নাটকের সূচনায় কুশীলবদের যা করণীয় তা পূর্বরঙ্গ। পূর্বরঙ্গ চারটি ভাগে বিভক্ত—ত্র্যস্র, চতুরস্র, শুদ্ধ ও চিত্র। নৃত্যাংশ বর্জিত গীতক অংশ হচ্ছে 'শুদ্ধ' পূর্বরঙ্গ। নৃত্ত সংমিশ্রিত হলে তা 'চিত্র' পূর্বরঙ্গ। বাদ্য, গতিপ্রচার ও ধ্রুবাতালে নৃত্ত হলে 'ত্র্যস্র' পূর্বরঙ্গ হয়ে থাকে। বিস্তীর্ণ ও সংক্ষিপ্তভেদে দু রকমভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে। ত্র্যস্রে হাত ও পায়ের দ্বাদশটি আঘাত হবে এবং চতুরস্রে ষোড়শটি আঘাত হবে। ভারতীকে আশ্রয় করে ত্র্যস্র, চতুরস্র ও শুদ্ধ পূর্বরঙ্গ করতে হবে। চিত্র পূর্বরঙ্গে গন্ধর্বরা উদাত্তস্বরে দুন্দুভি বাজিয়ে গান করবেন। সিদ্ধরা চারদিকে মালা ছড়াবেন এবং দেবীরা অঙ্গহার সহকারে নৃত্য করবেন। নান্দী পাঠের মধ্যে পৃথকভাবে এটি করতে হবে। এতে পিণ্ডী সমন্বিত তাণ্ডববিধিতে রেচক, অঙ্গহার, ন্যাস ও উপন্যাস্ সহ নৃত্ত করতে হবে। এরপর নাটকাভিনয় আরম্ভ হবে।

এইভাবে পূর্বরঙ্গের শেষে সূত্রধার অনুগামীদের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চ থেকে নিক্রান্ত হবেন। তারপর যবনিকার অন্তরালে 'আশ্রাবণা' করতে হবে।

'আশ্রাবণা' শেষে সূত্রধার আবার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে বৈষ্ণবস্থানে দণ্ডায়মান হয়ে সৌষ্ঠব প্রদর্শন করবেন। তারপর উভয়ই নিষ্ক্রান্ত হবেন। এর পর 'চারী' সুরু হবে। মুনি ভরত বলেছেন, বিধিবদ্ধভাবে পূর্বরঙ্গ করলে কোন অশুভ হয় না এবং পরিণামে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। কিন্তু যিনি এই বিধি লঙ্ঘন করে ইচ্ছেমত আচরণ করেন, তাহ'লে তাঁর ঘোর বিপদ হয় এবং পরকালে তির্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হন।

নৃত্যে রূপসজ্জা

"তারাহারাবলী স্থূলমৌক্তিকা স্তনমণ্ডনা
প্রকোষ্ঠৌ ন্যস্তপদ্মরত্না গৌব বিলম্বাম্বিতৌ ।"

রূপসজ্জা

নৃত্যে রূপসজ্জা একটি বিশেষ অঙ্গ। বসন, ভূষণ, সাজসজ্জা, মঞ্চসজ্জা ইত্যাদি নানারকম বস্তুসম্ভার আহরণ করবার যোগ্য বলেই একে আহার্য বলা হয়েছে। কৃত্রিম শোভাবর্ধনে রূপসজ্জা অপরিহার্য অঙ্গ ; এই জন্যে রূপসজ্জা অভিনয়ের অন্যতম অঙ্গরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। চারটি অভিনয়ের ভেতর আহার্য অভিনয়ের গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। রূপসজ্জা ও মঞ্চসজ্জা প্রভৃতির দ্বারা নৃত্য অথবা অভিনয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যুগ, কাল, অথবা দেশাচার প্রভৃতি প্রকাশ পায়।

মানুষ যখন প্রথম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেল, তখন থেকে আরম্ভ হ'ল তার দেহকে সজ্জিত করবার চেষ্টা। সেই অন্ধকারময় যুগে বৃক্ষের বাকল অথবা পাতা দিয়ে অঙ্গ আবৃত করে মানুষ লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করত। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে চলল নিজের দেহকে সজ্জিত করে অপরের চোখে সুন্দর করবার প্রয়াস। আজ পর্যন্ত এই প্রয়াসের বিরাম নেই। নিজেকে পুরুষের চোখে অপরূপা করে তোলাই নারীর ধর্ম। নারী বিশ্ব প্রকৃতির প্রতীক। বিশ্বপ্রকৃতির মত নব নব রূপসজ্জায় নিজেকে সজ্জিত করা নারীর প্রকৃতিগত স্বভাব। সুতরাং নৃত্যেও রূপসজ্জায় সার্থকতা হচ্ছে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে দর্শকের মন হরণ করা। সেইজন্যে প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রকাররা নৃত্যে রূপসজ্জাকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং নাটকে এর ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমানে বিভিন্ন নৃত্য-শৈলীতে যে সকল রূপসজ্জার প্রচলন আছে, তা ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যকে যথাযথ অনুসরণ করে না। দেশভেদে, কালভেদে ও আচারভেদে রূপসজ্জা ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে। কিন্তু প্রাচীন কালেই বা আমাদের রূপসজ্জা কেমন ছিল এবং বিভিন্ন দেশের নৃত্য শৈলীর ওপর এর প্রভাব কি রকম পড়েছে তা প্রণিধানযোগ্য।

কিন্তু তার পূর্বে সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে রূপসজ্জা কেমন করে পরিবর্তিত হতে লাগল তা আলোচনা করে দেখা যাক। সভ্যতা বিকাশের প্রথম প্রভাতে তুলা থেকে জাত সুতোর বস্ত্রের প্রচলন হ'ল। মহেঞ্জদরো ও হরপ্পায় পাওয়া

সূচ ও তকলী থেকে একথা প্রমাণিত হয়। শুধু বস্ত্র নয়, আভরণও কম জনপ্রিয় ছিল না। নৃত্যেও এই সকল আভরণ ব্যবহৃত হত। মহেঞ্জদরোয় পাওয়া নর্তকী মূর্তিটির বাম হাতে কনুই থেকে মণিবন্ধ পর্যন্ত অজস্র বালা রয়েছে। কোন কর্ণভূষণ নেই এবং দেহেও কোন বস্ত্র নেই। এর কারণ অনুমান করা শক্ত নয়। কোন দেশের ভৌগলিক অবস্থান, জলবায়ু, খনিজ দ্রব্য প্রভৃতির সহজলভ্যতার ওপর নির্ভর করে তদনুযায়ী পোষাক পরিচ্ছদ তৈরী হয়। এখনও পর্যন্ত উপজাতি ও আদিমজাতির ভেতর বল্কল, চামড়ার পোষাক, খনিজ দ্রব্য থেকে তৈরী গহনা, পাথরের গহনা, শঙ্খ, শামুক প্রভৃতি সামুদ্রিক জীবের গহনা, পাখীর পালক প্রভৃতির গহনা পরতে দেখা যায়। ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। তার ওপর সিন্ধুদেশের কাছে উষ্ণতা অতি প্রখর ছিল বলে অনুমান করা হয়। সুতরাং মনে হয়, সভ্যতার শৈশব অবস্থায় কাপড় পরবার প্রয়োজন সেরকম অনুভূতি হয় নি। ভূমিষ্ঠমাত্র সভ্যতার যুগে এটা বোধ হয় নিন্দার ব্যাপার ছিল না। জমিলা বৃজের অভিমত হচ্ছে যে, বহু প্রাচীন কালে মিশরের মত ভারতবর্ষেও কোন কোন নৃত্য অনাবৃত দেহে করা হত। সেই কারণে নর্তকীটির দেহ নগ্ন। তবে উত্তরীয়, শিরোধান (পাগড়ী) প্রভৃতির যে প্রচলন ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সিন্ধু সভ্যতায় পাওয়া পুরোহিতের মূর্তিতে পাগড়ী ও উত্তরীয়ের ব্যবহার দেখা গিয়েছে। এর অতিরিক্ত কিছু জানা যায় নি।

প্রাচীন যুগের সাজসজ্জা—এর পরবর্তী বৈদিকযুগে ক্রিয়াকর্মে পশুচর্ম বস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হত। শিবের ধ্যানে "ব্যাঘ্রকৃত্তিংবসানম্" বলা হয়েছে। তখনকার যুগে পরিচ্ছদ হিসেবে দুটি বস্ত্র ব্যবহার করা হত—'বাস' (নিম্নাঙ্গের বস্ত্র) ও অধিবাস (উর্ধ্বাঙ্গের বস্ত্র)। এর সঙ্গে থাকত নীবিবন্ধ। পরবর্তী কালে মনুসংহিতায় মনু বিভিন্ন শ্রেণীর জন্যে বিভিন্ন বস্ত্র পরিধানের নির্দেশ দিয়েছেন। মনু ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণদের জন্যে শনতন্তু বস্ত্র ও কৃষ্ণসার মৃগচর্মের উত্তরীয়, ব্রহ্মচারী ক্ষত্রিয়দের জন্যে ক্ষৌমবসন ও রুরু মৃগচর্মের উত্তরীয়, ব্রহ্মচারী বৈশ্যদের জন্যে মেসরোম নির্মিত বস্ত্র ও ছাগলের চামড়ার উত্তরীয় পরিধানের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু নারীদের প্রতি বা ব্রহ্মচারিনীদের প্রতি কোন নির্দেশ নেই। তবে জানতে পারা যায় যে, স্ত্রীলোকেরাও কচ্ছ দিয়ে শাড়ী পড়তেন এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই উত্তরীয় ও পাগড়ী ব্যবহার করতেন। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই উপবীত ধারণ করতেন। বেশভূষাতে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। ব্রহ্মচারীরা

চর্মবস্ত্র ধারণ করলেও অভিজাত ও সাধারণ শ্রেণীর ভেতর সূক্ষ্ম বস্ত্রের প্রচলন ছিল। তৎকালীন মৃন্ময় মূর্তিগুলিতে এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত দীদার গঞ্জের একটি চামর ধারিণীর মূর্তিতে অতি সূক্ষ্মবস্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। এই বস্ত্র এত সূক্ষ্ম যে, এতে দৈহিক সৌন্দর্য অতি সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। সম্মুখদিক থেকে শাড়ী পরার পদ্ধতিটি সঠিক বোঝা যায় না। তবে মনে হয়, কচ্ছ'দিয়ে কাপড় পড়ে কাপড়টি হাতের ওপর উঠেছে। বক্ষোবাস হিসেবে দুকূল বা পাগড়ীর ব্যবহার নেই। প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত সাঁচীস্তূপে খোদিত ভগবান বুদ্ধের ধর্ম প্রচারের একটি দৃশ্যে দেখা যায় যে, পুরুষরা কচ্ছ দিয়ে কাপড় পরেছেন। এতে বক্ষোবাস, উত্তরীয় ও পাগড়ী জাতীয় শিরোধান রয়েছে। খৃষ্টপূর্ব ৩০০ শতাব্দীতে কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে পরিধেয় বস্ত্র সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে মথুরা, কলিঙ্গ, কাশী, বঙ্গ, বৎস, মহিষা প্রভৃতি প্রদেশে সবথেকে স্বচ্ছ সুতোর কাপড় তৈরী হত। তিনি তিন রকম দুকূলের ব্যবহারের কথা বলেছেন। বঙ্গ থেকে শ্বেত, পুণ্ড্র থেকে কাল এবং 'সুবর্ণকুণ্ড থেকে লাল রঙের দুকূলের আমদানি হত। স্থাপত্য শিল্পে যে সকল নর্তক-নর্তকীর মূর্তি দেখা যায়, তাতে দুকূলের ব্যবহার আছে। অবশ্য Dr. Charles Fabri বলেছেন, ভারতীয় নারীরা ঊর্ধ্বাঙ্গ উন্মুক্ত রাখতেন। যে কয়েকটি চিত্রে একটি দুটি নারীকে বক্ষোবাস ব্যবহার করতে দেখা যায়, তাঁর মতে তারা যবনী। এ কথা স্বীকার্য যে, পূর্বে রাণী বা অভিজাত সম্প্রদায়ের নারীদের যে সকল চিত্র দেখা যায় বা পাথরের প্রতিমূর্তি আছে, তাতে বক্ষোবাস নেই। কেবল পরিধানের বস্ত্র আছে এবং সরু কাপড়ের টুকরো কোমর থেকে লম্বমান অবস্থায় রয়েছে। মগধ, পুণ্ড্র এবং সুবর্ণকুড্য থেকে পাত্রোর্ণা নামে পাতা থেকে তৈরী বস্ত্রের আমদানী হত। বৌদ্ধ পুস্তকে বহু মূল্যবান সিল্ক বস্ত্রের উল্লেখ বহুবার করা হয়েছে। কৌটিল্য চীনা ভূমি থেকে কৌষেয়বস্ত্র আমদানীর কথাও লিখেছেন। তিনি মৌক্তিকা (মুক্তা), মনি, বজ্র (হীরে), প্রবাল প্রভৃতির উল্লেখও করেছেন। ইতিহাসেও আমরা পাই যে, খৃঃ পূঃ ২য় শতকে দক্ষিণ পশ্চিম চীনের সঙ্গে পূর্বভারতের বানিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল এবং চীন থেকে রেশমী প্রভৃতি বস্ত্র ভারতে আমদানী হত। বৈদিক যুগ পর্যন্ত রূপসজ্জার কোন সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের নেই। সে যুগে আলোচ্য বিষয়ের কোনও প্রতীকও পাওয়া যায় না। যে সময় থেকে মূর্তিশিল্প জন্মলাভ

করল, তখন থেকেই বেশভূষার একটি সুস্পষ্ট রূপ আমাদের চোখে প্রতিভাত হল। সেকালের অভিজাত ও অন্যান্য শ্রেণীর ভেতর কি রকম বেশভূষা পরিধানের প্রচলন ছিল, তারও একটি সুস্পষ্ট ধারণা হ'ল। সাজসজ্জার উপকরণ সম্বন্ধে আমরা প্রাচীন গ্রন্থ থেকে জানতে পারি এবং সেগুলি কি ভাবে প্রযোজ্য হত তার প্রমাণও প্রস্তর মূর্তিগুলি দেয়। তবে এইরকম অনেক অলঙ্কার ও ভূষণের নাম আছে, যা আধুনিক যুগে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। মেগাস্থিনীসের গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, সেকালে নানা রকম কারুকার্যখচিত স্বর্ণ বিজড়িত বস্ত্রাদি রমনীরা ব্যবহার করতেন। পোষাক পরিচ্ছদে সোনা ছাড়া আরও বহুমূল্য পাথর প্রভৃতি খচিত থাকত। এই ধরণের অলঙ্কার ও বস্ত্র প্রভৃতির কথা সঙ্গীত শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রে রূপসজ্জার বর্ণনা—

সঙ্গীতরত্নাকরে পাত্রের রূপসজ্জা সম্বন্ধে এই ধরণের বিবরণ আছে—'পুষ্পশোভিত, সুনীল, স্নিগ্ধ, বিস্তীর্ণ কেশপাশ পৃষ্ঠদেশে আলুলায়িত ভাবে সন্নিবেশিত থাকবে। অলকা তিলকা অঙ্কিতভালে অলকগুচ্ছ শোভা পাবে। নয়নে অঞ্জনরেখা এবং কর্ণমূলে বলয়ের আকারে তালপত্রে নির্মিত উজ্জ্বল কর্ণভূষণ থাকবে। দন্তপংক্তির প্রভাজালে রঙ্গভূমি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। কপোলে কস্তুরী চিত্রিত পত্রভঙ্গ রেখা, কণ্ঠে তারাহারাবলী এবং স্থূল মুক্তাহারে স্তনযুগল বেষ্টিত থাকবে। প্রকোষ্ঠ যুগলে রত্ন খচিত স্বর্ণবলয়, অঙ্গুলিসমূহে মণি, নীলা, হীরা প্রভৃতি খচিত অঙ্গুরীয় থাকবে। অঙ্গে ক্ষীরের মত শুভ্র দুকূল ও কূর্পাস বস্ত্র থাকবে। দেশের প্রথা অনুসারে কঞ্চুক[১] ও ব্যবহার করা যেতে পারে। শ্যাম ও গৌরকান্তি পাত্রের পক্ষে এই জাতীয় মণ্ডন যথোচিত বিধেয়। 'সঙ্গীত মকরন্দে' পাত্রলক্ষণে আছে যে, পাত্র বিবিধ বস্ত্রাভরণে অলংকৃত হবে, কঞ্চুকাবৃত তনু, বিচিত্র রত্নভূষণ ও মণিমৌক্তিক হার ধারণ করবে এবং কুসুম শোভিত মৃদুল বেণী রচনা করবে। এই বেশভূষা দর্শকদের চিত্ত বিভ্রম ঘটাবে।

প্রাচীন নাট্য শাস্ত্রকারদের ভেতর নন্দীকেশ্বর আহার্যাভিনয় বলতে শরীরের অলঙ্করণ বুঝিয়েছেন। যথা হার, কেয়ুর, বেশ ইত্যাদি, কিন্তু মুনি ভরত আহার্যাভিনয় বলতে নেপথ্যে যা প্রয়োজন, সকল কিছুই বুঝিয়েছেন। এই নেপথ্যবিধানের ওপরই নাট্যের শুভাশুভ অনেকটা নির্ভর করে। নেপথ্যবিধানের চারটি

(১) কঞ্চুকীরা লম্বা হাতাওলা জামা পরত। এই জামাকে 'কঞ্চুক' বলা হত।

ভাগ—পুস্ত, অলঙ্কার, অঙ্গরচনা ও সঞ্জীব। শৈল, যান, বিমান, চর্ম, বর্ম ও ধ্বজ প্রভৃতি যা কৃত্রিম উপায়ে, নির্মান করা হয়, তাকে 'পুস্ত' বলে। 'পুস্ত' তিন রকম —'সন্ধিম,' 'ব্যাজিম' ও 'চেষ্টিম'। রূপ ও প্রমাণভেদে পুস্তের রকম ভেদ আছে। কিলিঞ্চি, বস্ত্র, চর্ম, প্রভৃতি দিয়ে যে সকল নাট্যোপযোগী কৃত্রিম পদার্থ তৈরী হয়, তাকে 'সন্ধিম' বলে। যন্ত্রের দ্বারা যা সম্পাদিত হয় তা 'চেষ্টিম'। অলঙ্কার বলতে অঙ্গ ও উপাঙ্গে মাল্য, আভরণ ও বস্ত্র প্রভৃতি বোঝায়। আচার্য ভরত এই সকল অলঙ্কারের সূক্ষ্ম বিবরণ দিয়েছেন। মালা পাঁচ রকমের—চেষ্টিত, বিতত, সঙ্ঘাত্য, গ্রন্থিম ও প্রলম্বিত। 'চেষ্টিত, অর্থে চঞ্চল (সূক্ষ্ম ও হালকা), 'বিতত' অর্থে বিস্তৃত বা চওড়া, 'সঙ্ঘাত্য' অর্থে নানারকম ফুল দিয়ে গ্রথিত, গ্রন্থিম অর্থে গ্রন্থিযুক্ত, প্রলম্বিত অর্থে বহু দীর্ঘ অথবা লম্বমান। দেহের চার রকম আভরণের কথা বলা হয়েছে—(১) আবেধ্য (২) বন্ধনীয় (৩) প্রক্ষেপ্য (৪) আরোপক। আবেধ্য হচ্ছে কুণ্ডল প্রভৃতি কর্ণভূষণ, বন্ধনীয় হচ্ছে শ্রোণীসূত্র অঙ্গদ, মুক্তাজাল প্রভৃতি। প্রক্ষেপ্য বলতে নূপুর, বস্ত্রাভরণ, ইত্যাদি বোঝায়। 'আরোপক' হচ্ছে স্বর্ণসূত্র, হার ইত্যাদি। দেশভেদে, জাতিভেদে ও স্ত্রী পুরুষ ভেদে আচার্য ভরত বিভিন্ন সাজসজ্জার কথাও বলেছেন। পুরুষের ভূষণ হচ্ছে—চূড়ামণি ও মুকুট, কর্ণভূষণ—(কুণ্ডল, মোচক ও কীল), কণ্ঠভূষণ—(মুক্তাবলী, হর্ষক ও সৎসূত্র), হস্তভূষণ—(হস্তবী ও বলয়) মণিবন্ধের ভূষণ—(রুচিক ও উচ্চিতিক), বক্ষোভূষণ—(ত্রিসির হার, বিলম্বিত হার, পুষ্পমাল্য, রত্নমালা প্রভৃতি), কটিভূষণ—(তরল ও সূত্রক)।

দ্বিতীয় শতাব্দীর কেশ বিন্যাস
(বৃক্ষদেবীর মূর্তি)

দণ্ডায়মান নাগিনীর শিরোভূষণ
(বিহার)

আচার্য ভরত কথিত আভীর
যুবতীদের শিরোভূষণ
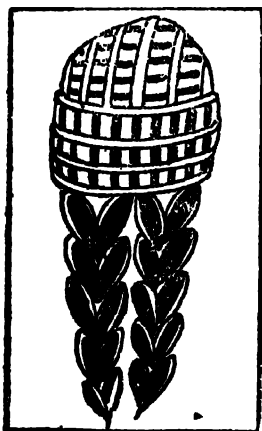
সাঁচীস্তূপের উত্তর প্রবেশ পথের পশ্চিমপ্রান্তে
খোদিত পুরুষের শিরোধান

বাদামীর ৩নং গুহার বিষ্ণু
ত্রিবিক্রমের মাথার মুকুট

অজন্তা (৭ম—৮ম খৃঃ) মাথায় পাগড়ী
জাতীয় শিরোধান

ভরতনাট্যম নৃত্যের আধুনিক
পরিচ্ছদ

২নং সাঁচীস্তুপের প্রবেশ পথে শিকারীর মূর্তি
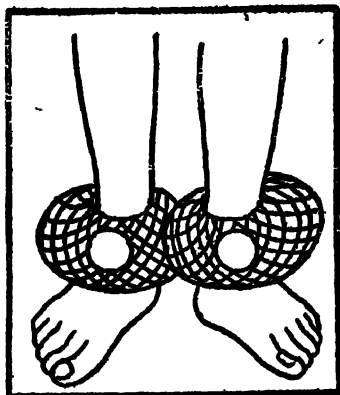
প্রাচীন ভারতে পায়ের অলঙ্কার

কথক নৃত্যের পুরোন বেশভূষা

দীদার গঞ্জের
চামরধারিণীর মূর্তি

দেবতা, নৃপতি ও নারীদের ভূষণের বিবরণও মুনি ভরত দিয়েছেন। শিরো-ভূষণে শিখাপাশ, শিখাজাল, পিণ্ডপাত্র, চূড়ামণি, মকরিকা, মুক্তাজাল. গবাক্ষক, বিচিত্র, শীর্ষজালক, কুণ্ডল, শিখিপাত্র, রোচক ও বেণীকঞ্জের নাম আছে। ললাটের তিলকে নানা রকম শিল্পকার্য থাকবে। ভ্রূকক্ষার ওপর কুসুমানুকারী গুচ্ছ দিতে হবে। কর্ণভূষণ সম্বন্ধে কর্ণিকা, কর্ণবলয়, পত্রকর্ণিকা, আবেষ্টিত, কর্ণ মুদ্রা, কর্ণোৎকীলক প্রভৃতির উল্লেখ আছে। গণ্ডে তিলকা ও পত্ররেখা শোভা পাবে। বক্ষোভূষণ রূপে ত্রিবেণী ও বিচিত্রশিল্পযুক্ত হার থাকবে। নেত্রের অঞ্জন ও অধর রঞ্জন ছিল অবশ্য করণীয়। উজ্জ্বল শুক্লবর্ণ রঞ্জিত দন্তরাজি শোভা পাবে। কণ্ঠভূষণ হিসেবে মুক্তাবলী, ব্যালপঙক্তি, মঞ্জরী, রত্নমালিকা, রত্নাবলী এবং স্তনভূষণ হিসাবে মণিজালবন্ধন ব্যবহৃত হবে। বাহুমূলে অঙ্গদ ও বলয় শোভা পাবে। হস্তভূষণ হিসেবে বর্জুর ও ঘেচ্ছিতীক থাকবে। আচার্য ভরত অঙ্গুলীভূষণের অন্তর্গত কণ্টক, কলশাখা, হস্তপত্র, সুপূরক ও মুদ্রাঙ্গুলীয়কের কথাও বলেছেন। শ্রোণীভূষণ বলতে মুক্তাজালযুক্ত কাঞ্চী (একলরী) মেখলা (আটলরী), রশনা (ষোললরী), কলাপ (পঁচিশ লরী) ব্যবহৃত হবে। গুল্‌ফভূষণে নূপুর, কিঙ্কিণী, রত্নজালক, ও সজ্ঘোষকটক, জঙ্ঘাভূষণে পাদপত্র ও পদাঙ্গুলি ভূষণে অঙ্গুলীয়ক এবং পাদাঙ্গুষ্ঠভূষণে তিলক ব্যবহার করতে হবে। পাদতলে অঙ্গরাগ রচনা করতে হবে। পুরুষের বেশ ও অঙ্গরচনা সম্বন্ধেও মুনি ভরত বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। বর্ণ ইত্যাদি সম্বন্ধেও তিনি সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন। শ্বেত ও নীল বর্ণের মিশ্রণে পাণ্ডুবর্ণ, শ্বেত ও রক্তবর্ণের মিশ্রণে পদ্মবর্ণ, পীত ও নীল সংযোগে হরিৎ, নীল ও রক্ত সমাযোগে কষায় বর্ণের উৎপত্তি হয়। এইগুলিকে 'সংযোগজ' বর্ণ বলা হয়। তিন চারটি বর্ণের একত্র মিশ্রণ হলে উপবর্ণ হয়।

জীবিকা অনুসারে বেশের নানা রকম ভেদ আছে। তবে সাধারণতঃ বেশ তিন রকম—শুদ্ধ, বিচিত্র ও মলিন। দেবপূজায়, মাঙ্গলিক নিয়মে, উৎসবে, বিবাহ কার্যে ও স্ত্রী পুরুষের যাবতীয় ধর্মানুষ্ঠানে 'শুদ্ধ' বেশ ধারণ করতে হবে। দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব, রাক্ষস ও কর্কশ স্বভাবের নৃপদের বেশ হবে 'বিচিত্র'। উন্মত্ত, প্রমত্ত, পথিক, প্রবাসী, বাসনাভিহত ব্যক্তিদের বেশ হবে 'মলিন'। বিদ্যাধরীর বেশ হবে শুভ্রবর্ণ ও শুদ্ধ। অলঙ্কারে মুক্তার বাহুল্য থাকবে এবং শিরোভূষণ হিসেবে শিখাপুট ও শিখণ্ড থাকবে। যক্ষ বধূ ও অপ্সরাদের ভূষণ

রত্নখচিত হওয়া প্রয়োজন। যক্ষীদের শিরোভূষণে কেবলমাত্র শিখা থাকবে। নাগকন্যাদের ভূষণ দেবকন্যাদের মতনই হবে। নাগকন্যাদের অলঙ্কারে মণিমুক্তাখচিত লতাপাতার বাহুল্য থাকবে। মুনিকন্যারা হবেন একবেণীধারিণী। মুনিকন্যারা অতিরিক্ত ভূষণে সজ্জিত হবেন না। সিদ্ধ যুবতীদের পরিচ্ছদ পীতবর্ণ ও অলঙ্কার মুক্তো এবং মরকত খচিত হবে। গন্ধর্বীদের ভূষণে পদ্মরাগ মণির বাহুল্য থাকবে। তাঁরা বীণাহস্তা ও কৌসুম্ভবসনা হবেন। রাক্ষসীদের ভূষণে ইন্দ্রনীল থাকবে এবং বস্ত্রগুলিও কৃষ্ণবর্ণ হবে। শ্বেতবর্ণের দংষ্ট্রাও থাকবে। দেববালাদের অঙ্গে বৈদূর্য ও মুক্তো খচিত আভরণের বাহুল্য থাকবে। ভরতমুনি বিভিন্ন দেশের বেশভূষা সম্বন্ধেও বিশেষ বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন। অবন্তী-যুবতীদের অলকযুক্ত কুন্তল থাকবে। গৌড়ীয়াদের অলকের বাহুল্য থাকবে। শিখাপাশ ও বেণীও থাকবে। আভীর যুবতীদের দুটি বেণী থাকবে ও মস্তক আবৃত থাকবে। বস্ত্র প্রায় নীলবর্ণ হবে। পূর্ব ও উত্তর দেশীয় রমণীদের শিখণ্ডিক (পুরুষের পক্ষে জুলপী ও নারীর পক্ষে কেশগুচ্ছদ্বয়) থাকবে। রাজারা শ্যাম বা গৌরবর্ণ হতে পারেন। প্রয়োজনানুসারে পঞ্চবর্ণেও রঞ্জিত করা যায়। রুদ্র, দ্রুহিণ ও স্কন্দ তপ্তকাঞ্চনপ্রভ হবেন। বৃহস্পতি, শুক্র, বরুণ, তারকা, সমুদ্র, হিমাচল, গঙ্গা প্রভৃতিকে শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত করতে হবে। নর নারায়ণ শ্যামবর্ণ; বাসুকি, দৈত্যরা, দানবকুল, রাক্ষসসমূহ, গুহ্যকরা, নগ, আকাশ, পিশাচ ও যমকে শ্যামবর্ণ করতে হবে। সাধারণতঃ সপ্তদ্বীপের অধিবাসী নরদের তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ করা উচিত। এরপর শ্মশ্রুবিধির চার রকম নিয়ম আছে —শুক্ল, শ্যাম, বিচিত্র ও লোমশ। আকুমার ব্রহ্মচারী বা তপস্বীর শুদ্ধ ও শ্বেত শ্মশ্রু। মধ্যাবস্থায় উপনীত, দীক্ষিত, দিব্যপুরুষ, বিদ্যাধর, নৃপতি বা রাজকুমারের অনুজীবি, শৃঙ্গারী ও যৌবনমত্তদের শ্মশ্রু হবে বিচিত্র (শ্বেত ও শ্যাম মিশ্রিত) যাদের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়নি, যারা দুঃখিত, হতভাগ্য ও ব্যসনগ্রস্ত তাদের শ্মশ্রু হবে শ্যাম। ঋষি, তাপস, সিদ্ধ ও বিদ্যাধরদের লোমশ শ্মশ্রু ধারণ করা উচিত।

শিরোভূষণ রচনার নিয়ম—দেবতা ও মানবদের দেশ, জাতি, বয়স ও পাণ্ডিত্য অনুসারে মুকুট, কিরীট প্রভৃতি ধারণ করা উচিত। রাজাকে মস্তক ব্যাপী রাজমুকুট বা কিরীট ধারণ করতে হবে। মধ্যম প্রকৃতির পাত্রের মস্তকের ওপর অপেক্ষাকৃত ছোট মুকুট শোভা পাবে। আর কনিষ্ঠ প্রকৃতির পাত্র শীর্ষ

দেশে চূড়ার আকার বিশিষ্ট ছোট মুকুট ধারণ করবে। অতি দীর্ঘ কেশও মুকুট প্রভৃতি দিয়ে আচ্ছাদিত রাখতে হবে।

মুনি ভরত পূর্বকথিত পুস্তের যে তিন রকম বর্ণনা দিয়েছেন (সন্ধিম, ব্যাজিম ও চেষ্টিম) তার ভেতর 'ব্যাজিম' ও 'চেষ্টিম' এর কাজ স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় না। যন্ত্র প্রভৃতির দ্বারা সম্পাদিত কাজকে তিনি 'ব্যাজিম' বলেছেন। যন্ত্র প্রভৃতি বলতে কি ধরণের যন্ত্র, তার সম্যক ধারণা করা যায় না। চেষ্টা অর্থাৎ শরীর ব্যাপার দ্বারা যা সম্পাদিত হয় তাকে 'চেষ্টিম' বলেছেন। শরীর ব্যাপার বলতে তিনি দৈহিক পরিশ্রমের দ্বারা রঙ্গমঞ্চে যে কাজ সম্পাদিত হয় তাকে বলেছেন কি না তাও চিন্তা করবার বিষয়।

'সঞ্জীব' বলতে রঙ্গমঞ্চে পদহীন, দ্বিপদ অথবা চতুষ্পদ জন্তুর প্রবেশ বোঝায়। সাধারণতঃ এই সকল জন্তুর সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োজন হয়। এই সকল অস্ত্রের নাম ও বিবরণ নাট্যশাস্ত্রে দেওয়া আছে। তার মধ্যে কতকগুলির নাম উল্লেখ করছি। যথা ভিণ্ডি (দ্বাদশতাল), কুন্ত (দশতাল) ; শতঘ্নী, শূল, তোমর ও শক্তি অষ্টতাল ; ধনুও অষ্টতাল এবং দুই হাত বিস্তৃত ; শর, গদা ও বজ্র হবে চতুস্তাল।

ঘুঙুর :—নন্দিকেশ্বর কৃত অভিনয় দর্পণে ঘুঙুরের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কিঙ্কিনীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হচ্ছেন নক্ষত্রসমূহ। ঘুঙুরগুলি হবে কাংস্যনির্মিত, সুস্বর, সুরূপ ও সূক্ষ্মাকৃতি। নর্তকী দুটি পায়ে এক এক আঙুল অন্তরে নীল সূত্রে দৃঢ় গ্রন্থিতে শতদ্বয় অথবা একশত কিঙ্কিনী বাঁধবেন। এটা লক্ষ্য করবার বিষয় যে, আমরা প্রাচীন হিন্দু রাজত্বের সময় যে সকল চিত্র অথবা প্রস্তর মূর্তিগুলি দেখি, তাতে প্রাদেশিক আচার ভেদে পোষাক পরিচ্ছদের বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। মহাবলীপুরম, অমরাবতী ও গান্ধার শিল্পের মূর্তিগুলি একই রকম বস্ত্র পড়েছে। বিশেষ করে নৃত্যের পোষাকগুলিও একই রকম। কিন্তু আধুনিক বিভিন্ন নৃত্যশৈলীর ভেতর পোষাক পরিচ্ছদের এই যে পার্থক্য এর মূলে আছে নানারকম সংস্কৃতির মিলন।

আধুনিক যুগে নৃত্যের রূপসজ্জার পরিবর্তন—এখন ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত নৃত্যশৈলীর বসন ভূষণ বিচার করে দেখা যাক যে, কিভাবে পরবর্তী কালে রূপসজ্জার ও রুচির পরিবর্তন হয়েছে এবং কি ভাবে বিভিন্ন সংস্কৃতি রূপসজ্জার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

এ কথা আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, চলমান বিশ্বে গতির সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতে হবে। এই জগৎ গতিশীল। গতিশীলতাই এর ধর্ম, গতিই এর প্রাণ। এই গতির সঙ্গে আমাদের সামঞ্জস্য রাখতেই হবে। সুতরাং যে পরিচ্ছদ সাধারণ উপায়ে পরতে পারা যায় এবং যা দেহ রেখার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তাই নৃত্যের উপযোগী। দেহের গতি প্রকৃতির সঙ্গে পোষাকের সামঞ্জস্য বিধান অপরিহার্য। কারণ মনের ওপর পরিচ্ছদের প্রভাব বিশেষ ক্রিয়াশীল। Sir Barington বলেছেন—"Dress has a moral effect upon the conduct of mankind." নৃত্যের পোষাকগুলি সুবিন্যস্ত ও সুন্দর না হলে দর্শকের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। Mr. Bovee বলেছেন—"The perfection of dress is the union of three requisites ·····in its being, comfortable cheap and tasteful." সুতরাং আধুনিক যুগে এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নৃত্যের বেশভূষা করা উচিত। ভরত মুনি প্রকারান্তরে এই কথাই বলেছেন। তাঁর মতে নর্তকীর বেশী ভূষণে সজ্জিত না হওয়াই উচিত। কারণ তাতে বেশী ঘামের জন্যে মুখকান্তি নষ্ট হতে পারে এবং দেহের স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করতে পারে। এই সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করে নৃত্যের পোষাক পরিচ্ছদ তৈরী করা উচিত।

আধুনিক যুগ—

'ভরতনাট্যম নৃত্যের পোষাক পরিচ্ছদ—আধুনিক ভরতনাট্যম নৃত্যে পোষাক পরিচ্ছদের সংস্কার করা হয়েছে। ভরতনাট্যম নৃত্য বিদ্যুতের মত গতি সম্পন্ন বলে এতে পায়জামার মত পোষাক ব্যবহার করা হয়। কিন্তু প্রাচীন কালে পায়জামা ছিল না। তার পরিবর্তে কচ্ছ (কাছা) দিয়ে শাড়ী পরতে হত। এই শাড়ীগুলি ডোরাকাটা ছিল এবং এগুলিকে 'তুইয়াশেলে' বলা হত। আজকাল একটি পৃথক কাপড়ের টুকরো পশ্চাদভাগে বিস্তৃত করে এবং নিতম্ব ঢেকে কোমরে বাঁধতে হয়। পূর্বে তুইয়াশেলের আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া হত। খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে 'বারহুত' স্তূপে কুবের, যক্ষ ও যক্ষীর দেহে সম্মুখভাগে এই রকম নীবিবন্ধ দেখা যায়। শিরো-ভূষণে পাগড়ী রয়েছে। ভরতনাট্যমে নীবিবন্ধ ব্যবহার করা হয় এবং একে 'মুন্দি' বলা হয়। উত্তরীয় ও নীবিবন্ধ প্রায় সবরকম নৃত্য শৈলীতেই ব্যবহৃত হয়। বক্ষের উত্তরীয়কে বলা হয় 'মেলাকু'। চুমকীর কাজ করা ব্লাউজকে বলা হয়

'রাখিকে' এবং চুমকীর কাজকে বলা হয় 'কচিপ'। অলঙ্কারের ভেতর সীমন্তের দু পাশে দুটি ব্রোচ ব্যবহার করা হয়। এ দুটি ব্রোচ হচ্ছে চন্দ্র ও সূর্য্য। সিঁথি ও তার সামনের লকেটটির নাম চুট্টি। ৬০০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত অজন্তার এক নম্বর গুহায় চিত্রিত অপ্সরাদের সীমন্তে এই ধরণের গহনার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। ভরতনাট্যম নৃত্যে সিঁথিকে ও দুপাশে দুটি ব্রোচকে 'তালৈক নাঘাই' বলা হয়। বেণীর ওপরদিকে রঙীন পাথর খচিত একটি গোল বড় ব্রোচ থাকে। একে 'রাকুডী' বলা হয়। বেণীর মধ্যে মধ্যে এক একটি পাথর খচিত ব্রোচ থাকে। একে 'জডাইভিল্লা' বলা হয়। অজন্তা গুহার অপ্সরা চিত্রে এই ধরণের একটি অলঙ্কার দেখতে পাওয়া যায়। বেণীর প্রান্তে সুন্দর তিনটি ঝুমকোর গুচ্ছ থাকে, একে 'কুঞ্জলম' বলে। মণিবন্ধে বলয় এবং হাতের ওপর প্রান্তে বাজুবন্ধকে 'ওরাঙ্কি' বলা হয়। কানের ঝুমকোতে যে শিকলটি চুলের সঙ্গে লাগানো হয়, তাকে 'মাটল' বলে। 'তাড' হচ্ছে কর্ণভূষণের ওপর প্রান্তে ব্যবহৃত পাথর। লম্বমান ঝুমকোকে 'ঝিমকি' বলা হয়। ভরতনাট্যম নৃত্যে নাকের গয়নাগুলি একটি বিশেষত্ব এনে দেয়। প্রাচীন প্রস্তর মূর্তিগুলিতে নাকের গহনার ব্যবহার দেখা যায় না। আচার্য ভরত শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গের অলঙ্কারের বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু নাকের অলঙ্কারের কথা তিনি কোথাও উল্লেখ করেন নি। ভরতনাট্যম নৃত্যে 'নথ' 'বেশরা' ও 'পুল্লাকে' (নোলক) প্রভৃতি নাকের গহনা ব্যবহার করা হয়। নথের অথবা নাকের গহনার প্রচলন নাকি মুসলিম যুগ থেকে আরম্ভ হয়েছে।

ঐসলামিক প্রভাব থেকে দক্ষিণভারত যে একেবারে মুক্ত এ কথা বলা যায় না। দক্ষিণ ভারতীয় বালিকাদের ঘাগরা ওড়নার ব্যবহার, গুজরাটের পায়জামা ও 'ফ্রককাট' জামার ব্যবহার এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ—"This revolutionary change was much slower in the South, no daubt, than in the North, but the change was basic every-where" (charles Fabri). যাইহোক, কণ্ঠহার হিসাবে কণ্ঠথরম্, (Necklace) মালামারে (বিভিন্ন রং-এর পাথরের আমহার) পদকম্ (লকেট) প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

কথাকলি নৃত্যের বেশভূষা—কথাকলি নৃত্যের অদ্ভুত বেশভূষা দর্শককে উৎসুক ও বিস্ময়বিমূঢ় করে তোলে। চরিত্র অনুসারে মুখচিত্রণ

করা হয় এবং ভূষণ ও বেশভূষা ধারণ করা হয়। কথাকলি নৃত্যে পূর্বে লোকনৃত্যের মত মুখোশ ব্যবহার করা হত। কিন্তু মুখোশে মুখের ভাব প্রকাশিত হয় না বলে ভেত্তস্বরূপমের যুবরাজ মুখোশের ব্যবহার উঠিয়ে দেন। এই সময় 'কিরীটম্' ও জামার প্রচলন হয়। কথাকলি নৃত্যের পুরুষ চরিত্রগুলিকে একরকম ঘাগরা পরতে হয়। সাঁচী স্তূপের দুই নং গুহার উত্তর দিকে প্রবেশ দ্বারের মুখে প্রাচীরে একটি শিকারী মূর্তিকে অনেকটা এই রকমের ঘাগ্‌রা পরতে দেখা যায়। কথাকলি নৃত্যের পরিভাষায় এই ঘাগ্‌রাকে 'উরুতেকেট্টা' বলা হয়। কটিবন্ধ হিসেবে একটি ঝালরের মত কাপড় ব্যবহার করা হয়। একে 'পাড়িএরেজ্ঞানম্' বলা হয়। মহিলা শিল্পীদের মাথায় ওড়না ব্যবহার করা হয়। ঘাগ্‌রার ওপর দিয়ে দুটি লাল কাপড়ের টুকরো ঝোলান থাকে, একে 'পাটুয়াল' বলে। নৃত্যশিল্পী পুরো হাতের যে জামা পরেন তাকে 'কুপ্পায়াম' বলে। গলায় যে চাদর ঝোলান হয় তাকে 'উত্তরীয়ম' বলে। এর দুই প্রান্তে আয়না লাগান থাকে। একাধিক উত্তরীয় ব্যবহার করা হয়। কোনটির প্রান্তদেশ ফুলের মত করা হয়, আবার কোনটির আয়না থাকে। বাদামীর তিন নম্বর গুহায় ত্রিবিক্রমের গলায় যজ্ঞোপবীত অথবা উত্তরীয় দেখা যায়। অজন্তা গুহার চিত্রে দেখা যায়, দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে 'পাটুয়ালের' মত কাপড়ের টুকরো দেহের নানাস্থান থেকে লম্বমান হয়ে ভূমি স্পর্শ করছে। নৃত্যে পোষাকের সম্মুখভাগে জরীর কারুকার্যখচিত নীবিবন্ধকে 'মুণ্ডি' বলে। বুকে 'কোটালারাম' বাঁধতে হয়। সাঁচীস্তূপে উৎকীর্ণ প্রস্তরমূর্তিতে পুরুষদের বুকে কোটালারামের মত কাপড়ের টুকরো বাঁধতে দেখা যায়।

কথাকলি নৃত্যে পুরুষচরিত্রদেরও অলঙ্কার ব্যবহার করতে দেখা যায়। পূর্বে ভারতীয় পুরুষরা যে অলঙ্কার পরতেন তার বহু বর্ণনা সংস্কৃত নাটকে ও গ্রন্থে পাওয়া যায়। কথাকলি নৃত্যে অলঙ্কারের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'কিরীটম'। এতে কারুকলার পূর্ণ বিকাশ। দু-রকমের কিরীটম দেখা যায়— 'কেশভরম' ও 'মুদি'। মুকুটের পেছনে মণ্ডল অথবা চাকতি থাকলে তাকে 'কেশভরম' বলে। বাদামীর তিন নম্বর গুহায় বিষ্ণুবিক্রমের মুকুটের পেছনেও এই রকম একটি মণ্ডল আছে। 'কেশভরম' মুকুটের দুপাশেও দুটি মণ্ডল থাকে। একে 'তোড়া' বলা হয়। বাদামীর তিন নম্বর গুহার দ্বারপালের মুকুটে এই

রকম চাকতি দেখতে পাওয়া যায়। পাপাচারী অথবা দুষ্ট চরিত্রে মণ্ডলটি আকৃতিতে বড় হয়। এ কথা সত্য যে, কথাকলি কিরীটমের পূর্ব সংস্করণ হচ্ছে 'কেশভরম' কিরীটম্। চাক্কিয়াররা কিরীটমে প্রচুর তাজাফুল ব্যবহার করতেন। মনে হয়, ফুল ক্ষণস্থায়ী বলে কথাকলি শিল্পীরা কাঠের তৈরী কিরীটমে কৃত্রিম মণিমুক্তা ব্যবহার করেন। কথাকলিতে আর এক রকমের মুকুট ব্যবহৃত হয়, একে 'মুদি' বলে। এই মুকুটটি মুনি ঋষিদের চূড়া বাঁধা চুলের মত। সাঁচীস্তূপের উত্তরদিকে প্রবেশপথের প্রাচীরের গায়ে যে মূর্তিটি আছে, তার শিরোভূষণে এইরকম একটি মুকুট দেখতে পাওয়া যায়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও এইরকম মুকুটের উল্লেখ আছে। হনুমানের চরিত্রাভিনয়ের জন্তে 'ভট্ট মুদি' মুকুট ব্যবহার করা হয়। এই মুকুটটি চারদিকে ছাতার মত ছড়িয়ে থাকে। 'কারি' মুদির উপরিভাগ খোলা থাকে। শূর্পনখা, শিকারী প্রভৃতি চরিত্রে এই মুকুট পরতে হয়। রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি চরিত্রে অভিনয় করবার সময় মুদিতে ময়ূরের পালক ব্যবহৃত হয়।

এই বিশ্ব প্রকৃতি মৌলিক জ্ঞানের আকর। মানুষ যুগে যুগে এর থেকে নানারকম জ্ঞান আহরণ করছে। এই প্রকৃতি মানুষকে সৌন্দর্য শিক্ষা দিয়েছে এবং তার সঙ্গে সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্তে উপকরণ গুলিও অকৃপণ হাতে দান করেছে। ভারতীয় রূপসজ্জায় এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ময়ূর পৃথিবীর পাখীদের ভেতর শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে। তারই নানা রঙে চিত্রিত পালকগুলি ভারতীয় নাট্যে অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া প্রসাধনের সামগ্রীও প্রকৃতিজাত দ্রব্য থেকে নেওয়া হত। অঙ্গরাগের উপাদান ছিল পুষ্পরেণু ও চন্দন। স্নানান্তে ধূপধূমে কেশসংস্কার ছিল অঙ্গসজ্জার একটি বিশেষ রূপ। রমণীদের ওষ্ঠদ্বয় রঞ্জিত করবার জন্তে মধু, কুম্‌কুম্ ও মোম্ মিশ্রিত প্রলেপ ব্যবহার করা হত। রমণীদের কপোল রঞ্জিত করবার জন্তে মনঃশিলাচূর্ণ সহ দ্রব্য, হরিতাল মিশ্রিত নানারকম টিপ, লবঙ্গফুলের ও কেতকীর নির্য্যাস, অলক্তক ও হিঙ্গুল ব্যবহার করা হত। কথাকলি নৃত্যেও প্রকৃতিজাত সাধারণ দ্রব্য থেকে মুখ চিত্রিত করবার রীতি এখনও পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়।

কথাকলি নৃত্যে শিরোভূষণ ছাড়া আর যে সকল অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়, তার ভেতর গোলাকৃতি অবতল 'কুণ্ডলম', ক্ষুদ্রাকৃতি 'চেভিক্কুট্টু' উল্লেখযোগ্য। একটি তারকে লাল কাপড় দিয়ে গোলাকৃতি করে মুড়ে তার চারদিকে কদমফুলের মত

করে দেওয়া হয়। এটি কণ্ঠ হারের মত শোভা পায়। মুকুটের নীচে লাল কাপড়ের সরু বন্ধনীকে 'চুট্টিতুনী' বলা হয় এবং এর ওপর যে সিঁথি পরা হয়, তাকে 'নারা' বলে। কৃত্রিম কেশকে 'চামরম্' বলা হয়। গলায় পুঁতির হার হচ্ছে 'কাজুহারম্'। হাতের জন্যে তিন রকম গহনা ব্যবহৃত হয়। কাঁধে যে গহনা ব্যবহার করা হয় তাকে 'তোল্ভালা', বাজুকে 'ভালা' এবং মণিবন্ধের গহনাকে 'কটকম্' বলা হয়।

কথাকলি নৃত্যে চারিত্রিক গুণাবলী স্পষ্টরূপে পরিস্ফুট করবার জন্যে বিভিন্ন ভাবে মুখচিত্রণ করা হয়।

চরিত্রগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সদ্‌গুণাবলী থেকে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন, অসচ্চরিত্রাবলী থেকে রাজসিক ভাবাপন্ন এবং ধ্বংসমূলক কাজ থেকে তামসিকভাবাপন্ন চরিত্রগুলির সৃষ্টি। শিব যদিও সত্ত্বগুণের অধিকারী; তবুও সংহার কর্তা ব'লে ধ্বংসমূলক চরিত্র বলতে শিবকেই বোঝায়। বিভিন্ন রসকে পরিবেশন করবার জন্যে মুখগুলিকে অদ্ভুত ভাবে চিত্রিত করা হয়। আচার্য ভরত এই ধরনের মুখচিত্রণের উল্লেখ করেছেন। কথাকলি নৃত্যে বিভিন্ন চরিত্রে বিভিন্ন রঙ ব্যবহৃত হয়। হরিতালের গুঁড়ো, নারকোল তেল ও নীল রঙ্ মিশিয়ে সবুজ রঙ্ তৈরী করা হয়। সিঁদুর, চালের গুঁড়ো ও নারকোল তেল মিশিয়ে লাল রঙ্ তৈরী করা হয়। ভুষা কালি অথবা ঝুলের সঙ্গে নারকোল তেল মিশিয়ে কালো রঙ প্রস্তুত হয়।

চালের গুঁড়ো ও চূণ দিয়ে মুখে যে বিচিত্র রঙ্ করা হয়, তাকে 'চুট্টি' বলে। বিভিন্ন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই চুট্টি ব্যবহৃত হয়। মহিমান্বিত রাজা ও সাত্ত্বিক ভাবাপন্নের কপাল সাদা, লাল ও কাল রঙে রঞ্জিত করা হয়। রূপসজ্জা অনুসারে চরিত্রগুলিকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা হয়,—পাচ্চা, কাত্তি, তাড়ি, কারি ও মিনুক্কু। সাত্ত্বিক চরিত্রগুলি 'পাচ্চা' রূপসজ্জার অন্তর্গত। রাম, কৃষ্ণ, অর্জুন প্রভৃতি দেবচরিত্রগুলি সাত্ত্বিক চরিত্র। এই চরিত্রচিত্রণে মুখের সম্মুখভাগ গাঢ় সবুজ বর্ণে রঞ্জিত করা হয় এবং নীচের চোয়াল বরাবর চুট্টি দেওয়া হয়। লাল অধর এবং কালো চোখ ও ভ্রূ অঙ্কিত করা হয়। নাট্যশাস্ত্রেও প্রায় এই রকম বিবরণ আছে।

'কাত্তিতে' মুখের সবুজ রঙের সঙ্গে লাল দেওয়া হয়। এতে 'চুট্টি' ব্যবহৃত হয়। মুখরঞ্জন সমাপ্তির পর একটি লাল সরু কাপড় মাথার খুলির নীচে বাঁধা

হয় এবং তার ওপর সাদা রঙে রঞ্জিত করা হয়। একে 'চুট্টিনতা' বলা হয়। প্রতিনায়কদের ক্ষেত্রে চুট্টিনতা ব্যবহার করা হয়। রাবণ, কীচক, শিশুপাল চরিত্রে এইরকম চিত্রণ করা হয়। নাকের ঠিক মধ্যস্থলে সাদা ও লাল রঙের কল্কা কাটা হয়। তার ওপর সাদা সোলার ছোট দুটি বল স্থাপন করা হয়। একে 'টিটুপুভ্যু' বলা হয়। 'কাত্তি' রূপসজ্জার বিশেষত্ব হচ্ছে যে, এই চরিত্রে বিরাট লাল গোঁফ আঁকা হয় এবং এর পাশে সাদা রঙের রেখা থাকে। গলা লাল রঙে রঞ্জিত করা হয়। ক্রোধ প্রকাশের জন্যে অনেক সময় গজদন্ত ব্যবহার করা হয়। শ্মশ্রুর রঙ্ অনুসারে চরিত্রগুলির গুণ নির্ণয় করা হয়। তিন রকমের রঙ্ ব্যবহার করা হয়। ভেলুপ্প্ টাডি, কারুপ্প্ টাডি, ও চোকান্না টাডি। ভেলুপ্প্ টাডিতে সাদা শ্মশ্রু ব্যবহৃত হয়। পৌরাণিক উচ্চস্তরের জীবে এই ধরণের শ্মশ্রু ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ হনুমানের উল্লেখ করা যেতে পারে। মুখের উপরিভাগ কান এবং নাকের ডগা ও মুখের নিম্নাংশ লাল রঙ্ করা হয়। চিবুকের দুপাশে চুট্টি দেওয়া হয়। অধরে সাদা রঙের ওপর কাল ছাপ থাকে। মুখ গহ্বরে দাঁত ব্যবহার করা হয় এবং সাদা তুলোর দাড়ি লাগান হয়। শিকারী প্রভৃতি চরিত্রে কালো দাড়ি ব্যবহৃত হয়। যথা শিবের কিরাত ছদ্মবেশ ধারণে কালো দাড়ি ব্যবহৃত হয়। দস্যু প্রভৃতি চরিত্রে 'চোকান্না' টাডি, অথবা লাল দাড়ি ব্যবহার করা হয় এবং মুখের উপরিভাগ কাল ও নিম্নভাগ লাল রঙে রঞ্জিত করা হয়।

'কারি' চরিত্র রূপায়ণের জন্য কালো রঙ ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ দানবী চরিত্রে এই রঙ্ ব্যবহার করা হয়।

'মিনুক্কু' চরিত্রগুলি হলুদ ও লাল রঙের হয়। সাধু অথবা মহৎ চরিত্রে এগুলি ব্যবহৃত হয়। ললাটে চন্দনের তিলক প্রভৃতি এবং আঁখিপল্লবে কাজল অথবা সুর্মার প্রলেপ শৃঙ্গার ও শান্তরসের উদ্রেক করে।

মণিপুরী নৃত্যের রূপসজ্জাও অতি মনোহর ও নয়নমুগ্ধকর। মণিপুরীর বিভিন্ন নৃত্যে বিভিন্ন বেশভূষা ধারণ করতে হয়। মণিপুরী রাসনৃত্যে মাথার ওপর চূড়ার আকারে একটি কালো রঙের পশম জাতীয় বল লাগান হয়। অনেক সময় বলের পরিবর্তে কেশগুলিকেও চূড়ার আকারে বাঁধা হয়। এই বলটিকে 'কোকতুম্বী' বলা হয়। প্রাচীনকালে 'কবরীবন্ধন' চৌষট্টি কলার অন্যতম কলা ছিল। এখনও পর্যন্ত ভারতীয় নৃত্যে বিভিন্ন ধারায় কবরী বন্ধন করতে

দেখা যায়। বহু প্রাচীনকালেও বেণী রচনার প্রথা ছিল। প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত 'বারহূত' স্তূপে চন্দ্র ও যক্ষীর প্রতিমূর্তিতে বেণীবন্ধন আছে এবং মাথায় পাগড়ী আছে। যাই হোক, চূড়াকারে কেশবন্ধন প্রণালী ভারতের রমণীদের অতি প্রাচীন রীতি হলেও এশিয়ার যে কোন বুদ্ধের প্রতিমূর্তিতে আমরা চূড়াকারে কেশবন্ধন দেখতে পাই। বৈষ্ণব সাহিত্যেও বালক কৃষ্ণের কেশ চূড়া করে বাঁধবার অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। সুতরাং এই ধরণের কেশবিন্যাস স্বভাবতঃই মানবমনে সাত্ত্বিক ভাবের সৃষ্টি করে। সেইজন্যেই রাসনৃত্যে এই রকম চূড়াকারে কেশবন্ধন করতে হয়। মণিপুরী নৃত্যে পুরুষদের মাথায় পাগড়ী ও মুকুট এবং রমণীদের মাথায় ওড়না প্রভৃতির ব্যবহার দেখা যায়। কাম্বোদিয়ার এ্যাঙ্করওয়াটের পূর্ব গ্যালারীতে সমুদ্র মন্থনের দৃশ্যে দানবের মাথায় 'কোকতুম্বীর' মত একটি শিরোভূষণ দেখা যায়। এর সঙ্গে মুকুটও আছে। মণিপুরী নৃত্যে পুরুষদের দ্বারা ব্যবহৃত মুকুটগুলি ওপর দিকে সূচালো থাকে। কাম্বোদিয়ার এ্যাঙ্করওয়াটের দক্ষিণ গ্যালারীর স্বর্গীয় দৃশ্যে দেবতাদের মুকুটগুলির সঙ্গে এর প্রচুর সাদৃশ্য দেখা যায়। শ্যামদেশের (আধুনিক থাইল্যাণ্ড) নর্তক নর্তকীদের মাথায়ও এই রকম সূচালো মুকুট থাকে। মুকুটের সঙ্গে একটি ফিতা থাকে, সেটিকে গলার নীচে বাঁধতে হয়। মণিপুরী নৃত্যে পুরুষদের মুকুটগুলিও এইভাবে পরতে হয়। এই দুই দেশীয় মুকুটের ভেতর একটি গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ভারতের পূর্বে অবস্থিত দেশগুলির সঙ্গে মণিপুর রাজ্যের সাংস্কৃতিক বিনিময় হয়েছিল। রাসনৃত্যে মুখের ওপর ব্যবহৃত সূক্ষ্ম ওড়নাটিকে 'মাইখুম' বলা হয়। সূক্ষ্ম ওড়নার অন্তরালে মুখটি অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। এর দ্বারা ভক্তিনম্র ও লজ্জারুণ একটি সুন্দরভাব ফুটে ওঠে। মণিপুরী নৃত্যে ঘাগরাকে 'কুমিন' বলা হয়। ঘাগরাটির ভেতরে বেত দিয়ে শক্ত করা হয়। এতে কাঁচের আয়না এবং নানারকম জরীর [illegible] থাকে। এই ঘাগরাটির ওপর বড় আর একটি ছোট ঘাগরা থাকে। একে 'পোশওয়ান' বলে। রাসনৃত্যে পুরুষরা প্রাচীনকালের মত কোমরবন্ধনী ও কাঁধের ওপর লম্বমান কাপড়ের টুকরো ব্যবহার করেন। সম্মুখ প্রান্তে ঝুলন্ত কাপড়ের টুকরোটিকে (কোমরবন্ধনী) 'খবণ' এর পাশে [illegible] কাপড়ের টুকরোটিকে 'খাওয়ান' বলা হয়। 'লাইহারাওবা' নৃত্যে পুরুষরা বিভিন্ন পদ্ধতিতে পোষাক-পরিচ্ছদ পরে

থাকেন। 'ত্রিকচ্ছ' পদ্ধতিতে অনেক গিঁট থাকে। মনে হয়, সূচীশিল্প ছিল না বলেই গিঁটের প্রচলন ছিল। মণিপুরের 'লাইহারাওবা' নৃত্যে 'কানেক' পরবার পদ্ধতির সঙ্গে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নারীদের বস্ত্র পরবার পদ্ধতির বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। 'লাইহারাওবা' নৃত্যে ব্যবহৃত কানেকের পাড়ে যে যে ধরণের নক্সা থাকে, তার সঙ্গে চান্হুদোড়োতে প্রাপ্ত একটি পাত্রের গায়ে ঠিক ওই ধরণের নক্সা দেখা যায়। নাগা অঞ্চলের নাগা নৃত্যে নাগকন্যা ও পুরুষরা সাপের মত লাল ও কালো ডোরাকাটা কানেক ব্যবহার করেন। মণিপুরীরা মনে করেন এটি রাত্রি ও উষার প্রতীক। একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, এইসব নৃত্যের পোষাকে অনার্যভাব সুস্পষ্ট। কারণ পূর্ব ভারতের আসাম প্রান্তে নাগদ্বীপ বা নাগরাজ্য ছিল। প্রাচীনকালে প্রান্তদেশ বলতে ব্রহ্মদেশ, তিব্বত প্রভৃতিও বোঝাত। এই সকল নাগরাজারা অনার্য ছিলেন। অনার্যসভ্যতার নিদর্শন আজও বাংলাদেশে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ শাঁখা, সিন্দুর নৈবেদ্য'র উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু অনার্যদের সঙ্গে আর্যদের যে সংমিশ্রণ হয়েছে তা অতি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। মণিপুরী নৃত্যের শিরোভূষণ হিসেবে 'পাগড়ী' ব্যবহৃত হয় এবং কতকগুলি বিশেষ চরিত্রে মুকুট ব্যবহৃত হয়। পাগড়ীর একটি অংশ পিঠের দিকে লম্বমান অবস্থায় থাকে। এই সকল ছোট ছোট বিষয় থেকে সহজেই অনুমেয় যে, মণিপুরী সংস্কৃতিতে আর্য, অনার্য ও প্রান্তদেশে প্রচলিত মাঙ্গোলীয় সংস্কৃতির অদ্ভুত সংমিশ্রণ হয়েছে। কোন সংস্কৃতিই অপরকে অতিক্রম করে নিজের প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি। অথচ সুন্দরভাবে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

ভক্তিরসের প্রাধান্যের জন্যে রাসনৃত্যের পোষাকগুলি এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে যে, গায়ের অংশ খুব অল্পই দেখা যায় এবং অঙ্গহারও অতি সুচারু ও নম্রভাবে করতে হয়। রাসনৃত্যের সাজসজ্জা শ্রীশ্রী মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রের নিজস্ব পরিকল্পনা। কথিত আছে যে, তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে রাসনৃত্যের প্রবর্তন করেন এবং তাতে আঙ্গিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের সংমিশ্রণ করেন। একথা সত্যি যে, এই কবি ও শিল্পী নৃপতি সুন্দরের উপাসনা করে সৌন্দর্যের রস আস্বাদন করেছিল এবং তিনি সেই সৌন্দর্য নৃত্য ও গীতের ভেতর মূর্ত করতে চেয়েছিলেন। অনার্য অপেক্ষা আর্য সৌন্দর্যেই তাঁর রসিক মন বেশী লীন

ছিল। রাসনৃত্যে নর্তকীরা 'কোকতুম্বী'র নীচে 'কোকনাম' অথবা সিঁথি পরেন। দ্বিতীয় শতাব্দীতে মথুরার বৃক্ষদেবীর মাথায় এই ধরণের সিঁথির ব্যবহার দেখা যায়। 'কোকতুম্বীর' সঙ্গে কতকগুলি জরীর ঝুলমি ঝোলান হয়, একে 'চুবালৈ' বলা হয়। এর সাদৃশ্য দেখা যায় অজন্তা গুহার অপ্সরার মাথায় পরিহিত পাগড়ীর সঙ্গে কতকগুলি দোদুল্যমান মুক্তার সারির। শ্যামদেশের মুকুটের সঙ্গেও এইরকম ঝুলমি থাকে। এছাড়া বিভিন্ন ধরণের গহনা দেখতে পাওয়া যায়, যথা—কুণ্ডর নাইন (কুণ্ডল) মরৈ পারেং (দুই সারি হার), কিয়াঙ, লিক্ ফাঙ, (চওড়া হার), পাম বোন কাবি (বাজু), তাং (আর্মলেট) ইত্যাদি। কৃষ্ণের মুকুটকে 'মইত্নন্' বলা হয়। এর ওপর 'কোকনামলাইক্রেং' দেওয়া হয়, তার ওপর ময়ূরের পালক অথবা চূড়া সংযুক্ত হয়।

লাই হারাওয়া নৃত্যের পোষাক পরিচ্ছদকে 'নিংখম সমজিন' বলা হয়। নিংখমের অর্থ হচ্ছে ত্রিকোণা কাপড়। সমজিনের অর্থ হচ্ছে মুকুট। মুকুটের সঙ্গে একটি কাপড় সংযুক্ত থাকে। এই কাপড়ের টুকরাটিকে 'খোঁগাড়ী' বলা হয়। শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে পালা কীর্তনের সময় অথবা করতাল প্রভৃতি নৃত্যে বড় বড় পাগড়ী বাঁধতে হয়।

উত্তর ভারতের কথক নৃত্যের পোষাক পরিচ্ছদ মণিপুরী নৃত্য ও কথাকলি নৃত্যের মত অত চমকপ্রদ না হলেও নৃত্যের পক্ষে বেশ সুবিধাজনক। পূর্বকালে কথক নৃত্যে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা একটি স্বচ্ছ জামা পরা হত। একে 'পেশোয়াজ' বলে। 'পেশোয়াজ' কথাটি এসেছে 'পাওজা' শব্দটি থেকে। এর অর্থ হচ্ছে সেলাই করা। আকবরের দরবারে বিশিষ্ট সভাসদরা এই পোষাক পরতেন। বাদশাহ নিজেকেও এই রকম পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত করতেন। জাহাঙ্গীরের সময় এই পোষাক পরিচ্ছদের পরিবর্তন হয়। তাঁর রাজত্বে অভিজাত মহলে যে পোষাক পরা হত তা অত স্বচ্ছ ছিল না। স্বচ্ছ বস্ত্রের পরিবর্তে ব্রোকেড, রেশম প্রভৃতি ব্যবহার করা হত। অনেকে কথক নৃত্যের পোষাককে রাজপুতদের মত বলেন। কিন্তু রাজপুতদের পোষাকও মোগলদের দ্বারা প্রভাবান্বিত। ডাঃ চার্লস ফেব্রী বলেছেন—

" Towards the end of the 16th century, when diaphanous jamas and skirts became the fashion at court, the

gentlemen of Rajasthan wore the same dress. This went out of fashion around 1610, when transparent skirts were worn only by entertainers, whilst gentlemen and ladies wore opaque material. এছাড়া বেসিল গ্রে'র 'পার্শিয়ান মিনিয়েচার্স' নামে গ্রন্থটিতে ১ নম্বর প্লেটে যে ছবিটি আছে, তাতে জ্যাকেট পরিহিত অবস্থায় রাজপুত্র ও তার সঙ্গীদের যে চিত্রটি আছে, তার সঙ্গে মুঘল ও কথক নৃত্যের পোষাকের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কথক নৃত্যেও চুরীদার পায়জামা, পেশোয়াজের ওপর জ্যাকেট, ওড়না অথবা টুপী ব্যবহার করবার প্রথা ছিল। ইরানীরাও এ ধরণের পেশোয়াজ, সলোয়ার ও টুপী পরতেন। জ্যাকেট হিন্দুদের ভেতর ব্যবহৃত হত না। হিন্দু নারী পুরুষ টুপী ব্যবহার করতেন বটে, তবে তার আকৃতি ছিল ভিন্ন ধরণের। প্রাচীনকালে ভারতীয় নারীরা ছোট ছোট ওড়না ব্যবহার করতেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ছোট ওড়নার পরিবর্তে বড় বড় ওড়না ব্যবহৃত হতে লাগল। রাজপুত নারীরা ঘাগ্‌রা, ওড়না, পায়জামা ও আঙ্গিয়া (এক রকম ছোট ব্লাউজ) ব্যবহার করেন। ঘাগরা, ওড়না ও আঙ্গিয়ায় সোনা-রূপোর সূক্ষ্ম কাজ থাকে। আধুনিক যুগে কথক নৃত্যে অনেকে ঘাগরা ও শাড়ী পরেন। রাজপুত নারীরা গহণার ভেতর অন্যান্য গহণার সঙ্গে শিরোভূষণ হিসেবে বোড়লা পরে থাকেন। বোড়লা টিকলী জাতীয় গহণা। হাতে রতনচূড় পরতেও দেখা যায়। কর্ণভূষণ, কণ্ঠহার, বালা প্রভৃতিও ব্যবহৃত হয়। রতনচূড়, ঝাপটা ও নাকের গহণাগুলি মুসলমান নারীদের ভেতরই প্রচলিত ছিল।

অনেকে কথক নৃত্যের বেশভূষার সঙ্গে প্রাচীন হিন্দু ভাস্কর্যের বেশভূষার তুলনা দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ ১নং অজন্তা গুহার বাম প্রাচীরে (৬০০ খৃঃ —৬৪২ খৃঃ) গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের নৃত্যের যে চিত্রটি পাওয়া যায়, তাতে কথক নৃত্যের মত জামা পরা একটি নর্তকীর উল্লেখ করা হয়েছে। তার বেশভূষা অন্যান্য নর্তক নর্তকীদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। "Dr. Charles Fabri এই নর্তকীটির মূর্তি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে—"The lovely sinuous dancing girl in the Ajanta cave Painting (Mahajan Jataka) is obviously completely differently dressed from all the other women in the caves, for she wears as long sleeved

garment with a plastron in front, probably bare at the back." তিনি বলেছেন আর কেউই এ ধরণের পোষাক পরে নি কেন? তাঁর মতে এটি কোন যবন নারীর চিত্র। কারণ ভারতীয় নারীরা দেহের ওপরের অংশে কোন বস্ত্র ব্যবহার করতেন না। রাণী, মহারাণীদেরও যে খোদিত মূর্তি আছে তাতে জামার ব্যবহার নেই এবং বক্ষঃস্থলও উন্মুক্ত। এইসব প্রাচীন ভাস্কর্য ও চিত্রের মধ্যে কোন কোন নারীকে জামা পরতে দেখা যায় অথবা বক্ষঃস্থল ঢাকতে দেখা যায়। এরা অধিকাংশই পরিচারিকা অথবা নর্তকী এবং এরা যবন শ্রেণীভুক্ত।

যাই হোক ওপরের আলোচনার দ্বারা আমরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আধুনিক নৃত্যশৈলীর রূপসজ্জার একটি স্পষ্ট ধারণা করতে পারি। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আধুনিক নৃত্যশৈলীর রূপসজ্জাগুলি একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের রসিক সমাজের সমাদর লাভ করেছে বলেই এদের সৌন্দর্য বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে

"তকারঃ শংকরঃ প্রোক্তো লকারঃ শক্তিরুচ্যতে।
শিবশক্তিসমাযোগাৎ তালনামাভিধীয়তে।"

প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রে ভারতীয় দর্শনের ভিত্তিতে তালের ব্যাখ্যা—

তাল সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সঙ্গীতাচার্য কোহল সৃষ্টি রহস্যের এই দার্শনিক তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন করেছেন। সঙ্গীতজ্ঞ মতঙ্গও মাত্রার উল্লেখে বলেছেন যে, শিব ও শক্তির মিলনই বিশ্ব সৃষ্টির কারণ। কিন্তু এই শিবই বা কে এবং শক্তিই বা কে? শিব হচ্ছেন সেই পরম পুরুষ, যাঁর দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হচ্ছে। তিনি সকলের মধ্যে প্রকাশমান, তিনি অনন্ত, অসীম ও শুদ্ধ। তাঁকে অবলম্বন করে সমুদয় জগতের অস্তিত্ব। উপনিষদে বলা হয়েছে সেই অনন্ত আত্মা এক, সকলের নিয়ন্তা এবং সর্বভূতের অন্তরাত্মা।

"ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতোভান্তি কুতোঽয়মগ্নি:
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।"

(কঠ উপ—২।২।১৫)

সেখানে সূর্য, চন্দ্র, তারকা সব নিষ্প্রভ, বিদ্যুৎ সমূহও প্রকাশ পায় না, এ অগ্নি সেখানে কোথা থেকে এলো? তাঁরই আলোকে সকলে আলোকিত, তাঁরই দীপ্তিতে সব কিছু দীপ্তি পাচ্ছে। কপিলের মতে প্রকৃতি হচ্ছে তাঁরই ছায়া, তাঁরই শক্তির প্রকাশ। শঙ্করাচার্যও বলেছেন—

"শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম্।
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।"

অর্থাৎ শক্তির সঙ্গে যুক্ত হলেই শিব কার্যকরী ক্ষমতা লাভ করেন, নতুবা তাঁর স্পন্দিত হবার শক্তিও থাকে না। শিব শবে পরিণত হন। সাংখ্যমতে প্রকৃতি সর্বব্যাপী জড়রাশি। তাতে এই জগতের সমুদয় কারণ রয়েছে। প্রকৃতি নিয়মাধীন হয়ে কাজ করছে এবং পরমপুরুষের চিৎ বা চৈতন্যে প্রতি-বিম্বিত হচ্ছে। এই ভাবে প্রকৃতি ও পুরুষের মিলন হয়েছে। কোহল বলেছেন, প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে তালের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কি করে হল? ঋগ্বেদে সৃষ্টির বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, এই অনন্ত পুরুষ নিশ্চেষ্ট ও গতিশূন্য ছিলেন। আকাশ সেই অনন্ত পুরুষে সুপ্তভাবে ছিল। এই অবস্থাকে অব্যক্ত বা স্পন্দন

রহিত বলা হয়েছে। এই আকাশ সূক্ষ্ম ও সর্বব্যাপী। এর সঙ্গে সর্বব্যাপী শক্তি রয়েছে। এই শক্তি হচ্ছে প্রাণ। প্রাণ বারবার আকাশের ওপর আঘাত দিতে থাকে এবং তাতেই স্পন্দন বা গতির সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ এই প্রাণই হচ্ছে গতি। কল্পের আদিতে ও অন্তে সব শক্তি এই প্রাণেই লয় পায় এবং সকল পদার্থই আকাশে পর্যবশিত হয়। আবার প্রাণ থেকে গতির সঞ্চার হয়। এই গতির নিবৃত্তি নেই। প্রকৃতির নিয়মে জন্ম ও মৃত্যু নিরবচ্ছিন্ন গতিতে চলছে। এই গতির স্পন্দনেই জগৎ সৃষ্টি হ'ল—ফুল ফুটল, প্রভাতের সূর্য রঙ্ ছড়াল, সাগর লহর তুলল, স্রোতস্বিনী ও শৈলমালা বক্ষে ধারণ করে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে জগৎ চলতে লাগল। কোথাও বিশৃঙ্খলা নেই, অনিয়ম নেই। এই নিরবচ্ছিন্ন গতি আমাদের প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দনে ছন্দিত হতে লাগল। এই ছন্দের অনুভবে মাত্রা, তাল, লয় প্রভৃতির সৃষ্টি হ'ল। কোহল তাল সম্বন্ধে বলতে গিয়ে উপরোক্ত শ্লোকটির দ্বারা ভারতীয় দর্শনের গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। 'রুদ্রডমরুদ্ভবসূত্রবিবরণম' এ তাল সম্বন্ধে এই রকম ব্যাখ্যা আছে—

"তালাত্মকং জগৎ সর্বং তালস্তু ব্যাপকঃ স্মৃতঃ।

সূত্রে সূত্রে স তালঃ স্যাৎ স তালঃ কালসম্ভবং।"

অনেকে বলেন, তাণ্ডব ও লাস্যের আদ্য অক্ষর দুটি নিয়ে 'তাল' শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। তাণ্ডবের সৃষ্টিকর্তা শিব এবং লাস্যের সৃষ্টিকর্তা পার্বতী। যাই হোক, প্রাচীন শাস্ত্রকাররা শিব ও শক্তিকেই তালের সৃষ্টিকর্তা বলেছেন।

নাদের দার্শনিক ব্যাখ্যা—অনেকে বলেছেন, ধ্বনি না থাকলে তালের সৃষ্টি হত না। নাট্য শাস্ত্রকাররা এরও দার্শনিক ব্যাখ্যা করেছেন। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎই হচ্ছে রূপ। এর পশ্চাতে রয়েছে 'স্ফোট' অথবা শব্দ ব্রহ্ম। এর একটি মাত্র বাচক শব্দ 'ওঁ' সমস্ত আকাশ জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। 'সঙ্গীত মকরন্দে' বলা হয়েছে যে, এই নাদ দেবতারা শ্রবণ করেন। মহাত্মা ও যোগিরা সংযতচিত্তে এই নাদে আত্মনিবেশ করে মুক্তিলাভ করেন। একেই 'অনাহত' নাদ বলা হয়। এই অনাহত নাদ যখন কোন পদার্থের সাহায্যে উত্থিত হয়, তখন তাকে 'আহত' নাদ বলে। এই অনাহত 'ওঁকার' ধ্বনি বায়ু তরঙ্গের কম্পনে কম্পনে বিস্তৃততর হয়ে সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কম্পনের স্থিতিকাল এক একটি মুহূর্ত বা ক্ষণ। প্রাচীন নাট্য শাস্ত্রকাররা নাদের নানারকম ব্যাখ্যা করেছেন। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত বলেছেন,

'নকার' ও 'দকার' এই দুই বীজ অক্ষরের দ্বারা তাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রাণ ও অগ্নিকে বোঝায়। পরবর্তী শাস্ত্রকাররাও এই কথাই বলেছেন—

"নকারং প্রাণনামানং দকারমনলং বিদুঃ।
জাতঃ প্রাণাগ্নিসংযোগাত্তেন নাদোঽভিধীযতে।"

এর থেকেই তালের সৃষ্টি।

শম্ভোঃ সংপদ্যতে নাদো নাদাদুৎপদ্যতে মনঃ।
মনসো জায়তে কালঃ স কালস্তালসংজ্ঞিতঃ॥

শম্ভু থেকে নাদের জন্ম, নাদ থেকে মনের এবং মন থেকে কালের জন্ম হয়েছে। সেই কালই 'তাল' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতেও আমরা দেখতে পাই যে, আকাশমার্গে বিদ্যমান বিভিন্নস্তরের বায়ুতরঙ্গে শব্দ প্রবাহিত হয়ে আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে

এবং আমরা এই শব্দ শুনতে পাই। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় ব্যতীত আরও একটি ইন্দ্রিয় আছে। তা হচ্ছে মন। আমাদের চেতনা অথবা বুদ্ধি মনকে

সংবাদ দেয় এবং ইন্দ্রিয়দের একটি দ্বারা আমরা তা গ্রহণ করি। নাদের ভেতর দিয়ে মাত্রার অনুভূতি শ্রবণপথে চালিত হয়ে আমাদের দেহে ও মনে ছন্দের স্পন্দন জাগায়। এইভাবে আমরা ছন্দের স্পন্দন অনুভব করি।

আহত নাদকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—নখজ (তত), বায়ুজ (সুষির), চর্মজ (আনদ্ধ), লোহজ (ঘন) ও শরীরজ। বীণা প্রভৃতির নাদ নখজ, বংশী প্রভৃতির নাদ বায়ুজ, মৃদঙ্গ প্রভৃতির নাদ চর্মজ, মন্দিরা প্রভৃতির নাদ লোহজ। দেহ দ্বারা উৎপন্ন নাদকে 'শরীরজ' বলা হয়। মনুষ্যদেহের বিভিন্ন স্থান থেকে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তা বর্ণাত্মক। সমস্ত রকম গীতই নাদাত্মক। নৃত্য, গীত ও বাদ্য নাদের অধীন। এই নাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রবিদ্ পাণিনীয় শিক্ষাকার একটি সূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞানের কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন—

"আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান মনো যুঙ্‌ক্তে বিবক্ষয়া,
মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি, স প্রেরয়তি মারুতম্।
মারুতস্তুরসি চরন্ মন্দ্রং জনয়তি স্বরম্॥"

অর্থাৎ আত্মা বুদ্ধির সঙ্গে অর্থকে প্রাপ্ত হয়ে তা প্রকাশ করবার অভিলাষে মনকে নিযুক্ত করে। মন তখন দেহস্থিত অগ্নিকে আহত করে। সেই অগ্নি প্রাণবায়ুকে প্রেরণা দেয়। ঐ প্রাণবায়ু তখন বক্ষঃস্থলে বিচরণ করতে করতে নাদের সৃষ্টি করে।

নাদ—সঙ্গীতের উপযুক্ত স্বর যদি স্থির অথবা নিয়মিত আন্দোলনের দ্বারা উৎপন্ন হয় তাকে সঙ্গীত শাস্ত্রে নাদ বা ধ্বনি বলা হয়।

এই নাদ বা ধ্বনি নানাভাবে উৎপন্ন হতে পারে। বিশেষ করে সঙ্গীতশাস্ত্রে এই নাদকে নানাভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। সঙ্গীতশাস্ত্রে আহত নাদকে সঙ্গীতের উপযুক্ত বলা হয়েছে। নাদের তিনটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—

(১) ছোট-বড় ভেদ, (২) গুণ বা জাতিভেদ (৩) নাদের উচ্চ ও নিম্নভেদ।

(১) ছোট বড় ভেদ—নাদ যদি মৃদুস্বরে শোনা যায় তাকে নীচু নাদ এবং যদি উচুস্বরে শোনা যায় তাকে উচু নাদ বলা হয়। তবে এখানে স্থানের দূরত্বকে গণ্য করা হয়েছে। নিকট থেকে শোনা গেলে নীচু স্বর এবং দূর থেকে শোনা গেলে উচু স্বর।

(২) নাদের গুণ বা জাতি—নাদ বিভিন্ন বস্তু বা কণ্ঠস্বর থেকে উত্থিত হলে আমরা তা বুঝতে পারি এবং নাদের গুণ বা জাতির বিচার করি।

(৩) উচু ও নীচু নাদ—একটি স্বর থেকে আর একটি স্বর যখন উচু গ্রামে হয়, তখন তাকে উচু স্বর বলা হয়। একটি স্বর থেকে আর একটি স্বর যখন নীচু হয়, তখন তাকে নীচু স্বর বলা হয়।

কম্পন বা আন্দোলন—তন্ত্রবাদ্যের দ্বারা উত্থিত নাদে যে কম্পন বা আন্দোলন হয় তাকে কম্পন বা আন্দোলন বলা হয়। চার রকমের আন্দোলন আছে—(১) স্থির, (২) অস্থির, (৩) নিয়মিত ও (৪) অনিয়মিত।

(১) স্থির আন্দোলন—যে আন্দোলন স্থায়ী হয় তাকে 'স্থির' আন্দোলন বলা হয়।

(২) অস্থির আন্দোলন—যে আন্দোলন অস্থায়ী তাকে 'অস্থির' আন্দোলন বলা হয়।

(৩) নিয়মিত—যে আন্দোলন সমান গতিতে চলে, তাকে 'নিয়মিত' আন্দোলন বলা হয়।

(৪) অনিয়মিত—যে আন্দোলন সমান গতিতে চলে না, তাকে 'অনিয়মিত' আন্দোলন বলে।

স্বর—স্নিগ্ধ ও চিত্তাকর্ষক নাদকে স্বর বলা হয়। সর্বসমেত বারোটি স্বর আছে। তার মধ্যে সাতটি স্বর শুদ্ধ এবং পাঁচটি স্বর বিকৃত হয়। সাতটি শুদ্ধ স্বর হচ্ছে স র গ ম প ধ ন এবং পাঁচটি বিকৃত স্বর হচ্ছে—র গ ম ধ ন।

স্বরগুলি দুটিভাগে বিভক্ত—

(ক) প্রাকৃত অথবা শুদ্ধ (খ) বিকৃত।

প্রাকৃত বা শুদ্ধ স্বরের দুটি ভাগ—(ক) চল (খ) ও অচল স্বর। বিকৃতস্বরের দুটি ভাগ—(ক) কোমল ও (খ) তীব্র।

বিকৃতস্বর—শুদ্ধ স্বর থেকে কোন স্বর একটু উচু বা নীচু হলেই তা বিকৃত স্বর হয় অর্থাৎ বা স্বস্থান থেকে বিচ্যুত। 'স র গ ম প ধ ন' একটি সপ্তক হয়। এই সপ্তকে র, গ, ম, ধ, ন এর বিকৃত রূপ আছে। এই বিকৃত স্বরের দুটি রূপ—কোমল ও তীব্র। শুদ্ধ স্বর থেকে অন্ত স্বরটি নীচু হলে বলা হয় কোমল, উচু হলে বলা হয় তীব্র।

চল ও অচল স্বর—যে স্বর কোন অবস্থাতেই বিকৃত হয় না, তাকে

অবিকৃত বা 'অচল' স্বর বলা হয়। একটি সপ্তকের 'স' এবং 'প' অচল স্বর। কারণ এরা স্থানভ্রষ্ট হয় না। অপর পাঁচটি স্বর র গ ম ধ ন নিজের স্থান থেকে বিচ্যুত হয় বলে এগুলিকে 'চল' স্বর বলে।

সপ্তক—তিনটি সপ্তক আছে—মন্দ্র, মধ্য ও তার। এগুলিকে কথ্য ভাষায় বলা হয় 'উদারা', 'মুদারা' ও 'তারা'। স, র, গ, ম, প, ধ, ন, এই সাতটি স্বরকে 'সপ্তক' বলা হয়। নাদের উচ্চতা ও নিম্নতা অনুসারে 'মন্দ্র', 'মধ্য' ও 'তার' এই তিনটি নাদস্থান ধরা হয়। এক একটি সপ্তক হচ্ছে এক একটি নাদ-স্থান। প্রথম সপ্তকটি মন্দ্রস্বর, দ্বিতীয় সপ্তকটি মধ্যস্বর এবং তৃতীয়টি তারস্বর। মন্দ্রস্বর উচ্চারণ কালে হৃদয়, মধ্যস্বর উচ্চারণকালে কণ্ঠ এবং তারস্বর উচ্চারণ কালে তালুর ওপর জোর দেওয়া হয়।

আরোহ—স্বরগুলি ওপরদিকে ক্রমান্বয়ে উঠতে থাকলে তাকে 'আরোহ' বলা হয়। আরোহের সময় স্বরের গতি মন্দ্র থেকে মধ্য এবং মধ্য থেকে তারায় ওঠে।

অবরোহ—স্বরগুলি যদি ওপর থেকে নীচে নামে তাকে 'অবরোহ বলে।'

বর্ণ—গানের ক্রিয়াকে 'বর্ণ' বলা হয়। বর্ণ চার রকম—স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী এবং সঞ্চারী।

স্থায়ী বর্ণ—একটি স্বরকে স্থির রেখে সমস্ত গানের মধ্যে তার প্রয়োগ হলে তাকে 'স্থায়ী বর্ণ' বলে।

আরোহী ও অবরোহী স্বরগুলি যথাক্রমে আরোহণ ও অবরোহণ করলে 'আরোহী' ও 'অবরোহী' বর্ণ বলা হয়।

সঞ্চারী—স্থায়ী, আরোহী ও অবরোহীর সংমিশ্রণ হলে সঞ্চারী বর্ণ বলা হয়।

অলঙ্কার—প্রসন্নাদিযুক্ত বর্ণ সন্দর্ভকে 'অলঙ্কার' বলা হয়। অলঙ্কার সঙ্গীতের শোভা বর্ধন করে। অলঙ্কার দিয়েই তান তৈরী হয়।

ঠাট—ঠাটকে মেল বলা হয়। একটি সপ্তকের বারোটি স্বরের মধ্যে সাতটি স্বরের ক্রমিক রচনাকে 'ঠাট' বলা হয়।

(১) ঠাটে সাতটি স্বরেরই প্রয়োগ হয়।

(২) সাতটি স্বরের রচনা ক্রম অনুসারে হবে।

(৩) ঠাটে রঞ্জকতার প্রয়োজন থাকে না।

(৪) ঠাটের স্বরূপে আরোহের প্রয়োজন হয় না।

(৫) ঠাটে কোমল ও তীব্র স্বর একসঙ্গে ব্যবহৃত হয় না।

(৬) বিভিন্ন রাগের নামে ঠাটের নামকরণ হয়েছে।

(৭) হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে ১০টি ঠাট মানা হয়।—যেমন কল্যান, বিলাবল, খাম্বাজ, ভৈরব, পূর্বী, মারোয়া, কাফী, আশাবরী, ভৈরবী এবং তোড়ী।

রাগ—যে ধ্বনি স্বর ও বর্ণ বিভূষিত এবং মানবের হৃদয় রঞ্জক তাই 'রাগ' বলে অভিহিত হয়। রাগ রচনায় আরোহ, অবরোহ, বাদীস্বর, সম্বাদীস্বর ইত্যাদির প্রয়োগ হয়। স্বরসমূহ দিয়ে রাগের সৃষ্টি। রাগ হৃদয়রঞ্জক হবে এবং এতে কমপক্ষে পাঁচটি স্বর ব্যবহার করতে হবে। বিভিন্ন রাগের পরিচয় পাওয়া যায় ১০টি ঠাটে। মোট এই দশটি ঠাট থেকে বিভিন্ন রাগের উৎপত্তি হয়েছে। রাগের জাতি বিভাগ আছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শুধুমাত্র 'ওঁ' শব্দ থেকে যাবতীয় শব্দের সৃষ্টি হয়েছে এবং এই শব্দ বা নাদ থেকে হৃদয় রঞ্জক সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছে।

মাত্রা—এই নাদ থেকেই মাত্রা, লয় ও তালের সৃষ্টি হয়েছে এবং সমস্ত সঙ্গীতজগত তালের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই 'সঙ্গীতমকরন্দের' রচয়িতা বলেছেন—"গীতং বাদ্যং চ নৃত্যং ভাতি তালে প্রতিষ্ঠিতম্।"

(৪৮ নং শ্লোক) সঙ্গীতমকরন্দ।

আমাদের মাত্রা নির্ণয় করবার একটি পদ্ধতি আছে। কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হওয়া মাত্র তার স্থায়িত্বের দ্বারা আমরা গীতের মাত্রা নির্ণয় করি। শব্দের স্থিতিকালটুকুকে মাপবার মাধ্যম হিসেবে মাত্রার ব্যবহার হয়। অর্থাৎ সময়টুকু সব থেকে ক্ষুদ্রাংশে খণ্ড খণ্ড করে মাত্রার গণনা করা হয়েছে। প্রাচীন নাট্য-শাস্ত্রকার টীকাকার ও সূত্রকাররা পশুপাখীর ডাক থেকে মাত্রা নির্ণয় করেছেন। সূত্রকার সৌনক বলেছেন—নীলকণ্ঠপাখীর ডাক এক মাত্রা, বায়সের ডাক দুই মাত্রা এবং শিখীর ডাক তিন মাত্রা। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, শব্দের স্থায়িত্বকে সবথেকে ক্ষুদ্রাংশে ভাগ করে অথবা শব্দের কণ পরিমাণ অনুসরণ করে মাত্রার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রকাররা শব্দের স্থায়িত্বকে মেপে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে মাত্রার নাম দিয়েছেন। যেমন সঙ্গীত দামোদরের চতুর্থ স্তবকে শুভঙ্কর মাত্রা সম্বন্ধে বলেছেন—"প্লুতগুরুলঘুদ্রুতরূপাশ্চতস্রো মাত্রা ভবন্তি।"

প্লুত, গুরু, লঘু, দ্রুত চার রকমের মাত্রা আছে। প্লুত তিনমাত্রা, গুরু দুই

মাত্রা, লঘু একমাত্রা, দ্রুত অর্ধ মাত্রা। এই ব্যাখ্যার দ্বারা শুভঙ্কর সময়ের ক্ষণটুকু বোঝাতে চেয়েছেন। নারদ মাত্রা সম্বন্ধে বলেছেন—

"লঘ্বক্ষরানাং পঞ্চানাং মানমুচ্চারণে হি তত্।"

অর্থাৎ পাঁচটি অক্ষর উচ্চারণ করতে যে সময় লাগে সেই সময়টুকুকে মাত্রা বলা যেতে পারে। তিনি মাত্রার ক্রিয়া, মার্গ ও দেশীভেদে দু রকম বলেছেন। এক কথায় আমরা বলতে পারি শব্দের স্থায়িত্বকে সবথেকে ক্ষুদ্রাংশে ভাগ করে অথবা শব্দের ক্ষণ পরিমাণ অনুসরণ করে মাত্রার সৃষ্টি হয়েছিল। নারদ মাত্রা সম্বন্ধে বলেছেন, নিমেষকাল অথবা বিদ্যুৎ চমকের কালই হচ্ছে মাত্রা। শারদাতনয় বলেছেন, পাঁচটি লঘু অক্ষর উচ্চারণ করতে যে সময় লাগে তাই মাত্রা, "পঞ্চলঘ্বক্ষরোচ্চারমিতা মাত্রা"। অমর কোষে বলা হয়েছে—"অষ্টাদশনিমেষাস্তু কাষ্ঠা, ত্রিংশত্তু তাঃ কলাঃ"। মুনি ভরতের মতে পাঁচটি নিমেষে একটি মাত্রা। গীতের সময় দুটি কলার অন্তরে পাঁচটি নিমেষ কলান্তর বলে পরিচিত—নিমেষাঃ পঞ্চ বিজ্ঞেয়া গীতকালে কলান্তরম্।"

প্রাচীন তাল—ক্ষণ বা মাত্রানুসারে স্বরের ভেদ নির্ণয় করা হয়েছে। স্বরের সঙ্গে অক্ষরযুক্ত হয়ে গীত, বাদ্য, তাল, বোল প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে। তাল 'ঘন' (কাংস্য তালাদি) শ্রেণীভুক্ত। তালের সঙ্গে কলাপাতের ও লয়ের ঘনিষ্ঠ সংবাদ। মুনি ভরত দুটি প্রধান তালের উল্লেখ করেছেন; যথা—চতরস্র ও ত্র্যস্র। চতরস্রের অন্তর্গত 'চঞ্চতপুট' এবং ত্র্যস্রের অন্তর্গত 'চপপুট।' প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রে তালকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—মার্গ, দেশী, শুদ্ধ, সালগ ও সঙ্কীর্ণ। নারদ প্রভৃতি সঙ্গীত শাস্ত্রকাররা বলেছেন যে, দশটি প্রাণের সংযোগে এই তালের সৃষ্টি।

তালের দশটি প্রাণ—তালের দশটি প্রাণ বলতে তালের বিশেষ বিশেষ গুণ ও কার্য পদ্ধতিকে বলা হয়েছে। এই দশটি প্রাণ হচ্ছে—(১) কাল (২) মার্গ (৩) ক্রিয়া (৪) অঙ্গ (৫) গ্রহ (৬) জাতি (৭) কলা (৮) লয় (৯) যতি ও (১০) প্রস্তার। আচার্য ভরত তালের ২০টি প্রক্রিয়াকেও গণ্য করেছেন। এই বিশটি প্রক্রিয়া হচ্ছে আবাপ, নিষ্ক্রাম, বিক্ষেপ, প্রবেশক, শম্যা, তাল, সন্নিপাত, পরিবর্ত, বস্তু, মাত্রা, বিদারী, অঙ্গুলি, যতি, প্রকরণ, গীত, অবয়ব, মার্গ, পাদভাগ, পদ, পানি। এর মধ্যে কয়েকটি নৃত্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। গীতের অবয়বের নাম 'বস্তু'। পদ ও বর্ণের সমাপ্তির নাম 'বিদারী।' মদ্রক, বর্ধমানাদি

গীতকে প্রস্তুত করার নাম 'প্রকরণ'। গীতের চারিটি ভাগের প্রত্যেকটিকে পাদ ভাগ বলা হয়েছে। যা কিছু অক্ষর দিয়ে তৈরী তাই 'পদ'।

প্রাণ—(১) কাল—'কাল' বলতে সঙ্গীতের নির্দিষ্ট সময় সীমাকে বোঝায়। সঙ্গীত শাস্ত্রকাররা বিভিন্ন ভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন। সঙ্গীত মকরন্দে 'কাল লক্ষণম' এ বলা হয়েছে যে—

উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত পদ্মপত্রশতং সকৃত্।
স কালঃ সুচি সং ভেদাত্তত্ক্ষণস্ত কলং প্রতি।

(সঙ্গীত মকরন্দ—কাললক্ষণম্ শ্লোক-৫২)

একশত পদ্মপত্রকে একটি সূচ দিয়ে ভেদ করলে যে সময়টুকু লাগে তাকেই তিনি 'কাল' বলেছেন। 'কালের' দ্বারা সমস্ত জগতই বাঁধা।

৮টি	ক্ষণে—১ লব		২ ক্রটীতে—১	অনু
৮টি	লবে—১ কাষ্ঠ		২ অনুতে—১	দ্রুত
৮টি	কাষ্ঠায়—১ নিমেষ		২ দ্রুততে—১	লঘু
৮টি	নিমেষ—১ কলা		২ লঘুতে—১	গুরু
২টি	কলায়—১ ক্রটী		২ গুরুতে—১	প্লুত

১০ প্লুততে—১ পল (২½ মিনট কাল)

মার্গ—তাল নির্ধারণ করবার পদ্ধতিকে মার্গ বলা হয়েছে। মাত্রা সংখ্যা এই মার্গের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। নির্দিষ্ট মাত্রাগুলিকে ভাগ করে তার নির্দিষ্ট নামকরণ হয়েছে। মাত্রার দ্বারাই তালের মার্গে পৌছান যায়। সঙ্গীত মকরন্দে ৬টি মার্গের কথা বলা হয়েছে—দক্ষিণী, বার্তিক চিত্রবিচিত্রক, চিত্রতর ও অতিচিত্রতর। চিত্রতরকে লঘু ও দ্রুত ভেদে দু রকম বলা হয়েছে। দক্ষিণ মার্গে ৮ মাত্রা, বার্ত্তিকে ৪ মাত্রা, চিত্রমার্গে ২ মাত্রা। চিত্রতরে অতিচিত্রতরে দ্রুত মাত্রা থাকবে।

ক্রিয়া—তালকে হাতের দ্বারা প্রদর্শন করবার পদ্ধতিকে 'ক্রিয়া' বলা হয়। তালের দুটি ক্রিয়া—মার্গ ও দেশী। মার্গ ক্রিয়া দু রকমের—সশব্দ ও নিঃশব্দ। সশব্দ ও নিঃশব্দের চারটি ভাগ আছে। সশব্দ ক্রিয়া হচ্ছে সম্য, তাল, ধ্রুব ও সন্নিপাত।

নিঃশব্দ ক্রিয়া হচ্ছে আবাপ, নিষ্ক্রাম, বিক্ষেপ ও প্রবেশ।

সশব্দ ক্রিয়া—

সম্য—দক্ষিণ হাতে তাল দেবার পদ্ধতি।

তাল—বাম হাতে তাল দেবার পদ্ধতি।

ধ্রুব—অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্য আঙুলির দ্বারা তুড়ি দিয়ে নমিত করবার পদ্ধতি।

সন্নিপাত—উভয় হাতে তাল দেবার পদ্ধতি।

নিঃশব্দ ক্রিয়া—

আবাপ—উত্তান হাতের আঙুল কুঞ্চনের নিয়মকে 'আবাপ' বলে

নিষ্ক্রাম—অধস্তলের আঙুল গুলোকে প্রসারিত করবার নিয়মকে 'নিষ্ক্রাম' বলে।

বিক্ষেপ—উত্তান হাতের বিস্তৃত আঙুলগুলি দক্ষিণে স্থাপন করবার নিয়মকে '...ক্ষেপ' বলা হয়।

প্রবেশ—আঙুলগুলি পুনরায় সংকোচন করার নিয়মকে 'প্রবেশ' বলা হয়।

...শেষী ক্রিয়ায় ধ্রুবকা, সর্পিনী, কৃষ্ণা, পদ্মিনী, বিসর্পিকা, বিক্ষিপ্তা, পতাকা ও পতিতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার করপাতনের দ্বারা এগুলি নির্ণয় করা হয়; যথা—'ধ্রুব' ছোটিকার (তুড়ি) দ্বারা প্রদর্শিত হয়।

'সর্পিনী' ও 'কৃষ্ণা' হচ্ছে যথাক্রমে বামগামিনী ও দক্ষিণগামিনী। 'পদ্মিনী' 'বিসর্পিকা' হচ্ছে যথাক্রমে 'অধোগতা ও বহির্গতা।' 'বিক্ষিপ্তাতে হাতকে' ...ক্ষিপ্ত করা হয়। 'পতাকা' ও 'পতিতা' হচ্ছে যথাক্রমে ঊর্ধ্বগামিনী ও ...রগামিনী।

অঙ্গ—মাত্রার বিভাগকে অঙ্গ বলা হয়েছে। এই অঙ্গ ছয়টি ভাগে বিভক্ত। এক একটি ভাগ নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রার দ্বারা গঠিত। এই ছয়টি অঙ্গ হচ্ছে অনুদ্রুত, দ্রুত, লঘু, গুরু প্লুত ও কাকপদ। অনেকে দবিরাম ও লবিরামকেও অঙ্গের মধ্যে গণ্য করেন। অনুদ্রুতে এক মাত্রা, দ্রুতে দুই মাত্রা, লঘুতে চার মাত্রা, গুরুতে আট মাত্রা, ও প্লুতে বারো মাত্রা ও কাকপদে ১৬ মাত্রা ধরা হয়। পশুপক্ষীর ডাক থেকে এক একটি অঙ্গের মাত্রা নির্ণয় করা হয়েছে। তিত্তির থেকে অনুদ্রুত, চটক থেকে দ্রুত, চাষ থেকে লঘু, বায়স থেকে গুরু ও কুক্কুট থেকে প্লুত মাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রকারেরা কল্পনা করেন যে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান থেকে এদের জন্ম হয়েছিল। অনুদ্রুত বায়ুজাত, দ্রুত জলসম্ভূত, লঘু অগ্নিজাত, গুরু আকাশ সম্ভূত ও প্লুত পৃথিবী থেকে জাত।

ীত দর্পনে যে সাতটি অঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মাত্রা এইভাবে নিরূপণ করা হয়েছে, লঘুতে এক মাত্রা ; এর অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন পার্বতী। গুরুতে ২ মাত্রা ; এর অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন গৌরী ও লক্ষ্মী। প্লুতত্তে তিন্ মাত্রা ; এর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হচ্ছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। দ্রুততে হচ্ছে অর্ধ মাত্রা। এর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হচ্ছেন শম্ভু। অনুদ্রুত হচ্ছে আধমাত্রার সিকিমাত্রা। এর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হচ্ছেন চন্দ্রদেব। দ্রুতের ওপর মাত্রা দিলে দবিরাম। দবিরামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হলেন কার্তিকেয়। লঘুর ওপর মাত্রা দিলে লবিরাম। এর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বৃহস্পতি।

গ্রহ—তালের এক আবর্তনের ভেতর যেখান থেকে সংগীতের আরম্ভ হয় তাকে 'গ্রহ' বলে। মুখ্যতঃ চারটি গ্রহ আছে ;—সম, বিষম, অনাগত অতীত। অনেক শাস্ত্রকার আবার অতীত, অনাগতকে বিষমের অন্ত করেছেন।

সম—সমকালে সমপাণিতে গীত অথবা নৃত্য আরম্ভ হলে তাকে 'সমগ্রহ' বলে।

বিষম—আদি ও অন্তের অনিয়ম হ'লে তাকে 'বিষম' বলে।

অতীত—গীত প্রভৃতির পূর্বে তাল প্রবৃত্তি হলে তাকে অতীত বলা হয়।

অনাগত বা অনাঘাত—সঙ্গীত প্রভৃতি আরম্ভ হবার পরে তাল প্রবৃত্তি হলে তাকে অনাগত বলে। গ্রহভেদে তালকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা— 'তাল' 'বিতাল' 'অনুতাল' ও 'প্রতিতাল'। 'সম' থেকে তাল, অতীত থেকে বিতাল, অনাগত থেকে অনুতাল এবং 'বিষম' থেকে প্রতিতালের উদ্ভব হয়েছে।

জাতি—মাত্রার তারতম্যে তাল প্রবৃত্তির পরিবর্তনকে জাতি বলা হয়। জাতি পাঁচ প্রকার—চতরস্র, ত্র্যস্র, খণ্ড, মিশ্র ও সঙ্কীর্ণ। মানুষের জাতি ভেদের মত তালেরও জাতিভেদ নির্ণয় করা হয়েছে। চতুর্মাত্রিক হলে 'চতরস্র' জাতি এবং ব্রাহ্মণজাতীয়। ত্রিমাত্রিক হলে 'ত্র্যস্র' জাতি এবং ক্ষত্রিয় জাতীয়। পঞ্চ-মাত্রিক হলে 'খণ্ড' জাতি হয় এবং বৈশ্য জাতীয়। নবমাত্রিক হলে 'সঙ্কীর্ণ' জাতি এবং সঙ্কীর্ণ জাতীয় হয়।

কলা—সাধারণত মাত্রার অপর নাম কলাপাত বলা যেতে পারে। বলা হয়েছে আটটি নিমেষে একটি কলা। অর্থাৎ আটটি নিমেষে যে সময়টুকু অতি বাহিত হয় তাকে 'কলা' বলা যায়। সঙ্গীত শাস্ত্রকার নারদের মতে কলার

আটটি ভাগ আছে। যথা—ধ্রুবকা, সর্পিনী, কৃষ্ণা, পদ্মিনী, বিসর্জিতা, বিক্ষিপ্তা, পতাকা, পতিতা। কিন্তু আচার্য ভরতের মতে কলা তিন রকমের। যথা - চিত্রা বৃত্তি ও দক্ষিণা। চিত্রায় ২ মাত্রা, বৃত্তিতে ৪ মাত্রা ও দক্ষিণায় ৮ মাত্রা।

লয়—ক্রিয়ার অন্তর যে বিশ্রান্তি তাকে 'লয়' বলে। শার্ঙ্গদেব বলেছেন—"ক্রিয়ান্তর—বিশ্রান্তির্লয়ঃ।" অর্থাৎ কাল বা সময়ের অন্তরের নাম 'লয়'। অমরকোষে বলা হয়েছে—"তালঃ কালক্রিয়ামানং লয়ঃ সাম্যমথাস্ত্রিয়াম্। তাল কাল ও ক্রিয়া এই তিনটির ভেতর লয় সমতা রক্ষা করে। এক কথায় বলা যেতে পারে গীতের গতির সমতা রক্ষা করাকে লয় বলে। লয় তিন প্রকার 'বিলম্বিত', 'মধ্য' ও 'দ্রুত'। তালের গতি অতি ধীরে হলে বিলম্বিত, অপেক্ষাকৃত দ্রুত হ'লে 'মধ্যলয়' এবং তার থেকেও দ্রুত হ'লে 'দ্রুত' লয় হয়।

যতি—তালের পদকে বিভিন্ন ছন্দে গ্রথিত করার নিয়ম বা পদ্ধতি হল 'যতি'। মুনি ভরত অবশ্য বিরামস্থানকে যতি বলেছেন। নৃত্যের বোলগুলি যতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই বোলগুলি যতি সহকারে উচ্চারিত হয়ে লয়কে নিয়ন্ত্রিত করে। শার্ঙ্গদেব বলেছেন—লয়প্রকৃতিনিয়মোযতিরিত্যভিধীয়তে। মুনি ভরত তিন রকম যতির উল্লেখ করেছেন—সমা, স্রোতোগতা ও গোপুচ্ছা। পরবর্তী নাট্যশাস্ত্রকাররা আরও দুরকম যতির উল্লেখ করেছেন—মৃদঙ্গা ও পিপীলিকা।

সমা—আদি, মধ্য ও অন্তে সমান লয় থাকলে 'সমা' হয়।

স্রোতোগতা—আদিতে বিলম্বিত, মধ্যে ও অন্তে দ্রুত লয় থাকলে তা স্রোতোগতা হয়।

মৃদঙ্গা—আদি ও অন্তে দ্রুত ও মধ্যে বিলম্বিত হলে 'মৃদঙ্গা' হয়। অন্যমতে আদি ও অন্তে দ্রুত, মধ্যে মধ্য ও দ্রুতলয়ের মিশ্রণ হলে 'মৃদঙ্গা' হয়।

পিপীলিকা—আদি ও অন্তে মধ্য এবং মধ্যে বিলম্বিত হলে 'পিপীলিকা' হয়।

গোপুচ্ছা—আদিতে দ্রুত, মধ্যে মধ্য ও অন্তে বিলম্বিত হ'লে গোপুচ্ছা হয়।

প্রস্তার—এর অর্থ হচ্ছে তালের বিস্তার। প্রস্তারের সময় তালের প্রকৃত ছন্দ, মার্গ, কলা, মাত্রা, অঙ্গ প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটে।

প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রকাররা জীবনের সঙ্গে সঙ্গীতের একটি সাদৃশ্য খুঁজেছিলেন।

শুধু এতেই তাঁরা তৃপ্ত হন নি। ধার্মিক নাট্যশাস্ত্রকাররা সঙ্গীতের ভেতর দেবতাদের অবস্থানও কল্পনা করে নিতেন। তাঁদের মতে নাট্যের জনক শিবের পাঁচটি মুখ বলে তিনি পঞ্চানন। তাঁর এই পাঁচটি মুখ থেকে পাঁচটি মার্গতালের উৎপত্তি হয়েছে। যথা

মুখ	জন্ম	জাতি	বর্ণ	যতি	নাম
পূর্বমুখ	ঋক্‌বেদ	ব্রাহ্মণ	গোক্ষীর	গোপুচ্ছ	চাচ্ছৎপুট অথবা চঞ্চতপুট
দক্ষিণ মুখ	যজুর্বেদ	ক্ষত্রিয়	কুঙ্কুমকেশরী	পিপীলিকা	চাচ্‌পুট
পশ্চিম মুখ	অথর্ববেদ	বৈশ্য	কনকাভ	মুরজা	ষট্‌পিতাপুত্রক
উত্তর মুখ	সামবেদ	তৎপুরুষ	মণিবর্ণ	গান্ধর্ব	সম্পক্বেষ্টিক
উর্দ্ধমুখ	আগম	ঋষি	নীলবর্ণ	সমযতি	উদ্‌ঘট।

প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রগুলিতে দেখা যায় যে, পূর্ব কালে সঙ্গীতে বহু রকম তালের প্রচলন ছিল। এই তালগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হত—মার্গ ও দেশী। মুনি ভরত একশত আটটি দেশী তালের কথা বলেছেন! কিন্তু পরবর্তী শাস্ত্রকাররা আরও অনেক তালের নামকরণ করেছেন। এই তালগুলি হচ্ছে আদিতাল, দ্বিতীয় তাল, তৃতীয় তাল, চতুর্থ তাল, পঞ্চম তাল নিঃশঙ্কলীল, দর্পণ সিংহবিক্রম রতিলীল, সিংহলীল, কন্দর্প, বীরবিক্রম্‌, রঙ্গ, শ্রীরঙ্গ. প্রত্যঙ্গ, যতিলগ্ন, গজলীল, হংসলীল, বর্ণভিন্ন, ত্রিভিন্ন, রাজচূড়ামণি, রঙ্গদ্যোত, রঙ্গ-প্রদীপক, রাজতাল, ত্র্যশ্রবর্ণ, চতুরশ্রবর্ণ, সিংহবিক্রীড়িত, জয়তাল, বনমালী, হংস নাদ, সিংহনাদ, কুড়ুক্ক তাল, তুরঙ্গলীল, সর্ভলীল, ত্রিভঙ্গী, রঙ্গাভরণ, মঠ, মঠ (দ্বিতীয়), মঠ (তৃতীয়), মুদ্রিত মঠক, কোকিলপ্রিয়, নিঃসারুক, রাজবিদ্যাধর জয় মঙ্গল, মল্লিকামোদ, বিজয়ানন্দ. জয়শ্রী, মকরন্দ, কীর্তি, শ্রীকীর্তি, প্রতিতাল বিজয়, বিন্দুমালিনী সম, নন্দন, মণ্ঠিকা, ক্রীড়াতাল, মণ্ঠিকা (দ্বিতীয়), দীপক, উদীক্ষণ. ঢেঙ্কী, বিষম (২য়), কন্দুক, একতালিকা, কুমুদ, (২য়), চতুস্তাল, ডোম্বুলী, অভঙ্গ, রায়বঙ্কোল, বসন্ত, লঘুশেখর, প্রতাপশেখর, ঝম্পাতাল, গজঝম্প, চতুর্মুখ, মদন, প্রতিমণ্ঠক, পার্বতীলোচন, রতিতাল, লীলাতাল, করণযতি, ললিত গারুগি, রাজনারায়ণ, লক্ষ্মীশা, ললিতপ্রিয়, শ্রীনন্দন, জনক, বর্ধন, রাগবর্ধন, ষট্‌তাল, অন্তরক্রীড়া, হংস, উৎসব, বিলোকিত, গজ, বর্ণযতি, সিংহ. করুণ, সারস, খণ্ডতাল, চন্দ্রকলা, লয়. স্কন্দ, অড্ডতালী, ধত্তা, দ্বন্দ্ব, মুকুন্দ, কুবিন্দুক,

কলধ্বনি, গৌরী, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ, ভগ্নতাল, রাজমৃগাঙ্ক, রাজমার্তণ্ড, নিঃশঙ্ক, শার্ঙ্গদেব, চর্চরী, মিশ্রবর্ণ, সিংহনন্দন।

এক একটি বিশেষ তাল বিভিন্ন মত অনুযায়ী বিভিন্নভাবে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। কতকগুলি দেশী তালের নাম তবলার ঠেকার সঙ্গে নীচে দেওয়া হল।

	মাত্রা	তালী
পটতাল—	৮	২
মহেশতাল—	৯	৩
করালমঞ্চ—	৫	৩
লঘুশেখর—	৭	২
শঙ্খতাল—	১০	৫
ঝম্পা—	১০	৩
বিশ্বতাল—	১৩	৯
শিখর তাল	১৭	৪

পটতাল—

+ ২
ধা ত্রেকে ধিন না | ধা ধিন ধাগে ত্রেকে

মহেশতাল—

+ ২ ৩
ধিন ধিন ধা ত্রেকে | ধিন না | ধিন ধাগে ত্রেকে

করালমঞ্চ—

+ ২ ৩
ধা | ধিন — | ধা ত্রেকে |

লঘুশেখর—

+ ২
ধিন ধিন ধা ত্রেকে | ধিন ধিন না |

শঙ্খতাল—

+ ২ ৩ ৪ ৫
ধিন | ধিন | ধা ত্রেকে থুন না | ধিন | ধাগে ত্রেকে থুনা

ঝম্পা—

+ ২ ৩
ধিন্ ধিন্ ধা | ধিন ধিন না | ধিন ধিন ধাগে ত্রেকে

বিশ্বতাল—

+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
ধা— | ধিন— | ধা | ধা | ধিন— | ধা | ধা | ধিন | ধাগে ত্রেকে |

শিখর তাল

+ ২
ধিন ধা ত্রেকে তিন না | ধিন ধিন ধা ত্রেকে তিন না |
৩ ৪
ক তা | ধিন ধিন ধাগে ত্রেকে

মাত্রা তালী

×
মতান্তরে— ধা ত্রক ধিন নক থুন গা |
২ ৩
ধিন নক ধুম কিট তক ধেৎ | ধা ডিট | কত গদি ঘন |

শঙ্কর তাল— ১১ ৯
+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
ধা | ধিন— | ধা | ধা | ধিন— | ধা | ধেনে | নাগ | তেটে

মাত্রানুসারে উত্তর ভারতীয় ও দেশী তালের নাম দেওয়া হল।

নাম	মাত্রা	তালী
দাদরা	৬,	তালী ১ খালি ১,

+ ০
ঠেকা ধা ধিন না | না তিন না |

তেওড়া— ৭,
+ ২ ৩
ঠেকা ধা দেন তা | ধা ধা | দেন্ ত, |

রূপক— ৭, ২ তালী, ১ খালি।

রূপক তালের প্রথম মাত্রায় খালি দেখানো হয়

০ ১ ২
ঠেকা তি তি না | ধি না | ধি না |

ধুমালী— ৮, ৩ তালী, ১ খালি,
+ ২ ০ ৩
ঠেকা—ধা ধিন | ধা তিন | না তিন | ধাগে তেরেকেটে।

কাহারওয়া ৮ ১ তালী ১ খালি
+ ০
ঠেকা ধা গে না গে | না গে ধি ন।

ঝাঁপতাল— ১০, ৩ তালী ১ খালি,
ঠেকা— + ২ ০ ৩
ধি না | ধি ধি না | তি না | ধি ধি না।

শূলতাল— ১০ ৩ তালী, ২ খালি,
বা + ০ ২ ৩ ০
সুরফাঁক তাল— ধা ধেনে | নাগ দি | ধেনে নাগ | গ দি | ধেনে নাগ।

নাম মাত্রা তালী

শক্তি তাল— ১০, ৭

+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

ঠেকা— ধা— | ধিন | ধা — | ধিন | ধাগে | ত্রেকে | ধুন — ।

কুম্ভ— ১১, ৮ তালী, ৩ খালি,

+ ০ ২ ৩ ৪ ০ ৫ ৬ ৭ ৮ ০

ঠেকা— ধা | ধিন | তিট | কত | ধা | ধিন | নক | তিট | কত | গদি | গন

চন্দ্রমণি— ১১, ৪

+ ২ ৩ ৪

ধা — | ধিন — — | ধা ধা ধিন ধিন — | ধা |

একতাল— ১২ ৪ তালী ২ খালি

+ ০ ২ ০ ৩

ঠেকা— ধিন ধিন | ধাগে তেরেকেটে | তু না | কৎ তা | ধাগে তেরেকেটে

৪

ধিন না ।

পুরোন মতে

+ ২ ০

ধিন ধিন ধাগে । তেরেকেটে তু না | কৎ তা ধাগে |

৩

তেরেকেটে ধিন না ।

পুরোন ত্রিমাত্রিক ছন্দে ৩টি তাল ও ১টি খালির প্রয়োগ হয় ।

চৌতাল— ১২ ৪ তালি ২ খালি

+ ০ ২ ০ ৩

ঠেকা— ধা ধা | দেন তা | কৎ তাগে | দেন তা | কেটে কতা |

৪

গদি ঘেনে |

জয়মঙ্গল— ১৩, ৯

+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

ঠেকা— ধা ধা | ক্রে ধা | কিট কত | গেনা | গেনা | গেনা ৭

৮ ৯

ধা | দেন | ত

নাম	মাত্রা	তালী
ঝুমরা—	১৪,	৩ তালী ১ খালি,

ঠেকা—ধিন ধা তেরেকেটে | ধিন ধিন ধাগে তেরেকেটে | তিন তা তেরেকেটে
৪
ধিন ধিন ধাগে তেরেকেটে |

ধামার—	১৪,	৩ তালী ১খালি

+ ২ ০ ৪
(১ম পদ্ধতি) ঠেকা—কৎ ধে টে ধে টে | ধা— | গ দি নে | তি নে তা আ |
+ ২ ০ ৩ ৪
(২য় পদ্ধতি)—কৎ ধে টে | ধে টে | ধা— | গ দি নে | তি নে তা— |
এই পদ্ধতিতে ৫টি বিভাগ।

আড়া চৌতাল—	১৪	৪ তালী ৩ খালি,

+ ২ ০ ৩ ০
ঠেকা—ধিন তেরেকেটে | ধিন না | তু না | কত্তা | তেরেকেটে ধিন |
৪ ০
না ধিন | ধিন না

১৪

দীপচন্দী + ২ ০ ৩
ঠেকা— ধা ধিন — | ধা গে তিন — | তা তিন — | ধা ধা ধিন —

কার দোস্ত—	১৪	৫

+ ২ ৩ ৪
ঠেকা—ধিন ধিন ধা ত্রেকে | তু না ক ত্তা | ধাত্রে কেধি | নাক ধাত্রে |
৫
কেধি নাক্

পঞ্চম সওয়ারী—	১৫	৩ তালী খালি,

+ ২ ০
ঠেকা—ধি না ধিধি | কৎ ধিধি নাধি ধিনা | তিক্রে তিন্না তেরেকেটে
৩
তিন্না | ধাকৎ ধিধি নাধি ধিনা |

পঞ্চম সওয়ারী—	১২	৫টি তালী ১ খালী

অন্যমতে

১ ২ ০

ধা ধিন ধাগে নাগে | তিক্রে তিন্না তিন্না তিন্না | কৎতা ধিধি

৪ ৫

নাধি ধিনা | ধাগে ধিন্না | ধাতিৎ |

চন্দ্রকলা— ১৫ ৬

ধা ধিন | তা দেৎ | দেৎ তিট | কতা থুন থুন | থুন ক্রাং — |
তিট গদি গিন | (প্রাচীন শাস্ত্রকারদের মতে চন্দ্রকলা ৬৪ মাত্রা)

জগঝম্পা— ১৫ ৪

\+ ২ ৩ ৪

ধা ধিন না থুন না ক তা | ধিন ধিন | ধা তেরেকেটে | ধিন ত্রেকে ধি না |

\+ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

ব্রহ্মযোগ— ১৫ ১০

ধিন না | ধিন | ধাগে ত্রেকে | ধিন | ধিন | ধাগে ত্রেকে |
ধিন | না | ধিন | ধাগে ত্রেকে থুনা |

ঐন্দ্রতাল— ১৫ ৫

১ ২ ৩ ৪

ধিন ধিন ধা ত্রেকে | ধিন ধিন ধা ত্রেকে | ধিন ধ | ত্রেকে তিন |

৫

ধিন ধাগে ত্রেকে |

তিনতাল— ১৬ ৩ তালী ১ খালি

\+ ২ ০ ৩

ধা ধিন ধিন ধা | ধা ধিন ধিন ধা | না তিন তিন না | তেটে ধিন ধিন ধা

ব৺ারী সওয়ারী— ১৬ ৪টি তালী ৪ খালি

ধিন ধা | ধিন ধিন | ধা ধিনধিন | ধাধিন ধিনধা | তিনতেরেকেটে তিন |

× ০ ২ ০ ৩

তিনা তিনা | কৎতা ধিনধিন | ধাধিন ধিনধা |

০ ০

বীরপঞ্চ— ১৬ ৬

\+ ২ ৩ ৪ ৫

ধা ত্রেকে ধি না | ধিন না | ধা ত্রেকে | ধি গ ধি না | ধিন ধিন

৬

ধাগে ত্রেকে |

শিখর—　　　　　১৭　৫টি তালী (মতান্তরে ৩ তালী ১ খালি)

১　　　২　　　৩　　　৪　　　৫
ধা ত্রক ধিন নগ। থুং গা ধিন নগ। ধুম কিট তক। তিধ্‌, তা। তিট কতা
গদি ঘেনে।

চূড়ামণি—　　　　　১৭　　　　　৫

+　　২　　৩　　৪　　৫
ধা ক ত। তু ন্না। ধি ধি না ত্রক। না ধি ধি না। ধি ত্রক ধি না।

বিষ্ণু—　　　　　১৭　　　　　৬

+　　২　　৩　　৪　　৫
ধা—ধিন না। ধা ত্রেকে। ধা ধা ধিন না। ধা ত্রেকে। ধিন—।
৬
ধিন ধাগে ত্রেকে।

বসন্ত—　　　　　১৮　　　　　৬

×　２　৩　৪
ঠেকা—ধু ম। কি ট। ধু ম। কি ট ত ক। ধুম কিট। তক ধা তা

লক্ষ্মী—　　　　　১৫

+　২　৩　　৪　৫　৬
ঠেকা—ধিন। ধা। তেরেকেটে তিন। ধিন। তেরেকেটে। ধাধা তিন।
৭　৮　৯　১০　১১　১২　১৩
ধাধা। তেরেকেটে। ধিন। ধা। ধিন। ধাগে। তেরেকেটে।
১৪　১৫
ধিন। ধাগে তেরেকেটে।

সরস্বতী—　　　　　১৮　　　　　৫

×　　২　３　　৪
ঠেকা—ধা ঃ ধি ন্না। ধে ন। কি ট ধে ন। ধা গে তি ট।

ধা গে তু ন্না।

মত্তভাল—　　　　　১৮　　　　　৬

×　০　২　৩　০　৪　৫　৬
ঠেকা—ধা ঃ। ধিঃ ড়। ন ক। ধি ড়। ন ক। তি ট। ক তা। গ দি।

ঘে নে।

ত্রিবেণী—১৯ মাত্রা ৭ খালি

+ ০ ২ ৩ ০ ৪ ০ ৫ ০ ৬ ০ ৭ ৮
ঠেকা—ধা | ধা | ধি | ট | ধি | ট | ধু | ম | কি | ট | ত | ক | ধা |
৯ ১০ ০ ১১ ১২ ০
তি | ট | ক | ত | ধে | ত্তা |

অর্জুন— ২০ মাত্রা ৭ তালী

+ ২ ৩ ৪
ঠেকা | ধা—তেরে কেটে | ধি না | ধা—ধি না | ধাগে ত্রেকে
৫ ৬ ৭
ধিন— | ধা—থু না | তেরে কেটে |

গণেশ— ২১ মাত্রা ১০ তালী

+ ১ ৩ ৪ ৫
ঠেকা—ধা—কি ট | ত | ধা—কি ট | ত | ক |
৬ ৭ ৮ ৯ ১০
গ দি ঘে নে | ধিন | ধা | ত | ক ঘে নে

অষ্টমঙ্গল— ২২ মাত্রা ৮ তালী

১ ২ ৩ ৪
ঠেকা—ধা—কি ট | ত ক | ধু মা কি ট | ত ক |
৫ ৬ ৭ ৮
ধে—ত্তা— | ত ক | গ দি | গ ন |

কুসুমাকর— ২৭ মাত্রা ৫ তালী

+ ২
ঠেকা—ধিন ধিন না | ধা ধা ত্রক ধিন ত্রক থুন না |
০ ৩
তিন তি ট | ধিন তক ধুম কিট তক ধিত |
৪ ৫
তক গদি গিন | তু না কত গদি গিন |

ব্রহ্মতাল— ২৮ মাত্রা ১০ তালী

+ ০ ২ ৩ ০
ঠেকা—ধা ধিন | ধিন তা | তেটে ধা | তেটে ধা | ধিন তা |
৪ ৫ ৬ ০ ৭
ধা দেৎ | ধাগে তেটে | গদি ঘেনে | তা দেৎ | ঘেঘে তেটে
৮ ৯ ১০ ০
গদি ঘেনে | ধাগে তেটে | গদি ঘেনে | তা দেৎ

	মাত্রা	তালী
রুদ্রতাল	১১	৮

ঠেকা :— ধা তৎ | ধা | তিরকিট | ধি না | তিরকিট | তু না ¦ তৎ তা |

নৃত্যের অথবা আনদ্ধ যন্ত্রের ঠেকা, তোড়া টুকরা ইত্যাদিকে মাত্রা, বিভাগ, তাল, খালি ইত্যাদি সহকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। এই লিপিবদ্ধ করাকে 'তাললিপি' বলে। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতে দু রকম তাললিপি ব্যবহৃত হয়— 'ভাতখণ্ডে' পদ্ধতি ও বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতি।

ভাতখণ্ডে পদ্ধতি :—

মাত্রার চিহ্ন='‿', খালি বা ফাঁকের চিহ্ন—'O', বিভাগের চিহ্ন='।', ১ মাত্রার বিরতির চিহ্ন='S' অথবা '—'।

যখন কোন বোল বা তবলার ঠেকা লিপিবদ্ধ করা হয়, তখন বর্ণের ওপরে মাত্রা গণনার সংখ্যা এবং নীচে সম, খালি প্রভৃতি তালের চিহ্ন দেওয়া হয়।

একটি মাত্রায় ১টি অক্ষর ব্যবহৃত হয় এবং তার কোন চিহ্ন থাকে না; যেমন :—

ধা ধি না না তি না

এক মাত্রায় ১টির বেশী অক্ষর থাকলে অক্ষরের নীচে রেখা টানতে হয়; যেমন :—

ধাধি নানা তিনা

বিনা অক্ষরে মাত্রার স্থায়িত্বকাল বোঝালে 'S' এই চিহ্ন অথবা '—' চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়;

যেমন :—

ধা — ধি — না —

অথবা

ধা S ধি S না S।

এই পদ্ধতিতে সমের চিহ্ন— × ; খালি বা ফাঁকের চিহ্ন—O ; বিভাগের চিহ্ন—। ঠেকার সম ছাড়া অন্যান্য তালগুলিতে মাত্রা সংখ্যা লিখতে হয়। যেমন :

১	২	৩	৪
ধা	ধিন	ধিন	ধা
×			

৬ ৭ ৮

·ধা ধিন ধিন ধা
৫

৯ ১০ ১১ ১২

না তিন তিন তা
•

১৩ ১৪ ১৫ ১৬

তেটে ধিন ধিন ধা।

১৩

বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতি—এই পদ্ধতি একটু জটিল। কারণ এই পদ্ধতিতে এক মাত্রা, অর্দ্ধমাত্রা, সিকি মাত্রা ইত্যাদির চিহ্ন দেওয়া হয়। 'সমে' ১ এবং খালি বা ফাঁকে '+' এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। সম বা ফাঁক ছাড়া যেখানে তাল আছে সেখানে মাত্রার সংখ্যাটি লিখে চিহ্নিত করতে হয়।

চিহ্ন—সম='১, খালি বা ফাঁক='+', অর্দ্ধ মাত্রা='•', সিকি মাত্রা= '‿'। অন্যান্য তাল সংখ্যায় মাত্রার সংখ্যা বসাতে হবে। ২ মাত্রার চিহ্ন= S, একমাত্রা=—, ১ এর মধ্যে ৮ হলে=‿‿ ইত্যাদি।

উদাহরণ— ধা ধিন ধিন ধা ধা ধিন ধিন ধা
১ •• •• ' ৫ •• ••

না তিন তিন তা তেটে ধিন ধিন ধা
+ •• •• ১৩ •• ••

এই পদ্ধতিতে বিভাগের কোন চিহ্ন দেওয়া হয় না। দুটি পদ্ধতির মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ভাতখণ্ডে পদ্ধতিতে তাল বিভাগের চিহ্ন দেওয়া হয়। বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতিতে তাল বিভাগের চিহ্ন দেওয়া হয় না। ভাতখণ্ডে পদ্ধতিতে মাত্রা সংখ্যা ওপরে চিহ্নিত করা হয়; বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতিতে মাত্রার সংখ্যা যে তালের ওপর পড়ে সেই তালের ওপর শুধু সেই মাত্রা সংখ্যাটি লেখা হয়। ভাতখণ্ডে পদ্ধতিতে মাত্রা সংখ্যাগুলি ওপরে লেখা হয় এবং বিষ্ণুদিগম্বর পদ্ধতিতে নীচে তালের চিহ্ন ও তালের সংখ্যা লেখা হয়।

প্রাচীনকালে মাত্রার চিহ্ন এইরকম ছিল—

এক কলা—ৎ চতুষ্কলা—ৎ ৎ ৎ ৎ ইত্যাদি

দ্বি কলা—ৎ ৎ 'কলা অর্থে এখানে মাত্রা বোঝাচ্ছে।

চতুষ্কলা চচ্চতপুট—ৎ ৎ ৎ ৎ, ৎ ৎ ৎ ৎ, ৎ ৎ ৎ ৎ, ৎ ৎ ৎ ৎ

দ্বিকলা চচ্চতপুট—ৎ ৎ, ৎ ৎ, ৎ ৎ, ৎ ৎ

হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটক পদ্ধতির তালের প্রভেদ—

হিন্দুস্থানী তালের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় তালের একটি বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে মাত্রার সংখ্যা অনুসারে তালের নাম নির্ধারিত হয় এবং সেই মাত্রা সমষ্টির তবলায় নির্দিষ্ট ঠেকা থাকে। যেমন ত্রিতাল বলতে ১৬ মাত্রাই হবে। সেখানে যদি ১৭ অথবা ততোধিক মাত্রা বেশী হয়ে যায় তবে সেই তালটি ভুল বলে প্রতিপন্ন হবে। কিন্তু কর্ণাটক পদ্ধতিতে জাতি হিসেবে তালের মাত্রা নির্ধারিত হয়। যেমন চতরস্র জাতিতে একটি তাল ৪ মাত্রার হতে পারে এবং সেই একই তাল তিস্র জাতিতে ৩ মাত্রা অথবা খণ্ড জাতিতে ৫ মাত্রার হতে পারে। কর্ণাটক পদ্ধতিতে তালের চিহ্ন নির্ধারিত আছে। সেই চিহ্ন অনুযায়ী মাত্রা ব্যবহৃত হয়। তবে কয়েকটি তালের মাত্রার পরিবর্তন হয় না; যেমন আদি তালে সব সময়ই ৮ মাত্রা থাকে। অথবা 'চাপু' সব সময়ই ৭ মাত্রার হয়ে থাকে। প্রাচীন গুরুরা বলেন, প্রাচীন কালে কর্ণাটক তাল পদ্ধতিতে ১০৮টি তালের প্রচলন ছিল। এই ১০৮টি তালকে 'অষ্টোত্তরশত তালম' বলা হত। কালক্রমে ৫৬ টি তাল অবশিষ্ট ছিল। এই ৫৬টি তালকে 'অপূর্ব তালম' বলা হত। অবশেষে অন্য তালগুলি অবলুপ্ত হলে মাত্র সাতটি তালের প্রচলন হয়। এই সাতটি তাল 'সপ্ততালম' নামে পরিচিত। পাঁচটি জাতিতেই সাতটি তালের মাত্রার পরিবর্তন হয়। কর্ণাটক পদ্ধতি অনুসারে অনুদ্রুততে ১ মাত্রা, দ্রুততে ২ মাত্রা, গুরুতে ৮ মাত্রা, প্লুততে ১২ মাত্রা এবং কাকপদে ১৬ মাত্রা। এই পদ্ধতিতে শুধুমাত্র দ্রুত, অনুদ্রুত ব্যবহৃত হয় এবং লঘু চিহ্নতে জাতি অনুসারে মাত্রার তারতম্য ঘটে।

'সপ্ততালমে' সাতটি তালের সমাবেশ হয়েছে। এই সাতটি তাল হচ্ছে ধ্রুবম, মতম, রূপকম, ঝম্পা, ত্রিপুট, অঠ ও একম্। এই নামগুলি অপভ্রংশ হয়ে ভিন্ন নাম নিয়েছে। তালের অঙ্গের চিহ্নগুলি নিম্নরূপ—

লঘু ।, দ্রুত—o' অনুদ্রুত—‿

সপ্ত তালমের একটি নক্সা দেওয়া হ'ল।

শুদ্ধানাম	অপভ্রংশ	জাতি	মাত্রার চিহ্ন	মৃদঙ্গের ঠেকা
১। ধ্রুবম্	তুরুবম্	ত্রিস্র	।০॥=১১	তাকিট। তাকা তাকিটা তাকিট।
"	"	চতরস্র	।০॥=১৪	তাকাদিমি তাকা তাকাদিমি তাকাদিমি।
"	"	খণ্ড	।০॥=১৭	তাকিটাতাকা তাকা তাকিটাতাকা তাকিটাতাকা।
"	"	মিশ্র	।০॥=২৩	তাকাধিমিতাকিটা তাকা তাকাধিমিতাকিটা তাকাধিমিতাকিটা।
"	"	সঙ্কীর্ণ	।০॥=২৯	তাকাতাকিটাতাকাধিমি তাকা তাকাতাকিটাতাকাধিমি তাকাতাকিটাতাকাধিমি
২। মতম	মট্টিয়ম	ত্রিস্র	।০।= ৮	তাকিটা তাকা তাকিটা।
"	"	চতরস্র	।০।=১০	তাধাধিমি তাকা তাকাধিমি।
"	"	খণ্ড	।০।=১২	তাকাতাকিটা তাকা তাকাতাকিটা।
"	"	মিত্রম	।০।=১৬	তাকাধিমিতাকিটা তাকা তাকাধিমিতাকিটা।
"	"	সঙ্কীর্ণম	।০।=২০	তাকাধিমিতাকাতাকিট তাকা তাকাধিমিতাকাতাকিট।
৩। রূপকম	রূপকম্	ত্রিস্র	০।= ৫	তাকা তাকিট।
"	"	চতরস্র	০।= ৬	তাকা তাকাধিমি।
"	"	খণ্ড	০।= ৭	তাকা তাকিটাতাকা।
"	"	মিশ্রম	০।= ৯	তাকা তাকিটাতাকাধিমি।
"	"	সঙ্কীর্ণম	০।=১১	তাকা তাকিটাতাকাতাকাধিমি।
৪। ঝম্পা	ঝম্পা	ত্রিস্রম	।◡০= ৬	তাকিটা তা কিটা।
"	"	চতুরস্র	।◡০= ৭	তাকাধিমি তা কিটা।
"	"	খণ্ডম	।◡০= ৮	তাকাতাকিটা তা কিটা।
"	"	মিশ্রম	।◡০=১০	তাকিটাতাকাধিমি তা কিটা।
"	"	সঙ্কীর্ণম	।U০=১২	তাকিটাতাকাতাকাধিমি তাকি টা।

শুদ্ধনাম	অপভ্রংশ	জাতি	মাত্রার চিহ্ন	মৃদঙ্গের ঠেকা
৫। ত্রিপুট	তিরুপুডাই	তিস্র	। ০=৭	তাকিটা তাকা ধিমি
”	”	চতরস্র	।০০=৮	তাকাধিমি তাকা ধিমি
”	”	খণ্ড	।০০=৯	তাকাতাকিটা তাকা ধিমি
”	”	মিশ্রম	।০০=১১	তাকাধিমিতাকিটা তাকা ধিমি
”	”	সঙ্কীর্ণম	।০০=১৩	তাকাধিমিতাকাতাকিটা তাকা ধিমি
৬। অঠ	অড্ড	তিস্র	।।০০=১০	তাকিটা তাকিটা তাকা ধিমি
”	”	চতুরস্র	।।০০=১২	তাকাধিমি তাকাধিমি তাকা ধিমি
”	”	খণ্ড	।।০০=১৪	তাকাতাকিটা তাকাতাকিটা তাকা ধিমি।
”	”	মিশ্র	।।০০=১৮	তাকাধিমিতাকিটা তাকাধিমিতাকিটা তাকা ধিমি।
”	”	সঙ্কীর্ণ	।।০০=২২	তাকাধিমিতাকাতাকিটা তাকাধিমিতাকাতাকিটা তাকাধিমি
৭। একম্	একম	তিস্র	।=৩	তাকিটা
”	”	চতুরস্র	।=৪	তাকাধিমি
”	”	খণ্ডম	।=৫	তাকাতাকিটা
”	”	মিশ্রম	।=৭	তাকাধিমি তাকিটা
”	”	সঙ্কীর্ণম	।=৯	তাকাধিমিতাকাতাকিটা

কথাকলি নৃত্যে ভিন্ন ধরণের তাল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই তালগুলি হচ্ছে চেম্বাড়া অথবা আদি, ঝম্পা, আঠা অথবা আড়ান্দা, পঞ্চারি অথবা রূপক। কথাকলি নৃত্যে তালের চিহ্ন দেওয়া হল—

1 = হাতের আঘাত

0 = আঙুলে কর গোণা।

× = ফাঁকের ইঙ্গিত।

চেম্বাড়া = ৮ মাত্রা

তালের স্বরূপ—1000 | × | ×

চম্পা = ১০ মাত্রা

তালের স্বরূপ—1000000 | × |

আড়ান্দা = ১৪ মাত্রা—10000 | 0000 | × | ×

ত্রিপতা = ৭ মাত্রা

তালের স্বরূপ—100 | × | ×

পঞ্চারি = ৬ মাত্রা

তালের স্বরূপ—1000 | ×

কথাকলি নৃত্যের তালে 'জাতি' হিসেবে মাত্রার পরিবর্তন হয় না। মাত্রা হিসেবে তাল নির্ণয় করা হয়। নৃত্যের সঙ্গে চেণ্ডা বাজান হয়।

মণিপুরী নৃত্য খোলের বোলের সঙ্গে করা হয়। রাজমেলভূষণা তাল ভঙ্গী পারেংএ ব্যবহৃত হয়। রাজমেলভূষণা' ৭ মাত্রার তাল হলেও ২৮ মাত্রায় এর একটি আবর্তন সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু এর বিশেষত্ব এই যে, ৭ মাত্রার পর অথবা ১৪ মাত্রার পরও 'সম' আসতে পারে। নৃত্য শিল্পী ২৮ মাত্রার ঠেকাতে ৭ মাত্রা অথবা ১৪ মাত্রার পর 'সম' দেখাতে পারেন অথবা নৃত্যের সমাপ্তি রেখা টানতে পারেন। এই অবাধ স্বাধীনতাটুকু রক্ষা করবার জন্তেই একে ৭ মাত্রার তাল গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে এই স্বাধীনতাটুকু নেই। অর্থাৎ ১৬ মাত্রার তাল হলে ১৬ মাত্রার পর নির্দিষ্ট তালে সমে আসতে হবে। সম ছাড়া অন্ত কোন তালের ওপর অথবা ৮ মাত্রার পর ঠেকার পুরো আবর্তন শেষ হবার আগে অন্ত যে কোন তালে 'সম' প্রদর্শনও চলতে পারে না। তার কারণ ১৬ মাত্রাকে নির্দিষ্ট ৪টি তালে ভাগ করে প্রত্যেকটি তালের নামকরণ করা হয়েছে। সুতরাং এই তালগুলি অতিক্রম করে 'সমে' আসতে হবে।

'রাজমেলভূষণ' ও 'রাজমেল' তালের ভেতর একটি পার্থক্য আছে। 'রাজমেলভূষণা' ঠেকা ভঙ্গী'অচৌবা' নৃত্যে বাজান হয়ে থাকে। কিন্তু 'রাজমেল' ঠেকা অতি বিলম্বিত লয়ে কীর্তনে বাজান হয়ে থাকে। বড় বড় তালগুলিকে মৈতৈ ভাষায় 'তানজাও' বলা হয়ে থাকে। শুদ্ধ ভাষায় 'তানচাও' বলে। বড় বড় তালগুলির অধিকাংশ হিন্দুস্থানী তালক্রিয়া পদ্ধতি থেকে এসেছে বলে তালগুলির মাত্রার সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে। তালের সেই নির্দিষ্ট আবর্তনের ভেতরই নৃত্য, গীত ও বাদ্যের বোলগুলি সম্পন্ন করতে হয়।

মণিপুরী গুরুরা একতাল থেকেই সমস্ত তালের উৎপত্তি মনে করেন। যেমন অঙ্গপ্রাণের মধ্যে যতগুলি অক্ষরকালই থাকুক না কেন কেবলমাত্র প্রথম অক্ষরেই তালাঘাত হবে। খালি বা ফাঁকের কোন বিভাগ নেই। সেইজন্য মণিপুরী গুরুরা প্রতিটি অঙ্ককেই এক তাল বলেছেন। উদাহরণ স্বরূপ—

	নাম	চিহ্ন	অক্ষরকাল বা বর্ণকাল
(ক)	অনুদ্রুত	U	+ ১
(খ)	দ্রুত	0	+ ১ ২
(গ)	দ্রুতবিরাম	0	+ ১ ২ ৩
(ঘ)	লঘু	।	+ • ১ ২ ৩ ৪
(ঙ)	লঘুবিরাম	।̀	+ • ১ ২ ৩ ৪ ৫
(চ)	গুরু	S	+ • ∘ ∘ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
(ছ)	প্লুত	Ś	+ • • ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২

আবার জাতি প্রাণ হিসাবেও লঘুর আট রকম জাতির উল্লেখ আছে। উদাহরণ স্বরূপ—

	নাম	লঘুরচিহ্ন	অক্ষরকাল বা বর্ণকাল
(ক)	একাকী—	।	+ ১
(খ)	পক্ষিনী—	।	+ ১ ২

		+ ৩
(গ) ত্র্যস্র—	।	১ ২ ৩
		+ ০
(ঘ) চতুরস্র—	।	১ ২ ৩ ৪
		+ ০
(ঙ) খণ্ড—	।	১ ২ ৩ ৪ ৫
		+ ০
(চ) ঋতু—	।	১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
		+ ০
(ছ) মিশ্র—	।	১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
		+ ০ ০
(জ) সংকীর্ণ—	।	১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

আবার মনিপুরী গুরুরা এক তালকে কলাপ্রাণ অনুসারে যথাক্রমে এক কল, দ্বিকল, চতুষ্কল, অষ্টকল ইত্যাদিতে ভাগ করেছেন। মনিপুরে এই কলাপ্রাণের দ্বিকল, চতুষ্কলাদিকে অরাওবা (সময়ের বিস্তার) বলা হয় হয়। উদাহরণ স্বরূপ—

একতাল (তানচপ্)— + ০
১ ২ ৩ ৪ (এককল)

+ ০
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ (দ্বিকল)

অরাওবা +
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

(চতুষ্কল)

মেনকূপ্—ত্র্যস্র জাতি, একতাল— +
১ ২ ৩

+
ধিন্ ধেন তা

মেনকূপ্—ঋতু জাতি, একতাল— ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

+ ০
ধিন্ — তেন্ তা ধিন্ ধেন্

(১) রূপক—২ | ৪=৬ অক্ষরকাল বা বর্ণকাল। রূপক, রূপক পরিমাণ আর তেথাউ রূপক এই তিনটি তালের বিভাগ সমান কিন্তু চলনের গতি অনুযায়ী এগুলির পার্থক্য বোঝা যায়।

(২) তিনতালমচা—২ | ২ | ৩ = ৭ অক্ষর কাল

(৩) দুতিলা তিনতাল—৩ | ২ | ২ = ৭ "

(৪ তেওড়া —৩ | ২ | ২ = ৭ "

(৫) তিনতাল দশকোষ—৩ | ২ | ২ = ৭ "

এই তিনটি তালের বিভাগ এক হওয়া সত্ত্বেও চলনের গতি অনুযায়ী এই তালগুলির পার্থক্য বোঝা যায়।

(৬) দশকোষ—২ | ১ | ২ | ১ | ১ = ৭ অক্ষরকাল

(৭) রাজমেল—৪ | ৩ = ৭ "

অথবা,—৪ | ৩ | ৪ | ৩ = ১৪ "

ভূষণা, মেনগোই, মেলমস্তেক ও মেলতানচপ্ এইগুলি রাজমেল ছন্দের অন্তর্গত।

(৮) যাত্রা রূপক—২ | ৫ = ৭ অক্ষরকাল। এই তালটি প্রায় দ্বিকলে ৪ | ১০ = ১৪ অক্ষরকালে প্রযুক্ত হয়।

(৯) চালী—প্রাচীন পুঁথি 'মৃদঙ্গ সংগ্রহ' প্রভৃতি গ্রন্থানুসারে চালী ৪ অক্ষর কাল হয়। বর্তমানে তিনতাল মেল-এর মত ৪ | ২ | ২ = ৮ অক্ষরকালের বিভাগ অনুযায়ী প্রচলিত।

(১০) তিনতাল অচৌবা —২ | ২ | ৪ = ৮ অক্ষরকাল ৮

(১১) ভঙ্গদশ (ঋতুজাতি)—২ | ৬ = ৮ "

(১২) গজন (গজেন্দ্র) —৩ | ৫ = ৮

(১৩) মদন —২ | ৩ | ৪ = ৯ "

(১৪) মৈতৈ সুরফাঁক —২ | ৪ | ৪ = ১০ "
(রূপক কাঁটা)

(১৫) ময়রাঙ, সুরফাঁক —৪ | ২ | ৪ = ১০ "

(১৬) ঝাঁপতাল —২ | ৫ | ৩ = ১০ "

—২ | ৩ | ২ | ৩ = ১০ "

(রাসে এইরকম বাজান হয়)

—৩ , ৪ | ৩ , ৪ = ১৪ অক্ষরকাল

(নটপালায় এই রকম বাজান হয়)

(১৭) কঙ্কণ —১ | ৩ | ২ | ৫ = ১১ অক্ষরকাল

১৮) তাগ্গাউ (চৌতাল) —৪ | ৪ | ২ | ২ = ১২ অক্ষরকাল

১৯) দর্পণ—২ | ২ | ৮ = ১২ অক্ষরকাল (এইতালটি বীরবিক্রমের অন্তর্গত)

২০) কট্টওয়ালী (সঙ্কীর্ণজাতি)—৩ | ৯ = ১২ অক্ষরকাল

২১) দুই তাল মচা (সঙ্কীর্ণজাতি)—৩ | ৯ = ১২ „

২২) বিদ্যাধর —৩ | ৪ | ২ | ৪ = ১৩ „ অপরমতে, এই তালটিতে ১৪ অক্ষরকাল ও ৬টি বিভাগ হয়।

২৩) ত্রিপুট সওয়ারী —৩ | ৩ | ৮ = ১৪ অক্ষরকাল

২৪) চারতাল —২ | ৪ | ৪ | ৪ = ১৪ „

জয়ন্তা চারতাল, বড় যুগ্গাই, চারতালমেল, তিনতাল চারতাল, জয়দিক (যতি)—এই সব তালগুলির বিভাগ এক হওয়া সত্ত্বেও চলনের গতি অনুযায়ী এগুলির মধ্যে পার্থক্য বোঝা যায়।

২৫) চারতাল অচৌবা —৪ | ৪ | ২ | ৪ = ১৪ অক্ষরকাল

২৬) মাতঙ্গী —৩ | ৪ | ৪ | ৪ = ১৫ „

২৭) তিনতাল পঞ্চম —৪ | ৪ | ২ | ২ | ৪ = ১৬ „

২৮) মকরন্দ —২ | ২ | ৪ | ৪ | ৪ = ১৬ „

২৯) বীরপঞ্চ —৪ | ২ | ২ | ৪ | ২ | ২ = ১৬ „

৩০) জলধিমান —৪ | ৪ | ৮ = ১৬ „

৩১) খুর্জী তাল —১ | ৩ | ১ | ৩ | ২ | ২ | ৪ = ১৬ „

৩২) পঞ্চম —৪ | ৪ | ৪ | ২ | ৪ = ১৮ „

৩৩) লক্ষ্মীতাল —৪ | ৪ | ২ | ৩ | ১ | ২ | ২ = ১৮ „

'মৃদঙ্গ ব্যবস্থা সঙ্গীত' গ্রন্থানুসারে,—২ | ২ | ৪ | ২ | ২ | ৪ | ১ | ২ | ২ | ২
২ | ২ | ২ | ১ | ২ | ৩ = ৩৫

৩৪) দানি (ঋতু জাতি) —৬ | ৩ | ৩ | ৬ = ১৮ অক্ষরকাল

৩৫) সপ্ততাল —২ | ৪ | ২ | ৪ | ২ | ২ | ৪ = ২০ অক্ষরকাল

৩৬) সপ্তমাত্রা ব্রহ্মতাল—'শ্রীকৃষ্ণরস সঙ্গীত সংগ্রহ' গ্রন্থের মতানুসারে ব্রহ্মতালের অন্তর্গত সপ্তমাত্রা নামের ব্রহ্মতাল আছে।

২ | ৪ | ২ | ৪ | ৪ | ৪ | ৪ = ২৪ অক্ষরকাল

৩৭) গজেন্দ্রগুরু —২ | ৪ | ২ | ৪ | ১২ = ২৪ „

৩৮) বীরদশক —৪ | ২ | ২ | ৪ | ২ | ৪ | ২ | ৪ = ২৪ অক্ষরকাল

৩৯) বীরবিক্রম —'মৃদঙ্গব্যবস্থাসঙ্গীত' গ্রন্থানুসারে

—৪ | ২ | ২ | ৪ | ২ | ১০ = ২৪ অক্ষরকাল

অথবা, —৮ | ২ | ২ | ৮ | ২ | ৬ = ২৮ „

৪০) কুমুদ ৪ | ২ | ২ | ৪ | ৪ | ৮ = ২৪ „

এটি (বীরবিক্রমের অন্তর্গত)

৪১) রুদ্রতাল —৪ | ২ | ৪ | ২ | ২ | ২ | ২ | ২ | ২ | ২ | ৪ = ২৮ অক্ষরকাল।

'মৃদঙ্গব্যবস্থাসঙ্গীত' গ্রন্থানুসারে'

৪ | ২ | ৪ | ২ | ২ | ৪ | ৪ | ২ | ২ | ২ | ৪ = ৩২ অক্ষরকাল।

৪২) ব্রহ্মতাল—৪ | ২ | ৪ | ২ | ২ | ৪ | ২ | ২ | ২ | ৪ = ২৮ অক্ষরকাল।

৪৩) পঞ্চম সওয়ারী —৩ | ৩ | ৮ | ৮ | ৮ = ৩০ অক্ষরকাল

৪৪) ব্রহ্মযোগ —৪ | ২ | ৪ | ২ | ২ | ৪ | ২ | ২ | ২ | ৪ | ২ | ৪ = ৩৪ অক্ষরকাল

(মৃদঙ্গব্যবস্থাসঙ্গীত অনুসারে)

৪৫) কোকিলপ্রিয় তাল — ৪ | ৮ | ৮ | ৪ | ৪ | ৮ = ৩৬ অক্ষরকাল

৪৬) বিষ্ণুতাল —৪ | ৪ | ৪ | ২ | ৪ | ৪ | ২ | ২ | ২ | ২ | ২ | ৪ = ৩৬ অক্ষরকাল।

অপরমতে, ৮ | ৮ | ৮ | ৪ | ৮ = ৩৬ অক্ষরকাল।

৪৭) রূপককাঁটা —২ | ৪ | ৪ | ২ | ৪ | ৪ | ২ | ৪ | ২ | ৪ | ৪ = ৩৬ অক্ষরকাল

৪৮) রঙ্গাভরণ —৮ | ৮ | ৪ | ৪ | ১২ = ৩৬ অক্ষরকাল।

৪৯) জয়দিক কাটা (যতিকাটা—

২ | ৪ | ৪ | ২ | ৪ | ৪ | ২ | ৪ | ৪ | ৪ | ২ | ৪ | ৪ = ৪৪ অক্ষরকাল।

অপরমতে, —২ | ৪ | ৪ | ২ | ৪ | ৪ | ২ | ৪ | ৪ | ৪ = ৩৪ অক্ষরকাল

('মৃদঙ্গব্যবস্থাসঙ্গীত' গ্রন্থানুসারে)

৫০) আগেরস্তা—২ | ৪ | ৪ | ৪ | ২ | ৪ | ৪ | ৪ | ২ | ৪ | ২ | ৪ |
২ | ৪ = ৪৬ অক্ষরকাল

৫১) শঙ্খচক্র (ফেরাতাল)—২ | ৪ | ২ | ৪ | ৪ | ৪ | ২ | ৪ | ৮ | ৪ | ২
| ৪ | ৪ | ৪ | ৪ = ৫২ অক্ষরকাল

৫৩) শূলতাল—৪ | ২ | ৪ | ২ | ৪ | ২ | ৪ | ৪ | ৪ | ৪ | ২ | ৬ | ৪ , ৪
২ , ৪ = ৫৪ অক্ষরকাল

৫৪) ঝুলকে ঝুলকে প্যারী (ফেরাতাল)
২ | ১ | ২ | ১ | ১ | ২ | ১ | ২ | ১ | ১ | ২ | ৪ | ৪ | ৪ | ২ | ৪
| ৪ | ৪ | ২ | ৪ | ২ | ৪ = ৫৯ অক্ষরকাল

৫৫) মনিপুর তাল—৮ | ৪ | ১২ | ৮ | ৮ | ১২ | ৪ | ৪ = ৬০ অক্ষরকাল

৫৬) ইহ কলিযুগে (ফেরাতাল)—৪ | ৪ | ২ | ৪ | ৪ | ৪ | ২ | ৪ | ৪ | ৪
২ | ৪ | ২ | ৪ | ২ | ৪ | ৪ | ৪ | ২ | ৪ = ৬৮ অক্ষরকাল

আমরা প্রাচীন তাল পদ্ধতির যে আলোচনা করলাম, তার সঙ্গে উত্তর ভারতীয় তাল পদ্ধতির বিশেষ সামঞ্জস্য নেই। তবে এ কথা স্বীকার্য যে, হিন্দুস্থানী তালপদ্ধতি অপেক্ষাকৃত সরল। উত্তর ভারতীয়তাল পদ্ধতিতে লয়কারী করবার সুযোগ আছে। তবে এই লয়কারী জটিল ও কঠিন।

মানুষের চেতনাতে ছন্দের উৎপত্তি হয় গতিশীল প্রাকৃতিক ক্রিয়া থেকে। নদীর সুমধুর কলতান, সমুদ্রের প্রবল গর্জন, ঝর্ণার ঝিরঝির শব্দ, বেণুবনে মলয়ের কলতান মানুষের মনে এক বিচিত্র ছন্দবোধের সৃষ্টি করে। ধ্বনির বিচিত্র ছন্দ বিভিন্ন লয়ে, বিভিন্ন গতি ও তালে আমাদের কানে প্রবেশ করে। কিন্তু এই সকল ছন্দের কোন সুর নেই, ভাষা নেই, অর্থ নেই। মানুষ এই ভাষাহীন ছন্দে ভাষা দিল। বৈচিত্রহীন গতিতে বৈচিত্র আনল। এই গতিকে অনুসরণ করে বিচিত্র সুরে, ভাষায়, গতিতে ছন্দের সৃষ্টি হল। এই ছন্দই নৃত্যে, গীতে, বাদ্যে প্রযুক্ত হয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি করল, এই সৌন্দর্য পুষ্টিই ছন্দের একমাত্র কাজ। নৃত্যে ছন্দ একটি অপরিহার্য অঙ্গ। চরণের বিভিন্ন প্রকার আঘাতে বিভিন্ন ছন্দের উৎপত্তি হয়।

একটি নির্দিষ্ট তালকে ভগ্নাংশে বিভক্ত করে ছন্দের সৃষ্টি হয়। হিন্দুস্থানী

তালপদ্ধতিতে একে লয়কারী বলা হয়। গতি পরিবর্তন, তালঘাত পরিবর্তন, মাত্রার বিরাম এবং শব্দের স্থায়িত্ব দ্বারা ছন্দে বৈচিত্র আনয়ন করা হয়। একটি গতি থেকে আর একটি গতি পরিবর্তন করার নাম 'লয় পরিবর্তন' বলা হয়। মূল লয় একই থাকে সময়কে ভগ্নাংশে বিভক্ত করলে গুণ বলা হয়। যেমন সমগুণের ২ গুণ, তিনগুণ, চতুর্গুণ ইত্যাদি। অর্থাৎ চার মাত্রায় ২ গুণ অথবা তিনগুণ করার অর্থ ৪কে ২ অথবা ৩ দিয়ে গুণ করা। ৪ মাত্রা সমষ্টিকে একক ধরে গোণার পদ্ধতিও আছে। যেমন—

পৌণ লয়—৪ মাত্রার ভেতর তিন গুণতে হবে।

বরাবর লয়—৪ মাত্রার ভেতর চার গুণতে হবে।

সওয়াই লয়—৪ মাত্রার ভেতর পাঁচ গুণতে হবে। একে অনেকে কুয়াড় বা কুয়াড়ী লয় বলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুয়ার লয় মানে ৪ মাত্রায় নয় গুণতে হবে। অনেকে আবার কুয়ার বলতে আড়ের আড় লয় বোঝান।

দেড়ী লয়—৪ মাত্রার ভেতর ছয় গুণতে হবে।

পৌনে দুই লয়—৪ মাত্রার ভেতর সাত গুণতে হবে।

দুই লয়—৪ মাত্রার ভেতর আট গুণতে হবে।

এইভাবে লয়কারী করতে হয়। অর্থাৎ ৪ মাত্রা গুণতে যে সময় লাগে, সেই সময়টুকুকে এইভাবে ভাগ করে লয়কারী করা হয়।

বিয়াড় লয় বলতে অনেকে বলেন এক মাত্রা সময়ের মধ্যে পৌনে দুই মাত্রা গোণা হয়; তাকে বিয়াড়ী লয় বলা হয়। অনেকে আবার বলেন চার মাত্রার মধ্যে সাত মাত্রা বললে বিয়াড়ী লয় বলে। এ নিয়ে মতভেদ আছে।

প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রকারদের তাল সম্বন্ধে উক্তি দিয়ে তাল অধ্যায় শেষ করা যেতে পারে।

'তালজ্ঞশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গং চ গচ্ছতি'। অর্থাৎ তালজ্ঞ হলে মানুষ অনায়াসে মোক্ষ প্রাপ্তির অধিকারী হয়।

নৃত্য—১০

অঙ্গহার

আঙ্গিকস্ত ভবেচ্ছাখা হ্যঙ্কুরঃ সূচনা ভবেৎ।
অঙ্গহারবিনিষ্পন্নং নৃত্তং তু করণাশ্রয়ম্।
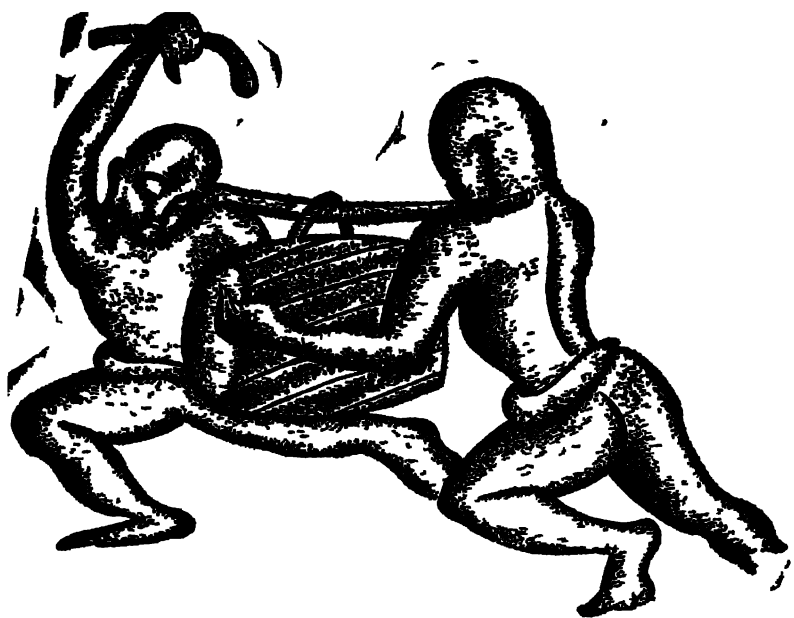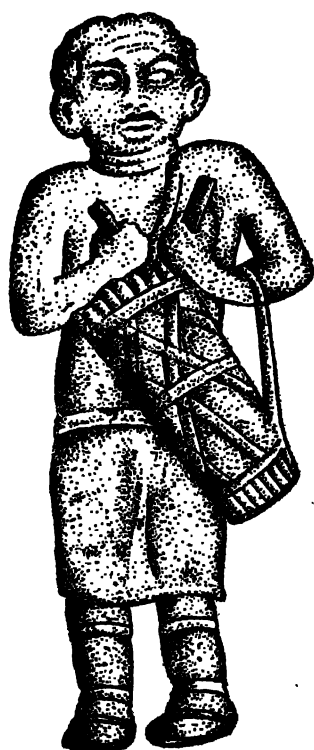
অঙ্গহার

আঙ্গিক অভিনয় ঃ—

যে চার রকমের অভিনয় আছে—'আঙ্গিক', 'বাচিক', 'আহার্য', 'সাত্ত্বিক' এর মধ্যে আঙ্গিক অভিনয় হচ্ছে অঙ্গ সংক্রান্ত ব্যাপার। মুনি ভরত অঙ্গ, উপাঙ্গ সম্বন্ধে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করেছেন। তবে প্রত্যঙ্গকে তিনি পৃথক ভাবে ধরেন নি। তাঁর মতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সংযোগে ষড়্ অঙ্গ হচ্ছে—শির, হস্ত, কটি, বক্ষ, পার্শ্ব ও পদদ্বয়। উপাঙ্গ হচ্ছে নেত্র, ভ্রূ, অক্ষিপুট, তারা, গণ্ডদ্বয়, নাসিকা, হনু, অধর, দন্তপংক্তি, জিহ্বা, চিবুক ও মুখ। এই বারোটি শিরোস্থিত উপাঙ্গ। অন্য মতে পার্ষ্ণি, গুল্ফ, অঙ্গুলি, হস্ত ও পদের তলদেশ। অভিনয় দর্পণে প্রত্যঙ্গ বলতে স্কন্ধদ্বয়, বাহুদ্বয়, পৃষ্ঠ, উদর, উরুদ্বয় ও জঙ্ঘাদ্বয়কে বলা হয়েছে।

আচার্য ভরতের মতে আঙ্গিক তিন রকমের হতে পারে -'শারীর', 'মুখজ' ও 'চেষ্টাকৃত'। 'শারীর' বলতে সর্বদেহের সঞ্চালন, 'মুখজ' বলতে মুখাভিনয় এবং 'চেষ্টাকৃত' বলতে অঙ্গ, উপাঙ্গ এবং শাখা সংযুক্ত অভিনয়।

তাঁর মতে আঙ্গিক অভিনয়ের তিনটি বস্তু—শাখা, নৃত্য ও অঙ্কুর।

"আঙ্গিকস্তু ভবেচ্ছাখা অঙ্কুরঃ সূচনা ভবেৎ"।
অঙ্গহারবিনিষ্পন্নং নৃত্তং তু করণাশ্রয়ম্॥

শাখা হচ্ছে আঙ্গিক, অঙ্কুর হচ্ছে সূচনা এবং করণাশ্রিত অঙ্গহার নিষ্পন্নকে 'নৃত্ত' বলা হয়েছে। অঙ্কুর বা সূচনার অর্থ হচ্ছে, যা ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের সূচনা করে। ভরতমুনি ষড় অঙ্গকে বলেছেন নাট্যের সংগ্রহ।

নন্দিকেশ্বর অভিনয় দর্পণে আঙ্গিক অভিনয় সম্বন্ধে বলেছেন—

"তত্র আঙ্গিকোঽঙ্গৈর্নিদর্শিতঃ।"

আঙ্গিক অভিনয় অঙ্গসমূহের দ্বারা প্রদর্শিত হয়ে থাকে।

অঙ্গহার—পঞ্চদশ শতাব্দীর লেখক শুভঙ্কর সঙ্গীত দামোদরে অঙ্গহার সম্বন্ধে বলেছেন—"অঙ্গবিক্ষেপের জন্য অঙ্গচেষ্টাই 'অঙ্গহার'।" মুনি ভরত বলেছেন—"সর্বেষামঙ্গহারাণাং নিষ্পত্তিঃ করণৈর্ভবেৎ।"

অর্থাৎ সকল অঙ্গহারই করণের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। অঙ্গসমূহের নানাপ্রকার

ক্রিয়ার মিলনকে অঙ্গহার বলে। হরকর্তৃক অঙ্গ ক্রিয়ার বিবিধ প্রয়োগই হচ্ছে 'অঙ্গহার'। আঙ্গিক অভিনয়ের অন্তর্গত হচ্ছে অঙ্গহার।

অঙ্গহার বত্রিশ রকমের হতে পারে—স্থিরহস্ত, পর্যস্তক, সূচীবিদ্ধ, অপবিদ্ধ, আক্ষিপ্ত, উদ্ঘটিত, বিষ্কম্ভ, অপরাজিত, বিষ্কম্ভাপসৃত, মত্তক্রীড়, স্বস্তিকরেচিত, পার্শ্বস্বস্তিক, বৃশ্চিকাপসৃত, ভ্রমর, মত্তস্খলিতক, মদবিলসিত, গতিমণ্ডল, পরিচ্ছিন্ন, পরিবৃত্তচিত, বৈশাখরেচিত, পরাবৃত্ত, অলাতক, পার্শ্বচ্ছেদ, বিদ্যুতভ্রান্ত, উরূদ্বৃত্ত, আলীঢ়, আচ্ছুরিত, রেচিত, আক্ষিপ্তরেচিত, সম্ভ্রান্ত, অপসর্পি, অর্ধনিকুট্টক। অঙ্গহার প্রয়োগে ভাণ্ডবাদ্যের বিধান আছে। শুদ্ধ ভাণ্ডবাদ্যের বিধান চার রকম—সম, রিক্ত, বিভক্ত ও স্ফুট। গীত বাদ্যের সঙ্গে নর্তকীদের নিষ্ক্রামণ নিষেধ। তাণ্ডবে নৃত্তের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাদ্যকররা বাদ্য বাজাবেন। এই বাদ্যের সঙ্গে 'আসারিত' অভিনয় প্রয়োগে পিণ্ডীবন্ধ করে অঙ্গহার করতে হবে।

করণ—'করণ' শব্দটি নৃত্যে অতি পরিচিত শব্দ। আধুনিক শাস্ত্রীয় নৃত্যে হয় তো করণের কিছু কিছু প্রয়োগ আছে। কিন্তু আমরা সে বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত নই। ভরতমুনি 'করণ' সম্বন্ধে বলেছেন যে করণ হচ্ছে হস্ত ও পদপ্রচার সহ বিবিধ ভঙ্গি। বিবিধ ভঙ্গিতে অবস্থানের আগে পাদ ক্রমণ করতে হবে। দ্বিপাদ ক্রমণকে 'করণ' বলা হয়েছে। অভিনব গুপ্ত করণের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, 'করণ' হচ্ছে 'ক্রিয়া'। কিন্তু কিসের ক্রিয়া? নৃত্যের ক্রিয়া। আচার্য ভরত করণের সংজ্ঞা দিয়েছেন—

"হস্তপাদ সমাযোগো নৃত্তাস্য করণং ভবেৎ।" এই রকম দুটি নৃত্ত করণের সমাবেশকে 'নৃত্তমাতৃকা' বলা হয়েছে,

"নৃত্তস্যাঙ্গহারাত্মনো মাতৃকা উৎপত্তিকারণম্।"

স্থানক, চারী ও নৃত্ত হস্তকে এক কথায় 'মাতৃকা' অর্থাৎ 'করণমাতৃকা' বলা হয়। এদের যোগেই করণের সৃষ্টি। তিনটি করণে কলাপের সৃষ্টি হয়। চারটি করণে 'খণ্ডক', পাঁচটিতে সঙ্ঘাত এবং ছয়টি, সাতটি আটটি অথবা নয়টি করণে অঙ্গহারের সৃষ্টি করে। দুইটি, তিনটি অথবা চারটি করণে 'নৃত্তমাতৃকা'ও অঙ্গহারের সৃষ্টি করে।

মুনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রে রেচক, পিণ্ডীবন্ধ প্রভৃতি শব্দগুলির উল্লেখ আছে, কিন্তু এর সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ নেই। তবু যা আছে, তাতে একটি সূক্ষ্মভেদ অনুমান

করা যায়। রেচক বলতে পদ, কটি হস্ত ও গ্রীবা, এই চতুরঙ্গের বিভিন্নভাবে চালনা বোঝায়। দক্ষযজ্ঞ বিনষ্ট হবার পর সন্ধ্যাকালে চাররকম আতোন্ত বাদ্যের সহযোগে শঙ্করের দ্বারা রেচক ও অঙ্গহার প্রদর্শিত হয়েছিল। চঞ্চল অথবা স্খলিত পদে একপাশ থেকে অপর পাশে যাওয়া প্রভৃতি পদরেচকের ক্রিয়া। ত্রিকের উদ্বর্তন, কটিদেশের বলন প্রভৃতি কটিরেচকের ক্রিয়া। উদ্বর্তন, বিক্ষেপ, পরিবর্তন প্রভৃতি হস্তরেচকের ক্রিয়া। গ্রীবার সন্নমন, ভ্রমণ, প্রভৃতি 'গ্রীবারেচকের' ক্রিয়া।

পিণ্ডীবন্ধ—অঙ্গহারাদির সজ্ঘাতে উৎপন্ন আকৃতি বিশেষ। অর্থাৎ এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ তদাকৃতির দ্যোতক নিশ্চল ভঙ্গি বিশেষ। নানালয়তাল সমন্বিত অঙ্গহারে পিণ্ডিবন্ধ দেখে নন্দীপ্রমুখ শিবের গণ তার নামকরণ করতে লাগলেন, যথা—মহেশ্বরের 'ঈশ্বরী' পিণ্ডী, চণ্ডিকার 'সিংহবাহিনী' পিণ্ডী, বিষ্ণুর 'তার্ক্ষ্য' (গরুড়) পিণ্ডী, ব্রহ্মার 'পদ্ম' পিণ্ডী ইত্যাদি। পিণ্ডীবন্ধ মূলতঃ দু ভাগে বিভক্ত—'স্বজাতীয়' ও 'বিজাতীয়'। 'স্বজাতীয়' বলতে মনুষ্য জাতীয় জীবের কোন বিশেষ রূপের প্রকাশভঙ্গি এবং 'বিজাতীয় বলতে মনুষ্যেতর জীবের কোন বিশেষরূপের প্রকাশভঙ্গিকে বোঝায়। এই দুইয়ের সংমিশ্রণে যে সকল ভঙ্গি উৎপন্ন হতে পারে, তাদের আবার চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—পিণ্ডী, শৃঙ্খলিকা, লতাবন্ধ, ভেদ্যক। পিণ্ডী হচ্ছে পিণ্ডাকৃতি, শৃঙ্খলিকা হচ্ছে গুল্মাকৃতি এবং লতাবন্ধ হচ্ছে জালাকৃতি। ভেদ্যকে নৃত্তের যোগ থাকবে। অঙ্গহারের আলোচনা পূর্বেই করেছি।

নানাভাবরসাশ্রিত হ'লে তাকে 'মুখজ' অভিনয় বলা হয়ে থাকে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, 'মুখজ' অভিনয়ের প্রথম কর্ম হচ্ছে শিরোভেদ'। নাট্যশাস্ত্রে তেরো রকমের শিরোভেদের উল্লেখ আছে। সঙ্গীত দামোদরে চোদ্দ রকমের শিরোভেদের উল্লেখ আছে। অভিনয় দর্পণে নয় রকম শিরোভেদের উল্লেখ আছে।

নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত শিরোভেদ—অকম্পিত, কম্পিত, ধুত, বিধুত, অবধুত, পরিবাহিত, উদ্বাহিত, অঞ্চিত, নিহঞ্চিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, অধোগত ও পরিলোলিত। সঙ্গীতদামোদরে 'প্রকৃত' নামে আর একটি শিরঃ কর্মের যোগ হয়েছে। নিহঞ্চিতের পরিবর্তে নিকুঞ্চিতের উল্লেখ আছে। অভিনয় দর্পণে নয় রকমের শিরোভেদের উল্লেখ আছে। এগুলি হচ্ছে—সম, উদ্বাহিত,

অধোমুখ, আলোলিত, ধুত, কম্পিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, পরিবাহিত।

অকম্পিত—মস্তক ওপরে ও নীচে ধীরে ধীরে কম্পিত হলে তাকে 'অকম্পিত' শির বলে। স্বাভাবিক বাক্যালাপে, গোপন করতে, নির্দেশদানে আবাহনে অনুসন্ধানে, প্রশ্নে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

কম্পিত—অকম্পিত শিরই দ্রুতভাবে বহুবার করলে কম্পিত শির হয়। রোষে, বিতর্কে, বিজ্ঞানে, প্রতিজ্ঞায়, তর্জনে, প্রশ্নে এই শির ব্যবহৃত হয়।

ধুত—ধীরে মস্তক[১] রেচনের নাম ধুত শির। অনিচ্ছায় ও বিষাদে, বিস্ময়ে প্রত্যয়ে, পার্শ্ব অবলোকনে, শূন্যে অবস্থানে ও নিষেধে এই শির ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বিধুত—দ্রুতভাবে মস্তক রেচনের নাম 'বিধুত'। শীতে, ভয়ে, ত্রাসে, জ্বরে, মদ্যপানে ও যে কোন পান করাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পরিবাহিত—পর্যায়ক্রমে উভয়পাশে মস্তক চালনাকে 'পরিবাহিত' বলা হয়। সাধন, বিস্ময়, হর্ষ, স্মরণ, অমর্ষ,[২] বিচার, গোপন, লীলা প্রভৃতিতে এই শির ব্যবহৃত হয়। অন্যমতে মণ্ডলাকারে শির ঘোরালে পরিবাহিত হয়।

উদ্বাহিত—একবার তির্যগ্‌ভাবে উঁচুতে মস্তক উত্তোলনের নাম উদ্বাহিত।

অবধুত—একবার অধোমুখে আক্ষিপ্ত হ'লে 'অবধুত' মস্তক হয়।

অঞ্চিত—কিঞ্চিৎ পাশে নতগ্রীব শির 'অঞ্চিত' বলে খ্যাত। ব্যাধিতে, মূর্চ্ছাতে, মত্ত অবস্থাতে, চিন্তা ও দুঃখিততে এই শির ব্যবহৃত হয়।

নিহঞ্চিত—কাঁধ উৎক্ষিপ্ত এবং কিছু কুঞ্চিত হ'লে নিহঞ্চিত হয়।

এই শির স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রযোজ্য। গর্বে, আত্মাভিমানে, বিলাসে মোট্টায়িতে, কুট্টমিতে, বিব্বোকে, কিলকিঞ্চিতে, স্তম্ভে ও মানে ব্যবহৃত হয়।

পরাবৃত্ত—পেছন ফেরবার অনুকরণের নাম 'পরাবৃত্ত'। মুখ ফিরিয়ে নেওয়া অথবা পশ্চাৎ দর্শনে ব্যবহৃত হয়।

উৎক্ষিপ্ত—উন্মুখে অবস্থিত শিরকে উৎক্ষিপ্ত শির বলা হয়। দিব্য অস্ত্রপ্রয়োগে এবং আকাশস্থিত বস্তু ও উঁচু বস্তু দর্শনে এর প্রয়োগ হয়ে থাকে।

অধোগত—অধোদিকে নমিত শিরের নাম 'অধোগত'। লজ্জায়, প্রণামে, ও দুঃখে এর প্রয়োগ হয়।

১। ঝাড়া।

২। ঈর্ষ্যা

পরিলোলিত—চারদিকে ভ্রমিত শিরকে 'পরিলোলিত' বলা হয়। মূর্চ্ছা, ব্যাধি, মদাবেশগ্রস্থ, নিদ্রা প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়।

অভিনয় দর্পণের শিরোভেদ :—

সম—যে শির নিশ্চল অথচ অবনত ও উন্নত ভাব বর্জ্জিত, তাই সম শির বলে খ্যাত। নৃত্যারম্ভে, জপে, গর্ব ও প্রণয়কোপে, স্তম্ভন ও নিষ্ক্রিয় ভাব প্রদর্শনে ব্যবহৃত হয়।

উদ্বাহিত—মুখ উন্নত (উঁচু) হলে উদ্বাহিত শির হয়। ধ্বজ, আকাশ, পর্বত, আকাশগামী বস্তু ও উঁচু বস্তু দর্শনে এই শির ব্যবহৃত হয়।

অধোমুখ—নীচের দিকে নমিত বদনকে 'অধোমুখ বলে। লজ্জা, খেদ, প্রণাম দুশ্চিন্তা, মূর্চ্ছা, অধোস্থিত পদার্থের নির্দেশ ও জলে ডুব দেওয়াতে শিরের 'অধোমুখ' প্রয়োগ হয়।

আলোলিত—মণ্ডলাকারে চারদিকে ঘুরলে 'আলোলিত' শির হয়। নিদ্রার উদ্বেগ, গ্রহাবেশ, মদ, মূর্চ্ছা, ভ্রমণ, বিকট উদ্দাম অট্টহাসে আলোলিত শির ব্যবহৃত হয়।

নাট্যশাস্ত্রে ৩৬ রকমের দৃষ্টিভেদ এবং অভিনয় দর্পণে আট রকম দৃষ্টিভেদের উল্লেখ আছে। নাট্যশাস্ত্রে ৩৬ রকম দৃষ্টিভেদের মধ্যে ৮ রকম স্থায়ী দৃষ্টি, ৮ রকম রস দৃষ্টি এবং ২০ রকম সঞ্চারি দৃষ্টি আছে।

স্থায়ী দৃষ্টি—স্নিগ্ধা, হৃষ্টা, দীনা ক্রুদ্ধা, দৃপ্তা, ভয়ান্বিতা, জুগুপ্সিতা ও বিস্মিতা।

রসদৃষ্টি—কান্তা, ভয়ানকা, হাস্যা, করুণা, অদ্ভুতা, রৌদ্রী, বীরা ও বীভৎসা।

সঞ্চারি দৃষ্টি—শূন্যা, মলিনা, শ্রান্তা, লজ্জান্বিতা, গ্লানা, শঙ্কিতা, বিষণ্ণা মুকুলা, কুঞ্চিতা, অভিতপ্তা, জিহ্মা, ললিতা বিতর্কিতা, অর্ধমুকুলা, বিভ্রান্তা, বিপ্লুতা, আকেকরা, বিকোশা, মদিরা ও ত্রস্তা।

স্থায়ীদৃষ্টি—

স্নিগ্ধা—সানন্দ ভ্রূলতা, চক্ষুতারকা স্থির ও মধুর এবং দৃষ্টির মধ্যভাগ বিকশিত হ'লে তাকে 'স্নিগ্ধা' বলে। রতিভাব থেকে এর জন্ম।

হৃষ্টা—দৃষ্টি একটু কুঞ্চিত, চঞ্চল, হাস্যময়ী ও চক্ষুতারকা পল্লবে অর্ধেক ঢাকা থাকলে তাকে 'হৃষ্টা' বলা হয়। হাস্যরসে প্রযুক্ত হয়।

দীনা—উঁচু পল্লব আনত, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হবার ফলে রুদ্ধ এবং দৃষ্টি মন্থর হ'লে তাকে 'দীনা' বলে। শোকে এই দৃষ্টি প্রযুক্ত হয়।

ক্রুদ্ধা—দৃষ্টি যদি রুক্ষ, স্থির, ভ্রূকুটি কুটিল ও ক্রোধান্বিত হয় তবে তাকে 'ক্রুদ্ধা' বলে। এই শির ক্রোধে ব্যবহৃত হয়।

দৃপ্তা—যদি চক্ষুতারকা স্থির, স্তব্ধ, ও বিকশিত হয় এবং উৎসাহব্যঞ্জক দৃষ্টির দ্বারা স্বভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহ'লে তাকে 'দৃপ্তা' বলে। দৃপ্তা দৃষ্টি উৎসাহ ভাবাশ্রিত।

ভয়ান্বিতা—যদি নেত্রপল্লব দুটি বিস্ফারিত হয় ও তারকা ভয়ে কম্পিত হয় এবং দৃষ্টির মধ্যভাগ স্ফীত হয়, তাহ'লে তাকে 'ভয়ান্বিতা' বলে।

জুগুপ্সিতা—পল্লব সঙ্কুচিত, তারকা অর্ধবিস্ফুট এবং দৃষ্টি লক্ষ্যবস্তুর উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন ও বিকৃত হলে তাকে 'জুগুপ্সিতা' বলে।

বিস্মিতা—তারকা বিশেষভাবে ওপরদিকে উত্থিত, পল্লব যুগল অত্যন্ত বিস্ফারিত; দৃষ্টি বিকশিত ও সম অবস্থায় থাকলে তাকে 'বিস্মিতা' বলে। এই দৃষ্টি বিস্ময় ভাবাশ্রিত।

রসদৃষ্টি—

কান্তা—হর্ষপ্রসাদজনিত শৃঙ্গার রসাত্মক ভ্রূক্ষেপ ও কটাক্ষযুক্ত দৃষ্টিকে 'কান্তা' বলে।

ভয়ানকা—চক্ষুপল্লব উর্ধ্বে উত্থিত ও নিশ্চল, স্ফুরিত তারকা চঞ্চল এবং দৃষ্টি অত্যন্ত ভীতা হলে 'ভয়ানকা' দৃষ্টি হয়। এই দৃষ্টি ভয়ানক রসাশ্রিত।

হাস্যা—ক্রমশঃ চক্ষুপল্লব কুঞ্চিত এবং বিভ্রান্ত চক্ষু তারকা সামান্য দৃষ্ট হলে 'হাস্যা' হয়। মোহজাল বিস্তারে ব্যবহৃত হয়।

করুণা—উর্ধ্বপল্লব নত, চক্ষুতারকা দুঃখে মন্থর, অরুণাভ দৃষ্টি নাসাগ্রে নিবদ্ধ থাকলে তাকে 'করুণা' দৃষ্টি বলে। এই দৃষ্টি করুণ রসাশ্রিত।

অদ্ভুতা—চক্ষুপল্লবের অগ্রভাগ সামান্য কুঞ্চিত, চক্ষুতারকা আশ্চর্য জনক ভাবে স্ফুরিত এবং নয়নের প্রান্তভাগ বিকশিত ও দৃষ্টি-সৌম্য হলে তাকে 'অদ্ভুতা' বলে। এই দৃষ্টি অদ্ভুত রসাশ্রিত।

বীরা—দৃষ্টি যদি দীপ্ত, বিকসিত, ক্ষোভযুক্ত ও গম্ভীর হয় এবং চক্ষু তারকা সমভাবে থাকে, মধ্যভাগ যদি উৎফুল্ল হয়, তাকে 'বীরা' দৃষ্টি বলে এবং এই দৃষ্টি বীররসাশ্রিত।

রৌদ্রী—দৃষ্টি যদি ক্রূর, রুক্ষ, অরুন ও ভ্রূকুটি কুটিল হয় এবং চক্ষুপল্লব ও তারকা যদি নিশ্চল হয়, তাহ'লে 'রৌদ্রী' হয়। এই দৃষ্টি রৌদ্ররসাশ্রিত।

১সঞ্চারি দৃষ্টি—

বীভৎসা—চক্ষুপল্লব ও চোখের প্রান্তভাগ যদি নিকুঞ্চিত হয় ও ঘৃণায় আপ্লুত তারকা হয়, পক্ষ্মগুলি সংশ্লিষ্ট ও স্থিত হয় তাহলে 'বীভৎসা' দৃষ্টি হয়।

শূন্যা—সমতারাযুক্ত, সমপুট, নিষ্কম্প, শূন্যদর্শনা, বাহ্যার্থ গ্রহণে অসমর্থ, ও ক্ষীণ দৃষ্টি 'শূন্যা' বলে কথিত। এই দৃষ্টি চিন্তায় ব্যবহৃত হয়। (সঙ্গীত রত্নাকর)।

মলিনা—পক্ষ্মপ্রান্ত স্পন্দিত, অক্ষিপুট মুকুলিত, নয়নপ্রান্ত মলিন হ'লে 'মলিনা' হয়। দুঃখ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

শ্রান্তা—শ্রমক্লান্তিতে নেত্রপুট ম্লান, ক্ষীণলোচন, চক্ষুতারকা পতিত ও লোচন অঞ্চিত হলে 'শ্রান্তা' দৃষ্টি হয়। (শ্রমে প্রযোজ্য—সঙ্গীত রত্নাকর)

লজ্জান্বিতা—সেই দৃষ্টি লজ্জিতা যাতে নেত্রপল্লবের অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত, উর্ধ্বপুট পতিত এবং নেত্রতারকা অধোগত। (লজ্জাতে এই দৃষ্টির প্রয়োগ হয়।—সঙ্গীত রত্নাকর।)

গ্লানা—ভ্রূ, পুট ও পক্ষ্ম যদি গ্লানিযুক্ত, শিথিল ও মন্থর গতিবিশিষ্ট হয়, ক্লান্তি হেতু তারকা ভেতরে যদি প্রবিষ্ট হয় তবে 'গ্লানা' দৃষ্টি হয়। (গ্লানিতে প্রযুক্ত হয়—সঙ্গীত রত্নাকর)

শঙ্কিতা—নয়নতারা কিঞ্চিৎ স্থির, কিঞ্চিৎ চঞ্চল, কিঞ্চিৎ উন্নত, আয়ত এবং গূঢ় হলে 'শঙ্কিতা' দৃষ্টি হয়। (শঙ্কাতে প্রয়োগ করা হয়—সঙ্গীত রত্নাকর)

বিষণ্ণা—নেত্রপুট বিষাদে বিস্তীর্ণ, তারকা কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধ, দৃষ্টি নিমেষহীন হলে 'বিষণ্ণা' দৃষ্টি হয়। (বিষাদে প্রযুক্ত হয়—সঃ রঃ)

মুকুলা—এই দৃষ্টিতে পক্ষ্মের অর্ধভাগ স্ফুরিত, উর্ধ্বপুট আশ্লিষ্ট. দৃষ্টি প্রফুল্ল ও সুখে তারা উন্মীলিত হবে। এই রকম দৃষ্টিকে মুকুলা বলা হয়। নিদ্রা, স্বপ্ন ও সুখাবিষ্ট ভাবে এই দৃষ্টি প্রযোজ্য। (সঃ রঃ)

কুঞ্চিতা—পক্ষ্মের অগ্রভাগ ঈষৎ কুঞ্চিত, পুটদ্বয় ও তারকাদ্বয় কুঞ্চিত এবং দৃষ্টি যদি অবসাদগ্রস্ত হয় তাহ'লে 'কুঞ্চিতা' হয়। অসূয়ায়, অবাঞ্ছিত বস্তু দর্শনে ও অনিষ্টে এই দৃষ্টি ব্যবহৃত হয়।

১ সঞ্চারি দৃষ্টির প্রয়োগে সঙ্গীতরত্নাকরের বিশ্লেষণ দেওয়া হ'ল

অভিতপ্তা—চক্ষুতারকা ও পুটদ্বয় মন্দ মন্দ আন্দোলিত হলে, দুঃখে অভিভূত ও ব্যথাযুক্ত হলে তাকে 'অভিতপ্তা' দৃষ্টি বলা হয়। নির্বেদে, আকস্মিক আঘাতে ও তাপে ব্যবহৃত হয়।

জিহ্মা—দৃষ্টি দীর্ঘস্থায়ী এবং পুট কুঞ্চিত হলে, ধীরে ধীরে তির্যগভাবে দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হলে এবং তারাটিও গুপ্ত হলে 'জিহ্মা' দৃষ্টি হয়। অসূয়া, জড়তা, ও আলস্য প্রভৃতিতে প্রযোজ্য। (সঃ রঃ)

ললিতা—মধুর, কুঞ্চিত, ভ্রূবিলাসযুক্ত, সর্পিল ও কামাতুরা দৃষ্টি 'ললিতা' বলে কথিত হয়। লজ্জিত অবস্থায় এবং ধৈর্য ও হর্ষে এই দৃষ্টি প্রযোজ্য। (সঃ রঃ)

বিতর্কিতা—চক্ষুপল্লব উর্ধ্বে উত্থিত, তারকা প্রফুল্ল এবং মুখের নিম্নভাগ বিকৃত হলে 'বিতর্কিতা' হয়। তর্কে বিতর্কিতা প্রযোজ্য।

অর্ধমুকুলা—চক্ষুপল্লব অর্ধ বিকশিত, পুট আহ্লাদে অর্ধ মুকুলিত এবং ঈষৎ চঞ্চল তারকাযুক্ত দৃষ্টিকে 'অর্ধমুকুলা' বলা হয়। এই দৃষ্টি গন্ধ, স্পর্শ, সুখ ও আহ্লাদে প্রযোজ্য। (সঃ রঃ)

বিভ্রান্তা—চক্ষুতারকা চঞ্চল, দৃষ্টি বিভ্রান্ত ও আকুল এবং নেত্র সম্পূর্ণ বিস্তীর্ণ ও উৎফুল্ল হলে তাকে 'বিভ্রান্তা' বলে। আবেগে, সম্ভ্রমে ও বিভ্রমে এই দৃষ্টি প্রযোজ্য। (সঃ রঃ)

বিপ্লুতা—নেত্রদ্বয় প্রস্ফুটিত ও নিশ্চল হয়ে আবার পতিত হলে, চক্ষুতারকা আকুল হয়ে উর্ধ্বে উত্থিত থাকলে সেই দৃষ্টিকে 'বিপ্লুতা' বলা হয়ে থাকে। চাপল্য, উন্মাদনা, আর্তি, দুঃখ, মরণ প্রভৃতিতে এই দৃষ্টি প্রযোজ্য। (সঃ রঃ)

আকেকরা—নেত্রপুট অপাঙ্গ আকুঞ্চিত হলে এবং দৃষ্টি অর্ধ-নিমেষিনী হলে তাকে 'আকেকরা' বলে। ব্যথাভরা বিচ্ছেদদর্শনে এই দৃষ্টি ব্যবহৃত হয়।

বিকোশা—নেত্রপুটদ্বয় বিশেষভাবে বিস্ফারিত, দৃষ্টি নিমেষহীন ও উৎফুল্ল হলে এবং তারকা অনবস্থিত হলে 'বিকোশা' হয়। বিষাদ, গর্ব, অমর্ষ প্রভৃতিতে এই দৃষ্টি ব্যবহৃত হয়।

ত্রস্তা—পুটযুগল উর্ধ্বে উত্থিত, তারকাদ্বয় উৎকম্পিত, দৃষ্টির মধ্য ভাগ উৎফুল্ল ও ত্রাসযুক্ত হলে 'ত্রস্তা' হয়। ত্রাস বোঝাতে এই দৃষ্টি ব্যবহৃত হয়।

মদিরা—দৃষ্টির মধ্যভাগ ঈষৎ ঘূর্ণমান, অন্তভাগ ক্ষীণ এবং অপাঙ্গ বিকশিত হলে 'মদিরা' দৃষ্টি হয়। জাগরণে, গর্বে, অসহিষ্ণুতায়, উগ্রমত্তিতে এই দৃষ্টি প্রযোজ্য। মত্ততার প্রথম অবস্থা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। মত্ততার মধ্যাবস্থায় নেত্রপুটযুগল ঈষৎ আকুঞ্চিত, তারকাযুগল ঈষৎ চঞ্চল ও দৃষ্টি অস্থির হয়। মত্ততার শেষ অবস্থায় দৃষ্টি কখনও নিমেষযুক্ত, কখনও নিমেষহীন হবে, চক্ষুতারকা কিঞ্চিৎ দৃষ্ট হবে এবং দৃষ্টি সকল সময় নিম্নগামী হবে। মত্তাবস্থায় এই দৃষ্টি ব্যবহৃত হয়।

মুনি ভরত দৃষ্টি ও দর্শনের মধ্যে একটি পার্থক্য করেছেন। দৃষ্টি হচ্ছে রসভাবযুক্ত এবং দর্শন হচ্ছে তারাকর্ম অর্থাৎ অক্ষি তারকার ক্রিয়া।

সম—এই দর্শনে অক্ষিতারকা ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত হলে এবং সৌম্যভাব যুক্ত হলে 'সম' হয়।

সাচি—এই দর্শনে চক্ষুতারকা পুটের অন্তর্গত থাকে এবং তির্যক হয়।

অনুবৃত্ত—এই দর্শনে রূপ নিরীক্ষণ করা হয়।

আলোকিত—যে দর্শন সহসা দেখবার জন্যে ব্যবহৃত হয়, তাই 'আলোকিত'।

বিলোকিত—যে দর্শনে পশ্চাদ্ভাগ দৃষ্ট হয় তা 'বিলোকিত'।

প্রলোকিত—যে দর্শনে উভয়পার্শ্ব দৃষ্ট হয় তা 'প্রলোকিত'।

উল্লোকিত—যে দর্শনে উর্ধ্বভাগ দৃষ্ট হয় তা 'উল্লোকিত'।

অবলোকিত—যে দর্শনে অধোদেশ দৃষ্ট হয় তা 'অবলোকিত'।

অভিনয় দর্পণে আট রকম দৃষ্টিভেদের উল্লেখ আছে। যথা—সম, আলোকিত, সাচি, প্রলোকিত, নিমীলিত, উল্লোকিত, অনুবৃত্ত ও অবলোকিত।

নাট্যশাস্ত্রে নয়প্রকার তারাক্রিয়া আছে—ভ্রমণ, বলন, পাতন, চলন, প্রবেশন, বিবর্তন, সমুদ্বৃত্ত, নিষ্ক্রামণ ও প্রাকৃত।

তারাযুগল পুটের মধ্যে মণ্ডলাকারে ঘুরিলে তা 'ভ্রমণ' হয়। ত্র্যস্রভাবে ঘুরলে 'বলন' হয় এবং নীচের দিকে শিথিলভাবে থাকলে 'পাতন' হয়। তারার কম্পন হলে 'চলন' এবং ভেতর দিকে প্রবেশ করলে 'প্রবেশন' হয়। কটাক্ষপাত হলে 'বিবর্তন', তারাদুটি সমুন্নত থাকলে 'সমুদ্বৃত্ত' এবং নির্গত হ'লে 'নিষ্ক্রামণ', স্বাভাবিক থাকলে 'প্রাকৃত' হয়। বীর ও রৌদ্ররসে ভ্রমণ, বলন, সমুদ্বৃত্ত, ও নিষ্ক্রামণ ব্যবহৃত হয়। হাস্য ও বীভৎস রসে প্রবেশনের

প্রয়োগ হয়। করুণ রসে পাতন ও অদ্ভুত রসে নিষ্ক্রামণ ব্যবহৃত হয়। শৃঙ্গারে বিবর্তন ও অবশিষ্ট রসে 'প্রাকৃত' প্রযোজ্য।

নাট্যশাস্ত্রে নয়প্রকার **পুটকর্মের** উল্লেখ আছে। উন্মেষ, নিমেষ, প্রসৃত, কুঞ্চিত, সম, বিবর্তিত, স্ফুরিত, পিহিত ও বিতাড়িত।

পুটদ্বয় বিশ্লিষ্ট অবস্থায় থাকলে তা **'উন্মেষ'** হয়। পুটদ্বয় সংযুক্ত অবস্থায় থাকলে **'নিমেষ'**, বিস্তৃত থাকলে **'প্রসৃত'**, আকুঞ্চিত থাকলে **'কুঞ্চিত'** স্বাভাবিক থাকলে **'সম'**, উন্নত অবস্থায় থাকলে **'বিবর্তিত**, স্পন্দিত হলে **'স্ফুরিত'** আচ্ছাদিত হ'লে **'পিহিত'** এবং আহত হলে **'বিতাড়িত'** হয়।

ক্রোধ নিমেষ এবং উন্মেষের সঙ্গে 'বিবর্তিত' ব্যবহৃত হয়। বিস্ময়, হর্ষ এবং বীরত্ব প্রকাশে 'প্রসৃত' প্রযুক্ত' হয়। অনিষ্ট দর্শনে, গন্ধ, রস ও স্পর্শে 'কুঞ্চিত' এবং শৃঙ্গারে 'সম' প্রয়োগ হয়। ঈর্ষ্যা প্রকাশে 'স্ফুরিত', সুপ্তি, মূর্ছা, বায়ু উষ্ণতা, ধূম, বর্ষা, অঞ্জন, লেপন, আর্তি ও নেত্র রোগে 'পিহিত' এবং অভিঘাতে 'বিতাড়িত' প্রযুক্ত হয়।

নাট্যশাস্ত্রানুসারে সাত রকম **ভ্রূকর্মের** উল্লেখ আছে—উৎক্ষেপ, পাতন, ভ্রূকুটি, চতুর, কুঞ্চিত, রেচিত ও সহজ। ভ্রূদ্বয়ের একসাথে অথবা একটির পর একটির উন্নত অবস্থাকে **'উৎক্ষেপ'** বলা হয়। কোপে, বিতর্কে, হেলায়, লীলায়, স্বাভাবিক দর্শনে ও শ্রবণে একটি ভ্রূ উৎক্ষিপ্ত হয়। বিস্ময়ে, হর্ষে ও রোষে দুইটি ভ্রূ উৎক্ষিপ্ত হয়। দুইটি ভ্রূ'র ক্রমে ক্রমে অধোমুখে পতন হলে **'পাতন'** হয়। অসূয়া, জুগুপ্সা, হাস্য ও ঘ্রাণে 'পাতন' ব্যবহৃত হয়। ভ্রূ দ্বয়ের মূল (কপাল ও নাকের সংযোগস্থল) উৎক্ষিপ্ত হলে **'ভ্রূকুটি'** বলে পরিকীর্তিত হয়। ক্রোধ অথবা দীপ্তভাব বোঝাতে ভ্রূকুটি ব্যবহৃত হয়। কোন রকম উচ্ছ্বাসহেতু ভ্রূ দ্বয়ের মধুর ও আয়ত বিক্ষেপকে **'চতুর'** বলা হয়। স্ত্রী পুরুষের আলাপে ও নানা রকম মধুর ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়। একটি অথবা উভয় ভ্রূর মৃদু কুঞ্চন হলে তাকে **'কুঞ্চিত'** বলা হয়। মোট্টায়িত ভাব অথবা কিলি কিঞ্চিত ভাব প্রকাশে 'কুঞ্চিত' ব্যবহার হয়। কিন্তু নৃত্তে 'রেচিত' ব্যবহার করা কর্তব্য। একটি ভ্রূ ললিতভাবে উৎক্ষিপ্ত হলে **'রেচিত'** হয়। স্বাভাবিক ভ্রূকর্মকে **'সহজ'** বলা হয় এবং স্বাভাবিকভাবে এর প্রকাশ।

নাট্যশাস্ত্রানুসারে ছয় রকম **নাসাকর্মের** উল্লেখ আছে; যথা—নতা, মন্দা, বিকৃষ্টা, সোচ্ছ্বাসা, বিকূণিতা ও স্বাভাবিকা।

নাসাপুটদ্বয় মুহুর্মুহু সংশ্লিষ্ট হলে 'নতা' বলে অভিহিত হয়। মত্ততাজনিত কম্পনে, নারীদের অনুরোধ প্রকাশে ও নিঃশ্বাসে 'নতা' ব্যবহৃত হয়। নাসাপুট স্থির অবস্থায় থাকলে 'মন্দা' হয়। নির্বেদ, ঔৎসুক্যে, চিন্তা ও শোকে 'মন্দা' ব্যবহৃত হয়। নাসাপুট স্ফুরিত হলে 'বিকৃষ্টা' বলে কীর্তিত হয়। তীব্র গন্ধে, রৌদ্র ও বীর রসে 'বিকৃষ্টা' ব্যবহৃত হয়। শ্বাসগ্রহণকালীন অবস্থাকে 'সোচ্ছাসা' বলে। ইষ্ট ঘ্রাণে, উচ্ছ্বাসে ব্যবহৃত হয়। নাসাপুট সঙ্কুচিত করলে 'বিকূনিত' হয়। জুগুপ্সা ও অসূয়াতে ব্যবহৃত হয়। নাসাপুটদ্বয়ের স্বাভাবিক অবস্থাকে 'স্বাভাবিক' অথবা 'সমা' বলা হয়। অবশিষ্ট ভাবসমূহে অভিজ্ঞ নটরা এগুলি ব্যবহার করেন।

গণ্ডকর্ম—নাট্যশাস্ত্রে ছয় রকম গণ্ডকর্মের উল্লেখ আছে—ক্ষাম, ফুল্ল, পূর্ণ, কম্পিত, কুঞ্চিত ও সম। গণ্ডের অবনত অবস্থাকে 'ক্ষাম' বলে। এই গণ্ডকর্ম দুঃখে প্রযুক্ত হয়। বিকশিত অবস্থাকে 'ফুল্ল' বলে। হর্ষে ব্যবহৃত হয়। বিস্তৃত অবস্থাকে 'পূর্ণ' বলা হয়। উৎসাহ ও গর্বে এই গণ্ড ব্যবহৃত হয়। স্ফুরিত অবস্থাকে 'কম্পিত' বলা হয়। রোষ ও হর্ষে এই গণ্ড প্রযুক্ত হয়। সঙ্কুচিত অবস্থাকে 'কুঞ্চিত' বলা হয়। স্পর্শে, শীতে, ভয়ে ও জ্বরে রোমাঞ্চের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে 'সম' বলা হয়। অবশিষ্ট ভাবসমূহে ব্যবহৃত হয়।

অধরক্রিয়া।—নাট্যশাস্ত্রে ছয়রকম অধরকর্মের উল্লেখ আছে—বিবর্তন, কম্পন, বিসর্গ, বিনিগূহন, সংদষ্টক ও সমুদ্গ। অধরের সঙ্কুচিতভাবকে 'বিবর্তন' বলে। অসূয়া, বেদনা, অবজ্ঞা, হাস্য প্রভৃতিতে 'বিবর্তন' ব্যবহৃত হয়। অধরের কম্পিতভাবকে 'কম্পন' বলে। ভয়, রোষ, গতি প্রভৃতিতে কম্পন ব্যবহৃত হয়। অধরকে সম্মুখদিকে বাড়িয়ে দিলে 'বিসর্গ' হয়। স্ত্রীদের বিলাসে, বিব্বোকে এবং অধরের অনুরঞ্জনে এই অধর ব্যবহৃত হয়। অধর ভেতর দিকে প্রবেশ করালে 'বিনিগূহন' হয়। অভিনন্দন ও অনুকম্পাতে এই অধর ব্যবহৃত হয়। দাঁত দিয়ে অধর দংশন করাকে 'সন্দষ্ট' বলে। যে সকল কাজে ক্রোধের উদ্রেক হয় সেই সকল ক্ষেত্রে এর ব্যবহার হয়। অধর স্বাভাবিকভাবে উন্নত থাকলে 'সমুদ্গ' হয়।

নাট্যশাস্ত্র মতে সাতরকম চিবুককর্মের কথা বলা হয়েছে, যথা—কুট্টন, খণ্ডন, ছিন্ন, চুক্কিত, লেহিত, সম ও সংদষ্ট। দাঁতের সংঘর্ষ হলে 'কুট্টন' হয়।

ওষ্ঠদ্বয় মুহুর্মুহু পরস্পরের সংস্পর্শে এলে 'খণ্ডন' হয়। ওষ্ঠদ্বয় দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ থাকলে 'ছিন্ন' হয়। ওষ্ঠদ্বয় অত্যন্ত বিচ্যুত হলে 'চুক্কিত' হয়। জিহ্বা দিয়ে লেহন করলে 'লেহন' এবং ওষ্ঠদ্বয় অল্প যুক্ত থাকলে 'সম' ও দন্ত দিয়ে অধর দংশন করলে 'সংদষ্ট' হয়। ভয়, শীত, জ্বর ও ক্রোধে 'কুট্টন' ব্যবহৃত হয়। জপ, অধ্যয়ন আলাপ ও ভক্ষণে 'খণ্ডন' ব্যবহৃত হয়। ব্যাধি, ভয়, শীত, ব্যায়াম, রোদন ও মৃত্যুতে 'ছিন্ন' ব্যবহৃত হয়। জৃম্ভণে, চুক্কিতে, লেহে, লেহন এবং স্বাভাবিকভাবে 'সম' প্রযুক্ত হয়। ক্রোধে 'সংদষ্ট' ব্যবহৃত হয়।

নাট্যশাস্ত্রে ছয় রকম আস্যকর্মের কথা বলা হয়েছে, যথা—বিনিবৃত্ত, বিধুত নির্ভুগ্ন, ভুগ্ন, বিবৃত, উদ্বাহি। মুখ ব্যাবৃত হলে 'বিনিবৃত্ত' হয়। অসূয়া, ঈর্ষ্যা, কোপ এবং স্ত্রীদিগের অবজ্ঞা ও বিহার প্রভৃতি বিষয়ে 'বিনিবৃত্ত' হয়। তির্যক ও আয়ত মুখকে 'বিধুত' বলা হয়। বারণ ও অস্বীকৃতি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। অবাঙ্মুখ হলে 'নির্ভুগ্ন' হয়। গাম্ভীর্যপূর্ণ দর্শনাদিতে প্রযুক্ত হয়। কিঞ্চিৎ আয়ত অবস্থায় থাকলে 'ভুগ্ন' হয়। স্বাভাবিক লজ্জায়, নির্বেদ, ঔৎসুক্য, চিন্তা এবং বিনয় বোঝাতে 'ভুগ্ন' ব্যবহৃত হয়। ওষ্ঠ বিশ্লিষ্ট হলে 'বিবৃত' হয়। 'বিবৃত' মুখ সাধারণতঃ হাস্য, শোক, ভয় ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়। আস্যের উদ্বাহি কর্ম, রমনীদের লীলা, গর্ব ও অনাদর প্রকাশ করে। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে বিচক্ষণ নটরা পূর্বোক্ত নাম ও কাজের অনুসরণে সাচী প্রভৃতি দর্শনের প্রয়োগ করবেন।

প্রয়োজন অনুসারে মুখরাগের পরিবর্তনের উল্লেখ আছে। চাররকম মুখরাগের বর্ণনা আছে—স্বাভাবিক, প্রসন্ন, রক্ত ও শ্যাম। স্বাভাবিক অভিনয়ে স্বাভাবিক মুখরাগ কর্তব্য। 'প্রসন্ন' মুখরাগ অদ্ভুত, হাস্য ও শৃঙ্গারে ব্যবহৃত হয়। বীর, রৌদ্র ও করুণে 'রক্ত' মুখরাগ প্রযোজ্য এবং ভয়ানক ও বীভৎসে শ্যাম মুখরাগ ব্যবহৃত হয়। এই ভাবে ভাবজনিত রসসমূহে মুখরাগের প্রয়োগ হয়ে থাকে। অভিনয়ে মুখরাগের প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সামান্য তম শারীর অভিনয়ও মুখরাগ ভিন্ন পূর্ণাঙ্গ হয় না।

নাট্যশাস্ত্রমতে নয় রকম এবং অভিনয় দর্পনের মতে চাররকম গ্রীবাভেদের উল্লেখ আছে। নাট্যশাস্ত্রমতে সমা, নতা, উন্নতা, ত্র্যস্রা, রেচিতা, কুঞ্চিতা, অঞ্চিতা, বলিতা ও বিবৃত্তা এই নয় রকম গ্রীবা কর্ম আছে। 'সমা' স্বাভাবিক অবস্থানে থাকে। ধ্যান জপ প্রভৃতি বোঝাতে এর ব্যবহার হয়। নতা'তে

গ্রীবা নত অবস্থায় থাকে। কণ্ঠলগ্ন অলঙ্কার বন্ধনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্কন্ধভার ও দুঃখ বোঝাতে এর প্রয়োগ হয়। উর্ধ্বমুখী গ্রীবাকে 'উন্নতা' গ্রীবা বলা হয়। উর্ধ্বে অবস্থিত বস্তুদর্শনে উন্নতা গ্রীবা ব্যবহৃত হয়। গ্রীবা পার্শ্ব গত হলে 'ত্র্যস্রা' হয়। গ্রীবা কম্পিত ও আন্দোলিত হলে 'রেচিত' হয়। এই গ্রীবা মথনে ও নৃত্তে ব্যবহৃত হয়। গ্রীবা ঈষৎ অবনত হ'লে 'কুঞ্চিত' হয়। মস্তকে ভারবহন, গলরক্ষণ প্রভৃতিতে এর প্রয়োগ হয়। গ্রীবা উর্ধ্বে ঈষৎ অপসৃত হলে 'অঞ্চিত' হয়। উদ্বন্ধ কেশকর্ষণে ও উর্ধ্বে দর্শনে এটি প্রযুক্ত হয়। গ্রীবা পার্শ্বাভিমুখী হলে 'বলিতা' হয়। গ্রীবাভঙ্গে ও পার্শ্ববীক্ষণে এই গ্রীবা ব্যবহৃত হয়। গ্রীবা অভিমুখী হ'লে 'বিবৃত্তা' হয়। স্বস্থানে ও অভিমুখে এই গ্রীবা প্রযুক্ত হয়।

অভিনয় দর্পণে চাররকম গ্রীবাভেদের উল্লেখ আছে। এগুলি হচ্ছে— সুন্দরী, তিরশ্চীনা, পরিবর্তিতা ও প্রকম্পিতা।

"সুন্দরীচ তিরশ্চীনা তথৈব পরিবর্ত্তিতা
প্রকম্পিতা চ ভাবজ্ঞৈর্জ্ঞেয়া গ্রীবা চতুর্বিধা। (অভিনয় দর্পণ শ্লোক নং-৭৯)

তির্যকভাবে চালিত গ্রীবাকে 'সুন্দরী' বলা হয়। স্নেহের প্রারম্ভে, যত্নে, ভাল এই অর্থে, বিস্তারে সরসভাবে অনুমোদনে এই গ্রীবা ব্যবহৃত হয়।

উভয়পার্শ্বে উর্ধ্বদিকে সর্পগতির মত চালিত হলে নাট্যশাস্ত্রজ্ঞগণ সেই গ্রীবাকে 'তিরশ্চীনা' বলে থাকেন। খড়্গচালনার জন্য, শ্রমে ও সর্পগতি দেখাতে তিরশ্চীনা গ্রীবা প্রযুক্ত হয়।

যখন গ্রীবা অর্দ্ধচন্দ্রের আকারে বামে ও দক্ষিণে চালিত হয় তাকেই নাট্যকলাবিদ্‌রা 'পরিবর্ত্তিতা' বলে থাকেন। শৃঙ্গার রসযুক্ত নটনে ও কান্তার গণ্ডদ্বয়ে চুম্বনে পরিবর্ত্তিতা ব্যবহৃত হয়।

সম্মুখে ও পশ্চাতে কপোতীর কণ্ঠ কম্পনের মত গ্রীবা চালিত হলে তাকে 'প্রকম্পিতা' গ্রীবা বলা হয়। 'তুমি' ও 'আমি' বোঝাতে, বিশেষ করে দেশীনাট্যে প্রকম্পিতা গ্রীবা ব্যবহৃত হয়।

নাট্যশাস্ত্রানুসারে বক্ষঃস্থলের কাজ পাঁচরকম— আভুগ্ন, নির্ভুগ্ন, প্রকম্পিত, উদ্বাহিত ও সম।

আভুগ্ন—বক্ষঃস্থল সঙ্কুচিত করে পিঠের মধ্যদেশ উন্নত রাখলে এবং স্কন্ধদেশ দুটি মধ্যে মধ্যে শিথিল করলে আভুগ্ন হয়। সম্ভ্রম, বিষাদ, মূর্চ্ছা,

শোক, ভয়, ব্যাধি, বাণবিদ্ধ হৃদয়, শীত স্পর্শ, সলজ্জভাব প্রকাশে এই গ্রীবা ব্যবহৃত হয়।

নিভুর্গ্ন—পিঠ স্তব্ধ ও নিম্ন, স্কন্ধদেশ বক্র ও উন্নত থাকলে নিভুর্গ্ন হয়। স্তম্ভে, মানগ্রহণে, বিস্ময়ে, সত্যবচনে, 'আমি' এই রকম গর্বিত বচনে এর প্রয়োগ হয়। মতান্তরে দীর্ঘনিঃশ্বাসে, জৃম্ভণে (হাই তোলা), ষোটনে, (পেষণে), স্ত্রীলোকদের বিব্বোক ভাব প্রকাশে ব্যবহৃত হয়।

প্রকম্পিত—বক্ষঃস্থল নিরন্তর স্ফীত হলে তাকে 'প্রকম্পিত' বলা হয়। হাস্যে, রোদনে, শ্রমে, ভয়ে, শ্বাসকাশে, হিক্কায় ও দুঃখে এর প্রয়োগ হয়।

উদ্বাহিত—বক্ষঃস্থল উন্নত করলে 'উদ্বাহিত' বলা হয়। দীর্ঘনিঃশ্বাসে, উন্নত বস্তুদর্শনে, জৃম্ভণাদিতে এর ব্যবহার আছে।

সম—অঙ্গ, প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক বিন্যাসহেতু বক্ষঃস্থলের যে সুন্দর ও স্বাভাবিক অবস্থা, তাকে 'সম' বলে।

শরীরের পার্শ্বদ্বয়ের কাজ পাঁচরকম—নত, উন্নত, প্রসারিত, বিবর্তিত ও অপসৃত।

নত—কটিদেশ বিশেষভাবে এবং পার্শ্বদেশ ঈষৎ বক্র হলে ও স্কন্ধদেশ কিঞ্চিৎ অপসৃত হলে তাকে 'নত' বলে।

উন্নত—নত পার্শ্বের বিপরীত পার্শ্বকে উন্নত বলা হয়। এতে কটিদেশ, পার্শ্বদেশ, বাহু ও স্কন্ধদেশ সমস্তই উন্নত রাখতে হবে।

প্রসারিত—পার্শ্বদেশ উভয়দিকে প্রসারিত করলে তাকে 'প্রসারিত' বলে।

বিবর্তিত—তিনটির (কটিদেশ পার্শ্বদেশ ও স্কন্ধদেশ) নানারকম পরিবর্তন করলে তাকে বিবর্তিত বলে।

অপসৃত—পার্শ্বদেশ বারবার বাইরের দিকে ঠেলে দিয়ে ভেতরের দিকে টেনে নেওয়াকে 'অপসৃত' বলে। সামনের দিকে যাওয়ার সময় 'নত', পেছনদিকে যাওয়ার সময় 'উন্নত', হর্ষাদি প্রকাশে প্রসারিত পরিবর্তনে বিবর্তিত এবং নিবৃত্তিতে 'অপসৃত' পার্শ্ব ব্যবহৃত হয়।

ভরত তিন রকম জঠরকর্মের উল্লেখ করেছেন—ক্ষাম, খর্ব ও পূর্ণ। মতান্তরে 'সম' যোগ করে চাররকম বলেছেন।

ক্ষাম—শ্বাসক্রিয়ার দ্বারা উদরটিকে ক্ষীণ করলে 'ক্ষাম', নত করলে 'খর্ব' এবং বায়ুর দ্বারা উদর পূর্ণ রাখলে 'পূর্ণ' বলা হয়। হাস্যে, রোদনে, জৃম্ভণে,

ও নিঃশ্বাসে শ্বাসের প্রযোগ হয়। ব্যাধিগ্রস্তে, তপস্যায়, শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় 'খব' ব্যবহৃত হয়। উচ্ছ্বাসে, স্থূলে, প্লীহাদি ব্যাধিগ্রস্তে ও অতি ভোজনে 'পূর্ণ' ব্যবহৃত হয়।

নাট্যশাস্ত্রে পাঁচরকম কটিকর্মের উল্লেখ আছে,—ছিন্না, নিবৃত্তা, রেচিতা, কম্পিতা ও উদ্বাহিতা।

ছিন্না—কটির মধ্যদেশ চক্রাকারে ঘোরালে 'ছিন্না' হয়।

নিবৃত্তা—কটিদেশকে পরাঙ্মুখী করলে 'নিবৃত্তা' হয়।

রেচিতা—কটিদেশকে চক্রাকারে চতুর্দিকে ঘোরালে রেচিতা হয়।

কম্পিতা—কটিদেশকে তির্যগ্‌ভাবে তাড়াতাড়ি চালনা করলে 'কম্পিতা' হয়।

উদ্বাহিতা—নিতম্বের পার্শ্বদেশ পর্যায় ক্রমে উন্নত ও অবনত হলে 'উদ্বাহিতা' হয়।

ব্যায়ামে, সম্ভ্রমে, ও পশ্চাৎ অবলোকনে 'ছিন্না' ব্যবহৃত হয়। পরাঙ্মুখ হয়ে অবস্থানে 'নিবৃত্তা' ব্যবহৃত হয়। কটিদেশের ভ্রমণাদিতে 'রেচিতা' ব্যবহৃত হয়। কুঁজো, বামন ও নীচদের গমনে 'কম্পিতা' ব্যবহৃত হয়। স্থূলকায় স্ত্রীলোকের গমনে এবং বিশেষ ভঙ্গীসহকারে চলনে 'উদ্বাহিতা' ব্যবহৃত হয়।

পাঁচরকম উরুকর্মের উল্লেখ করা হয়েছে - কম্পন, বলন, স্তম্ভন, উদ্বর্তন ও নিবর্তন।

কম্পন—বার বার গোড়ালিকে ওপর ও নীচে করলে 'কম্পন' হয়।

বলন—জানু দুটিকে ভেতরদিকে চালনা করলে 'বলন' হয়।

স্তম্ভন—উরু দুটি স্তব্ধভাবে থাকলে 'স্তম্ভন' হয়।

উদ্বর্তন—উরুর মাংসপেশীকে উর্ধ্বদিকে মৃদু চালনা করলে 'উদ্বর্তন' হয়।

নিবর্তন—গোড়ালি ভেতরদিকে চালনা করলে 'নিবর্তন' হয়। অধম পাত্রদের গমনে ও ভয়ে 'কম্পন', স্ত্রীলোকদের স্বাভাবিক গমনে বলন, ভয়ে ও বিষাদে স্তম্ভন, ব্যায়াম ও তাণ্ডবে উদ্বর্তন এবং ব্যস্তভাবে পরিক্রমাদিতে 'বিবর্তন' ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া লোক ব্যবহারের অনুসরণে প্রয়োজনমত উরুকর্ম করা যেতে পারে।

জঙ্ঘাকর্ম পাঁচরকম হয়ে থাকে—'আবর্তিত,' 'নত', 'ক্ষিপ্ত', উদ্বাহিত' ও 'পরিবৃত্ত'। পদদ্বয় যথাক্রমে দক্ষিণ থেকে বামে এবং বাম থেকে দক্ষিণে স্বস্তিক

ভাবে স্থাপন করলে 'আবর্তিত', জানুদ্বয় আনত করলে 'নত' এবং জঙ্ঘা বাইরের দিকে নিক্ষেপ করলে 'ক্ষিপ্ত' হয়। জঙ্ঘা উর্ধ্বে উত্তোলন করলে 'উদ্বাহিত' হয়। বিপরীত ভাবে জঙ্ঘার স্থাপনে 'পরিবৃত্ত' হয়। বিদূষকের পরিক্রমায় 'আবর্তিত,' স্থানাসন ও গমনাদিতে 'নত,' ব্যায়াম ও তাণ্ডবে 'ক্ষিপ্ত' জঙ্ঘাদ্বয় উর্ধ্বে উত্তোলন করতে করতে (বকের মতন চলনে) অগ্রসর হলে 'উদ্বাহিত' এবং তাণ্ডবাদিতে 'পরিবৃত্ত' হয়।

পাদকর্ম পাঁচরকম—উদ্ঘট্টিত, সম, অগ্রতলসঞ্চর, অঞ্চিত ও কুঞ্চিত।

উদ্ঘট্টিত—পদতলের অগ্রভাগের সাহায্যে দণ্ডায়মান হয়ে যদি গোড়ালি ভূমিতে স্থাপন করা যায়, তবে তাকে 'উদ্ঘট্টিত' বলা হয়। উদ্ঘট্টিত পদ দ্রুত অথবা মধ্যলয়ে 'উদ্বেষ্টিত' করণে একবার অথবা বার বার প্রয়োগ করতে হয়।

সম—পদদ্বয় স্বাভাবিক অবস্থায় সমভাবে সমতল ভূমিতে স্থাপন করলে 'সমপদ' হয়। মুনি ভরত সমপদের প্রসঙ্গে তার অঙ্গীভূত আর একটি পদকর্মের কথাও উল্লেখ করেছেন। এর নাম ত্র্যস্রপদ। সমপদের গোড়ালিদুটি (পার্ষ্ণিদ্বয়) অভ্যন্তরে এবং অঙ্গুষ্ঠদ্বয় পরস্পর বিপরীতমুখে পার্শ্বদেশে স্থাপন করলে 'ত্র্যস্র' পদ হয়। ভয় ভীতাদি অবস্থার প্রকাশে এই পদ ব্যবহৃত হয়।

অগ্রতলসঞ্চর—আঙুলগুলো সম্মুখদিকে প্রসারিত এবং পার্ষ্ণি দুটি (গোড়ালি) উৎক্ষিপ্ত করে সমস্ত আঙুলগুলি চালিত করলে 'অগ্রতলসঞ্চর' হয়। পীড়নে, একস্থানে অবস্থানকরে ঝুঁকবার ক্রিয়ায়, ভূমিতে আঘাত করণে, ভ্রমণ প্রভৃতি কাজে এই পদ ব্যবহৃত হয়।

অঞ্চিত—গোড়ালি মাটিতে স্থাপিত, অগ্রপদতল বা পদাগ্রভাগ উন্নমিত এবং আঙুলগুলো বক্র হলে সেই পদ 'অঞ্চিত' নামে অভিহিত হয়।

কুঞ্চিত—পার্ষ্ণি উৎক্ষিপ্ত, আঙুলগুলি কুঞ্চিত এবং পদের মধ্যভাগও কুঞ্চিত হলে তাকে 'কুঞ্চিত' পদ বলে। উদাত্ত গমনে, বর্তিতোদ্বর্তনে এবং অতিক্রমণে এই পদ ব্যবহৃত হয়। এই প্রসঙ্গে ভরত আর একটি পদকর্মের উল্লেখ করেছেন। এর নাম 'সূচী' পদ। বামপদ স্বাভাবিক রেখে দক্ষিণপায়ের পার্ষ্ণি উৎক্ষিপ্ত করে দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগের সাহায্যে অবস্থান করলে 'সূচী' পদ হয়। নৃত্তে এবং 'নূপুর' করণে এর প্রয়োগ হয়।

চারী—গতিপ্রধান হচ্ছে 'চারী' এবং স্থিতিপ্রধান হচ্ছে 'স্থান'। গতির পর স্থিতি এবং স্থিতির পর আবার গতি। নাট্যশাস্ত্রে 'চারী' সম্বন্ধে মুনি ভরত বলেছেন—

এবং পাদস্য জঙ্ঘায়া উরোঃ কট্যাস্তথৈব চ
সমান করণে চেষ্টা চারীতি পরিকীর্তিতা।

পাদ, জঙ্ঘা, উরু এবং কটির সমানভাবে সঞ্চালনকে 'চারী' বলা হয়। শৃঙ্খলাযুক্ত ও বিধিবদ্ধ চারীসমূহের পরম্পর সম্পাদনকে 'ব্যায়াম' বলে। ব্যায়ামের চারটি ভেদ আছে—চারী' করণ, খণ্ড ও মণ্ডল। পদের প্রচার 'চারী' নামে অভিহিত হয়। দ্বিপাদক্রমণকে 'করণ' বলা হয়। তিনটি করণের সমাযোগ হলে 'খণ্ড হয়। তিনটি অথবা চারটি খণ্ডের সমাযোগে এক একটি মণ্ডল হয়। নৃত্তে, গতিতে, অস্ত্রনিক্ষেপে ও যুদ্ধে এর প্রয়োগ হয়। নাট্যে চারী অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

"চারীভিঃপ্রস্তুতং নৃত্তং চারীভিশ্চেষ্টিতংতথা
চারীভিঃশস্ত্রমোক্ষশ্চ চার্যো যুদ্ধে চ কীর্তিতাঃ॥

"চারীসমূহের দ্বারাই নৃত্ত প্রস্তুত হয়। চারীর দ্বারা বিবিধ ক্রিয়া, অস্ত্রক্ষেপণ ও যুদ্ধের অভিনয়ও হয়।

নাট্যে চারী ছাড়া কোন অঙ্গহার নিষ্পন্ন হতে পারে না। ভৌমী ও আকাশিকী ভেদে চারী দুরকম। তার মধ্যে ভৌমী চারী ষোলরকম— সম পাদা, স্থিতাবর্তা, শকটাস্যা, অধ্যর্ধিকা, চাষগতি, বিচ্যবা, এড়কাক্রীড়িতা, বদ্ধা, উরুদ্বৃত্তা, অড্ডিতা, উৎস্পন্দিতা, জনিতা, স্যন্দিতা, অপস্যন্দিতা, সমোৎসরিত মত্তল্লী ও মত্তল্লী। আকাশিকী ষোলরকম—অতিক্রান্তা, অপক্রান্তা, পার্শ্বক্রান্তা, ঊর্ধ্বজানু, সূচী, নূপুরপাদিকা, ডোলাপাদ, আক্ষিপ্তা, আবিদ্ধা, উদ্বৃত্তা, বিদ্যুদ্‌ভ্রান্তা, অলাতা, ভুজঙ্গত্রাসিতা, হরিণপ্লুতা, দণ্ডপাদা ও ভ্রমরী।

সমপাদা—পদদ্বয় সমানভাবে স্থাপন করে একস্থানে অবস্থান করলে 'সমপাদা 'চারী হয়, সমপাদে স্থানান্তরে গমন করলেও 'সমপাদা' চারী হয়।

স্থিতাবর্তা—তলসঞ্চর পায়ের দ্বারা ভূমি ঘর্ষণ করে অভ্যন্তরে মণ্ডল করতে হবে। অন্য পদের দ্বারা পুনরাবৃত্তি করতে হবে। অভিনব গুপ্তের টীকায় বলা হয়েছে যে অগ্রতল সঞ্চরণের দ্বারা মণ্ডলাকারে অভ্যন্তরভাগে ভূমি ঘর্ষণ করে দ্বিতীয় পাশে আস্বস্তিক করতে হবে।

শকটাস্যা—বিশ্রান্তদেহে তলসঞ্চর পা প্রসারিত করে উদ্বাহিত বক্ষে শকটাস্যা করতে হবে। (অভিনবগুপ্তের টীকা—একপায়ের অঙ্গুলিগুলি কুঞ্চিত করে এবং জানু কুঞ্চিত ও জঙ্ঘা প্রসারণ করে নিজের পাশে ত্রিকোণাকৃতি সৃষ্টি করলে শকটাস্যা হয়।) বক্ষ উদ্বাহিত হবে।

অধ্বর্ধিকা ঃ—দক্ষিণ পদের গোড়ালির পেছনে বামপদকে স্থাপন করতে হবে। (অভিনবগুপ্তর টীকা—বাম ও দক্ষিণ পদ পর্যায়ক্রমে একে অপরের পশ্চাতে থাকবে।)

চাষগতি—দক্ষিণ চরণ প্রসারিত করে পুনরায় সেটিকে টেনে নিতে হবে বাম চরণও টেনে নিতে হবে। (অভিনব গুপ্তের টীকা—দক্ষিণ চরণ সম্মুখ ভাগে একতালমাত্র প্রসারিত করে আবার দুতাল পেছনে অপসারণ কালে কিঞ্চিৎ-উৎপ্লুত হয়ে বাম চরণটিকেও দক্ষিণ চরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্টভাবে পেছনে আনতে হবে।

বিচ্যবা—সমপদ বিচ্যুত করে পায়ের তলদেশের অগ্রভাগ দ্বারা ভূমি ঘর্ষণ করলে বিচ্যবা হয়।

এড়কাক্রীড়িতা—তলসঞ্চর পদদ্বয়ের দ্বারা পর্যায়ক্রমে উল্লম্ফন ও পতন হলে এড়কাক্রীড়িতা হয়।

বদ্ধা—জঙ্ঘাদ্বয়ের দ্বারা স্বস্তিক করে উরুদ্বয়ের দ্বারা বলন করলে বদ্ধা হয়। (অভিনব গুপ্তের টীকা—কেউ কেউ বলেন জঙ্ঘা স্বস্তিক করে অপসারণ পূর্বক দুটি পদতলের অগ্রভাগ ক্রমান্বয়ে মণ্ডলাকারে ঘুরিয়ে স্ব স্ব পার্শ্বে গমন করলে বদ্ধা হয়।

উরূদ্বৃত্তা—অগ্রতল সঞ্চর পায়ের গোড়ালি বহির্মুখী ও উঁচু হলে এবং জঙ্ঘা ও জানু নমিত ও কুঞ্চিত হলে এবং দ্বিতীয় জঙ্ঘাটি বিস্তারিত হলে উরূদ্বৃত্তা হয়।

অড্ডিতা—অগ্রতলসঞ্চর পায়ের অগ্রভাগ দ্বিতীয় পায়ের অগ্র বা পশ্চাতের পায়ের দ্বারা ঘর্ষিত হলে অড্ডিতা হয়।

উৎস্পন্দিতা—যদি পদদ্বয় রেচকানুসারে বাইরে ও অভ্যন্তরে সঞ্চালিত হয়, তাহলে তাকে উৎস্পন্দিতা বলে। (অভিনবগুপ্তের টীকা—বাইরের দিকে কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা এবং অভ্যন্তরে অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা রেচক করতে হবে।)

জনিতা—তলসঞ্চর পায়ে দণ্ডায়মান হয়ে একটি হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বক্ষে স্থাপন করলে এবং অন্য হাতটি স্বাভাবিক রাখলে জনিতা হয়।

স্যন্দিতা ও অপস্যন্দিতা—প্রথম চরণকে পাঁচতাল দূরে প্রসারিত করলে স্যন্দিতা এবং দ্বিতীয় চরণটিও সেইরকম করলে অপস্যন্দিতা হয়।

সমোৎসরিত-মত্তলী—তলসঞ্চর পায়ে ঘুরতে ঘুরতে অগ্রসর হওয়াকে সমোৎসরিত মত্তলী বলে। অভিনব গুপ্ত টীকায় বলেছেন জঙ্ঘা স্বস্তিক করে ঘুরতে হবে।

মত্তল্লী—সমোৎসরিত মত্তলীতে উদ্বেষ্টিত ও অপবিদ্ধ হস্তের প্রয়োগ হলেই মত্তল্লী হয়।

আকশিকী চারী—

অতিক্রান্তা চারী—একটি চরণকে কুঞ্চিত করে অপর চরণের গোড়ালিতে স্থাপন করে সম্মুখদিকে কিঞ্চিত প্রসারিত করতে হবে এবং ওই চরণটিকে উৎক্ষিপ্ত করে পায়ের অগ্রভাগ দ্বারা ভূমি স্পর্শ করতে হবে। একে অতিক্রান্ত চারী বলে।

অপক্রান্তা—উরুদুটিতে বলন করে কুঞ্চিত চরণকে উঠিয়ে পাশে নিক্ষেপ করলে অপক্রান্তা হয়।

পার্শ্বক্রান্তা—একটি চরণকে কুঞ্চিত অবস্থায় বুক পর্যন্ত উৎক্ষিপ্ত করে উদ্‌ঘট্টিত চরণে পাশে নিক্ষেপ করলে পার্শ্বক্রান্তা হয়।

ঊর্ধ্বজানু—একটি চরণকে কুঞ্চিত করে বুক পর্যন্ত-উৎক্ষিপ্ত করে স্থাপন-পূর্বক দ্বিতীয় চরণটিকে নিশ্চল রাখলে ঊর্ধ্বজানু হয়।

সূচী—একই চরণকে উৎক্ষিপ্ত করে জানু পর্যন্ত জঙ্ঘাকে প্রসারিত করে পুনরায় অগ্রভাগের দ্বারা ভূমি স্পর্শ করলে সূচী হয়।

নূপুরপাদিকা—একটি চরণকে অঞ্চিত করে তাকে পিঠের দিকে বক্র করে গোড়ালিকে নিতম্ব পর্যন্ত নিয়ে অগ্রতল চরণের দ্বারা দ্রুত ভূমিতে স্থাপন করলে নূপুরপাদিকা হয়।

ডোলপাদা—কুঞ্চিত পদকে উৎক্ষিপ্ত করে এক পার্শ্ব থেকে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত দুলিয়ে অঞ্চিত পদে স্থাপন করলে ডোলপাদা হয়।

আক্ষিপ্তা—কুঞ্চিত চরণকে উৎক্ষিপ্ত করে অঞ্চিত অবস্থায় স্থাপন করবার পর জঙ্ঘা স্বস্তিক করলে আক্ষিপ্তা হয়।

আবিদ্ধা—স্বস্তিকে দাঁড়িয়ে সম্মুখের চরণটি কুঞ্চিত অবস্থায় প্রসারিত করে পুনরায় ওই চরণটিকে নিজস্থানে এনে অপর চরণের গোড়ালির পাশে গোড়ালির দ্বারা স্থাপন করলে 'আবিদ্ধা' হয়।

উদ্বৃত্তা—'আবিদ্ধা' চরণকে আবেষ্টিত করে উরু পর্যন্ত উঠিয়ে লাফিয়ে ভূমিতে রেখে দ্বিতীয় চরণটি পুনরায় ওই রকম করলে 'উদ্বৃত্তা' হয়।

বিদ্যুদ্ভ্রান্তা—উরুদেশের মূল থেকে চরণটিকে পিঠের দিকে ঘুরিয়ে মস্তক স্পর্শ করে পরে উর্ধ্বে, পাশে, অধোমুখে মণ্ডলাকারে ঘুরিয়ে প্রসারিত করলে 'বিদ্যুদ্ভ্রান্তা' হয়।

অলাতা—প্রথমে একটি চরণকে প্রসারিত করে পুনরায় অভ্যন্তরে এনে দ্বিতীয় উরুদেশের পাশ ঘেঁসে পার্শ্বপার্ষ্ণির দ্বারা ভূমিতে রাখলে 'অলাতা' হয়।

ভুজঙ্গত্রাসিতা—দ্বিতীয় চরণের উরুমূল পর্যন্ত কুঞ্চিত চরণকে উৎক্ষিপ্ত করে কটি ও জানু বিবর্তনের দ্বারা (ঘূর্ণন) নিতম্বের সম্মুখভাগে পার্ষ্ণি স্থাপন পূর্বক ত্রিকোণাকৃতি সৃষ্টি করে উরুকে চালনা করলে 'ভুজঙ্গত্রাসিতা' হয়।

হরিণপ্লুতা—কুঞ্চিত চরণকে উৎক্ষিপ্ত করে অথবা অতিক্রান্তচারী করে এবং উৎপ্লুত করে ভূমি স্পর্শ করে দ্বিতীয় জঙ্ঘাটিকে পেছনের দিকে ক্ষেপণ করলে 'হরিণপ্লুতা' হয়।

দণ্ডপাদা—নূপুর পাদিকাকে অপর পার্ষ্ণিগত করে সম্মুখভাগে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রসারিত করে আবিদ্ধ করলে 'দণ্ডপাদা' হয়।

ভ্রমরী—অতিক্রান্ত চারীতে ত্রিককে ঘুরিয়ে দ্বিতীয় পদের তলদেশের দ্বারা তিনবার ঘুরলে 'ভ্রমরী' হয়।

অভিনয় দর্পণে আট রকম চারীর কথা বলা হয়েছে।

চলনম্—স্বস্থান থেকে নিজ পায়ের চলনে চলন 'চারী হয়।

চঙ্ক্রমণম্—সযত্নে পদদ্বয় উৎক্ষিপ্ত করে পর্যায়ক্রমে পাশের দিকে ক্ষেপণ করলে চঙ্ক্রমণম হয়।

সরণম্— [১]জলুকার মত চলন, অর্থাৎ এক পার্ষ্ণি দিয়ে অপর পার্ষ্ণি স্পর্শ পূর্বক তির্যগ্‌ভাবে ভূমিতে পদ কর্ষণ করতে হয় এবং দুই হাতে পতাকাধারণ করে যে চলন, তাকে সরণ চারী বলে।

১। জলুকা—জোঁক।

বেগিনী—পার্ষ্ণি অথবা চরণের অগ্রভাগ দ্বারা দ্রুতগতিতে চলন ও করদ্বয়ে যথাক্রমে অলপদ্ম ও ত্রিপতাক ধারণ—এইভাবে নর্তন করলে বেগবত্তা-হেতু বেগিনী চারী হয়ে থাকে।

কুট্টনম—পার্ষ্ণি, চরণের অগ্রভাগ, অথবা সমস্ত পদতল দিয়ে যে ভূতলের ওপর আঘাত করা হয় তাকে কুট্টন বলে।

লুঠিতম্ স্বস্তিক চরণের অগ্রভাগ দিয়ে কুট্টন করলে লুঠিত হয়।

লোলিতম্ পূর্বের মত কুট্টনপূর্বক ভূমিতে চরণ স্পর্শ না করে অতি ধীরে ধীরে পদচালনা করলে লোলিতম্ হবে।

বিষমসঞ্চর—দক্ষিণ চরণের দ্বারা বাম চরণ এবং বামচরণের দ্বারা দক্ষিণ চরণ বেষ্টনপূর্বক যথাক্রমে পদবিন্যাস করলে বিষমসঞ্চর হয়।

চারীর সংযোগে মণ্ডল হয়। নাট্যশাস্ত্রানুসারে 'মণ্ডল' বিশরকম। এর মধ্যে দশ রকম আকাশগ মণ্ডল ও দশরকম ভূমি মণ্ডল। অভিনয় দর্পণে মণ্ডলকে পাদভেদের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে—মণ্ডল, উৎপ্লবন, ভ্রমরী ও পাদচারিকা। নাট্যশাস্ত্রানুসারে দশটি আকাশগ মণ্ডলের নাম অতিক্রান্ত, বিচিত্র, ললিতসঞ্চর, সূচীবিদ্ধ, দণ্ডপাদ, বিহৃত, অলাতক, বামবিদ্ধ, সললিত ও ক্রান্ত। ভূমি মণ্ডল হচ্ছে ভ্রমর, আস্কন্দিত, আবর্ত, সমোৎসরিত, এড়কাক্রীড়িত, অড্ডিত, শকটাস্য অর্ধ ধর্ক, পিষ্টকুট্ট. চাষগত।

মণ্ডল—(অভিনয়দর্পন অনুসারে)

স্থানক মণ্ডল—এক সমরেখায় সমপাদে দণ্ডায়মান হয়ে উভয় হাতে অর্ধ চন্দ্র ধারণ করে কটিদেশে রাখলে 'স্থানক মণ্ডল' হয়।

আয়ত মণ্ডল—এক বিতস্তি অন্তরে পা দুটি চতুরস্র ভঙ্গিতে রেখে কুঞ্চিত জানুদ্বয় তির্যক ভঙ্গিতে রাখলে আয়ত মণ্ডল হয়।

আলীঢ় মণ্ডল—দক্ষিণ পায়ের তিন বিঘৎ আগে বামপদ বিন্যস্ত করতে হবে পরে বাম হাতে শিখর ও দক্ষিণ হাতে যদি কটকামুখ ধারণ করা যায় তাহলে আলীঢ় মণ্ডল হয়।

প্রত্যালীঢ় মণ্ডল—আলীঢ় মণ্ডলকে বিপরীত করলে প্রত্যালীঢ় মণ্ডল হয়।

প্রেঙ্খণ মণ্ডল—এক পায়ের পার্ষ্ণির পাশে আর এক পা প্রসারিত করে কূর্মহস্তে দাঁড়ালে প্রেঙ্খণ মণ্ডল হয়।

প্রেরিত মণ্ডল—তিন বিঘৎ অন্তরে এক পদ সবেগে ভূমিতে আঘাত করে জানু দ্বয় কুঞ্চিত করতে হবে। একহাতে শিখর করে বুকের কাছে রাখতে হবে এবং অন্যহাতে পতাকা প্রদর্শন করতে হবে।

স্বস্তিকমণ্ডল—বিপর্যয়ক্রমে ডান ও বাম পায়ের ওপর পা এবং হাতের ওপর হাত রাখলে স্বস্তিক মণ্ডল হয়। অর্থাৎ ডান পা বাম পায়ের ওপর এবং ডান হাত বাম হাতের ওপর এবং পরে পরিবর্তন করে বাম পা ডান পায়ের ওপর এবং বাম হাত ডান হাতের সঙ্গে রাখলে স্বস্তিক মণ্ডল হয়।

মোটিত মণ্ডলম—পায়ের অগ্রভাগের দ্বারা মাটিতে দাঁড়িয়ে জানুদুটির এক একটি দ্বারা পর্যায়ক্রমে ভূতল স্পর্শ করতে হবে ও উভয় হাতেই ত্রিপতাক ধারণ করতে হবে। একে মোটিতমণ্ডল বলা হয়।

সমসূচী মণ্ডল—পায়ের অগ্রভাগ ও জানুদুটির দ্বারা যদি ভূতল স্পর্শ করা যায় তবে সমসূচীমণ্ডল হয়।

পার্শ্বসূচী মণ্ডল—পায়ের অগ্রভাগের দ্বারা দাঁড়িয়ে যদি একপাশে একটি জানু দ্বারা ভূতল স্পর্শ করা যায় তবে পার্শ্বসূচীমণ্ডল হয়।

পাদভেদ—ওপরে আলোচিত চারী ও মণ্ডল অভিনয় দর্পণে কথিত পাদ-ভেদের অন্তর্গত। অভিনয় দর্পণে চাররকম পায়ের ভেদ নির্ণয় করা হয়েছে, যথা—মণ্ডল, উৎপ্লবন, ভ্রমরী ও চারী।

উৎপ্লবন—অভিনয়দর্পণে পাঁচরকম উৎপ্লবনের কথা বলা হয়েছে—অলগ, কর্তরী, অশ্বোৎপ্লবন, মোটিত ও কৃপালগ।

অলগোৎপ্লবনম্—উভয়পার্শ্ব সঞ্চালন করে লাফিয়ে শিখর হস্ত ধারণ করে কটিদেশে রাখতে হবে। তবেই অলগ উৎপ্লাবন হবে।

উৎপ্লবনকর্তরী—পায়ের অগ্রভাগ দিয়ে লাফিয়ে বামপায়ের পশ্চাতে একহাতে কর্তরীবিন্যাস করবে। অধোমুখ শিখরযুক্ত অপর হাতটিকে কটিতে রাখতে হবে। একে উৎপ্লবন কর্তরী বলা হয়।

অশ্বোৎপ্লবনম্—পুরোভাগে (সম্মুখে) একটি পায়ে ভর দিয়ে লাফিয়ে পশ্চাতের পদটিও তার সঙ্গে নিয়োজিত করতে হবে। দুই হাতে ত্রিপতাক ধারণ করলেই অশ্বোৎপ্লবনম্ হবে।

মোটিতোৎপ্লবনম্—কর্তরীর মত পর্যায়ক্রমে উভয় পার্শ্বে উৎপ্লবন করতে হবে। সর্বদা প্রকাশের জন্য উভয় হাতে ত্রিপতাক ধারণ হবে।

কুপালগোৎপ্লবনম্—পর্যায়ক্রমে ক এক পায়ের পাষ্ণি কটিতে ন্যস্ত করতে হবে। অপরটি অর্ধচন্দ্রকলার মধ্যে ন্যস্ত করলে কুপালগ হয়।

ভ্রমরী—অভিনয় দর্পণে সাত রকম ভ্রমরীর উল্লেখ আছে (১ উৎপ্লুত ভ্রমরী (২) চক্রভ্রমরী (৩) গরুড় ভ্রমরী (৪) একপাদ ভ্রমরী (৫) কুঞ্চিত ভ্রমরী (৬) আকাশভ্রমরী (৭) অঙ্গভ্রমরী

উৎপ্লুতভ্রমরী—সমপদে অবস্থান করে পদদ্বয়ের দ্বারা উৎপ্লুত করে যদি সর্বাঙ্গ অন্তরালে ভ্রামিত করায় তাহলে উৎপ্লুতভ্রমরী হয়।

চক্রভ্রমরী—উভয় করে ত্রিপতাক ধারণ করে পদদ্বয়ের দ্বারা ভূমিতে মুহুর্মুহু ঘর্ষণ করে চক্রের মত ভ্রমণ করলে চক্রভ্রমরী হয়।

গরুড়ভ্রমরী—একটি পদ তির্যগ্‌ভাবে প্রসারিত করে পশ্চাতের জানু-ভূমিতে স্পর্শ করে বাহুদ্বয় সম্যগভাবে প্রসারিত করে ভ্রামিত করলে গরুড় ভ্রমরী হবে।

একপাদভ্রমরী—এক পায়ে ভর দিয়ে অপর পদটি ঘোরালে একপাদ ভ্রমরী হবে।

কুঞ্চিতভ্রমরী—জানু কুঞ্চিত করে ঘুরলে কুঞ্চিতভ্রমরী হয়।

আকাশভ্রমরী—উৎপ্লবনপূর্বক পদদ্বয় বিরল (সংশ্লিষ্ট নয়) ও প্রসারিত করে সকল অঙ্গ (গাত্র) ঘোরাতে হবে।

অঙ্গভ্রমরী—পদদ্বয় এক বিতস্তি অন্তরে রেখে অঙ্গ ভ্রমণপূর্বক স্থিতিলাভ করলে অঙ্গভ্রমরী হয়।

গতি—অভিনয়দর্পণে গতির কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। তবে কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রাণীর প্রসিদ্ধ গতির অনুকরণে কয়েকটি বিশিষ্ট গমন ভঙ্গীকে গতি বলা হয়েছে। এদের সংখ্যা মাত্র দশটি—হংসী, ময়ূরী, মৃগী, গজলীলা, তুরঙ্গিনী, সিংহী, ভুজঙ্গী মণ্ডুকী বীরা ও মানবী।

হংসীগতি—দেহপার্শ্ব পরিবর্তন পূর্বক উভয় হাতে কপিত্থ ধারণ করে এক বিতস্তি অন্তর এক একটি পদ ন্যাস করে হংসের মত গমন করলে তাই হংসী গতি হয়।

ময়ূরী গতি—উভয় পায়ের আঙুলের অগ্রভাগ দ্বারা ভূমিতে দণ্ডায়মান হয়ে দুই হাতে কপিত্থ করে এক একটি জানু চালনা করলে ময়ূরী গতি হয়।

মৃগী গতি—উভয় হাতে ত্রিপতাক করে সম্মুখে ও উভয়পার্শ্বে বেগে মৃগের মত গমন করলে মৃগী গতি হয়।

গজলীলা—উভয়পার্শ্বে দুই হাতের দ্বারা পতাক ধারণ করে বিচরণ করে মন্দগতিতে সমপাদে চললে গজলীলা গতি হয়।

তুরঙ্গিনীগতি—বামহাতে শিখর ধারণ ও ডান হাতে পতাক ধারণ করে দক্ষিণ পদকে উৎক্ষিপ্ত করে বার বার লাফালে তুরঙ্গিনী গতি হয়।

সিংহী গতি—দুইহাতে শিখর ধারণ-পূর্বক দুই পায়ের অগ্রভাগের দ্বারা ভূমিতে অবস্থান করে বেগে সম্মুখদিকে লাফাতে লাফাতে গমন সিংহী-গতি হয়।

ভুজঙ্গীগতি—উভয়পার্শ্বে ত্রিপতাক ধারণ করে পূর্ববৎ যে গমন তাকে ভুজঙ্গী গতি বলা হয়।

মণ্ডুকী গতি—দুই হাতে শিখর ধারণ করে কিঞ্চিৎ সিংহগতির সমান যে গতি তাকে ভরতাগমে মণ্ডুকী গতি বলা হয়েছে।

বীরা গতি—বাম হাতে শিখর ও দক্ষিণে পতাক ধারণপূর্বক দূর থেকে যে আগমন তাকে বীরা গতি বলা হয়।

মানবীগতি—পুনঃ পুনঃ মণ্ডলাকারে ভ্রমণ পূর্বক সমাগত হয়ে বাম হাত কটিতে রেখে দক্ষিণ হাতে কটকামুখ ধারণ করলে মানবী গতি হয়।

নাট্যশাস্ত্রেও বিভিন্ন গতির আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এই সকল গতিভঙ্গির সঙ্গে অভিনয় দর্পণের গতিভঙ্গির বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নেই। নাট্যে বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণকারী পাত্রের জন্যে ভরত মুনি বিভিন্ন রকমের রসানুযায়ী গতির সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই রকম সুবিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভবপর নয় বলে সংক্ষেপে তার উল্লেখ করছি। তিনি উত্তমপাত্রের পক্ষে 'ধীরা', মধ্যমের পক্ষে 'মধ্যা', ও অধমের পক্ষে 'দ্রুতা' গতির নির্দেশ দিয়েছেন। তবে, স্থান, কাল অনুসারে এই নির্দিষ্ট গতির তারতম্য বিধানেরও স্বাধীনতা দিয়েছেন। যেমন যুদ্ধবিগ্রহাদি বিষয়ে উত্তম পাত্রেরও দ্রুতগতি হতে পারে এবং শোকাদি বিষয়ে অধমেরও ধীরা গতি হতে পারে। এই গতি ও তাল-লয় প্রভৃতি পরস্পর পরস্পরকে নিয়ন্ত্রিত করে। আচার্য ভরত যান-বাহনাদিতে আরোহণ ও অবরোহণ করবার এবং জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে গমনা-গমনের গতিভঙ্গীর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বৃক্ষে ও প্রাসাদাদিতে

আরোহণ ও অবরোহণের নানারকম নির্দেশ দিয়েছেন অবস্থাভেদে বৃদ্ধ, কৃশ, ব্যাধিগ্রস্ত, তপঃশ্রান্ত, ক্ষুধিত ও উন্মত্ত প্রভৃতিরও গতিভেদের কথা বলা হয়েছে। ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শবর প্রভৃতি জাতির গতি দেশানুসারে নির্দিষ্ট হয়েছে। ভরত মুনি স্ত্রীলোকদের স্বাভাবিক গতির সম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আবাহন, বিসর্জন, দান, চিন্তা, গোপন প্রভৃতি বিষয়ে স্ত্রীলোকদের গতিতে বিভিন্নরকমের স্থানক ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মন্মথোদ্ভূত ও ঈর্ষোদ্ভূত কোপে, নিষেধে, গর্বে, গাম্ভীর্যে, মৌনাবলম্বনে ও মানে গতিভঙ্গির বিশেষ নির্দেশ আছে। দাসী, বালিকা ও নপুংসকদের গতিভঙ্গিও আলোচিত হয়েছে। পুরুষদের স্ত্রীবেশে ও স্ত্রীদের পুরুষবেশে কি রকম গতি হবে তারও বিবরণ আছে। স্ত্রীলোকদের উদ্ধত চারী ও অঙ্গহার বর্জনীয়।

স্থানক—"সংনিবেশবিশেষোঽঙ্গে নিশ্চলঃ স্থানমুচ্যতে"। অর্থাৎ কোনও বিশেষ ভঙ্গীতে নিশ্চল অবস্থানের নাম স্থানক। নাট্যশাস্ত্রে পুরুষদের ছয়টি স্থানকের উল্লেখ আছে—বৈষ্ণব, সমপাদ, বৈশাখ, মণ্ডল, আলীঢ় ও প্রত্যালীঢ়। অভিনয় দর্পণেও ছয়রকম স্থানের উল্লেখ করা হয়েছে—সমপাদ, একপাদ, ঐন্দ্র, গরুড় ও ব্রাহ্ম।

বৈষ্ণব—দুই পা আড়াই তাল অন্তর স্থাপিত হবে এবং তার ভেতর একটি ত্র্যস্র ও অপরটি স্থিত হবে। জঙ্ঘা কিঞ্চিৎ অঞ্চিত (বক্র) হবে এবং অঙ্গে সৌষ্ঠব থাকবে। একে বৈষ্ণবস্থান বলা হয়। এর অধিদেবতা হচ্ছেন বিষ্ণু। স্বাভাবিক সংলাপে, চক্রের ক্ষেপণে, ধনুর্ধারণে, ধৈর্যে, ক্রোধে ও উদাত্ত অঙ্গ লীলায় ব্যবহৃত হয়।

বৈশাখ—পদদ্বয় সাড়ে তিন তাল অন্তরে থাকবে। উরু নিষণ্ণ থাকবে। পদদ্বয় ত্র্যস্র ও পক্ষস্থিত হবে। একে বৈশাখ বলে। এর অধিদেবতা স্কন্দ। ব্যায়ামে, অশ্বের বাহনে, স্থূলপক্ষী নিরূপণে, ধনু আকর্ষণে, এর প্রয়োগ হয় এবং রেচকে কর্তব্য।

মণ্ডল—চরণদ্বয় চার তাল অন্তরে থাকবে এবং ত্র্যস্র ও পক্ষস্থিত হবে। কটি ও জানু সমভাবে থাকবে। একে ভরতমুনি মণ্ডলস্থান বলেছেন। ধনু, বজ্র প্রহরণ, হস্তীর বাহন, স্থূলপক্ষী নিরূপণে ব্যবহৃত হয়।

আলীঢ়—মণ্ডলস্থানকে দক্ষিণ চরণ পাঁচ তাল প্রসারিত করতে হয়। রুদ্র এর অধিদেবতা। বীর ও রৌদ্ররসে এই স্থানক ব্যবহৃত হয়। রোষে,

অমর্ষে, মল্লদের আস্ফালনে, শত্রু নিরূপণে ও অস্ত্রমোক্ষণে এর প্রয়োগ হয়।

প্রত্যালীঢ়—দক্ষিণ চরণ কুঞ্চিত ও বাম চরণ প্রসারিত করে আলীঢ় স্থানের পরিবর্তন করলে 'প্রত্যালীঢ়' হয়। আলীঢ় স্থানে শস্ত্র আকর্ষণ করে প্রত্যালীঢ়ে মোক্ষণ করতে হয়।

সমপাদ—দুটি চরণই একতাল অন্তরে স্থাপিত হবে ও অঙ্গে স্বাভাবিক সৌষ্ঠব থাকবে। ব্রহ্মা এর অধিদেবতা। দ্বিজের আশীর্বাদে, পক্ষী রূপ ধারণে, বরদানে, কৌতুকে এর প্রয়োগ হয়।

অভিনয় দর্পন অনুসারে স্থানক—

সমপাদ—সমভাবে স্থাপিত দুই পায়ের ওপর স্থিতি সমপাদ নামে খ্যাত। পুষ্পাঞ্জলি দানে ও দেবতার রূপে ব্যবহৃত হয়।

একপাদ—একটি চরণ ভূমিতে, অপর চরণ প্রথম চরণের জানুর ওপর ন্যস্ত। নিশ্চল অবস্থা বা তপস্যা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

নাগবন্ধ—এক চরণের দ্বারা অপর চরণ ও এক হাতের দ্বারা অপর হাত সংবেষ্টন করে অবস্থান করলে নাগবন্ধ হয়। নাগবন্ধ বোঝাতে প্রযুক্ত হয়।

ঐন্দ্র—একটি চরণ সমাকুঞ্চিত করে অপর চরণের উত্তান জানুর ওপর হাত রাখলে ঐন্দ্র স্থানক হয়। ইন্দ্র ও রাজভাব বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

গরুড়—আলীঢ়মণ্ডল করে পরে যদি একটি জানুতল ভূমিতে স্থাপন করে হাতদুটির দ্বারা বিরলমণ্ডল বহন করলে গরুড় স্থানক হয়। গরুড় বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

ব্রাহ্মস্থান—একটি জানুর ওপর চরণ স্থাপন করে অন্য চরণের ওপর অপর জানু স্থাপন করলে ব্রাহ্মস্থান হয়। জপ প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়।
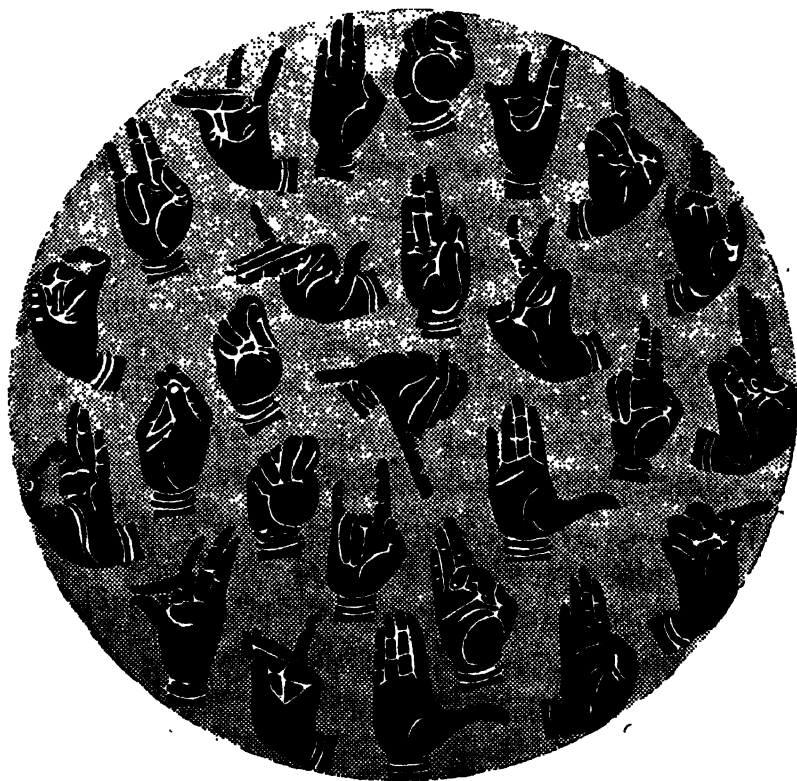
হস্তভেদ

হস্তভেদ

হস্তভেদের অর্থ—

হস্তভেদ বলতে আঙুলগুলির বিশেষ বিশেষ ভঙ্গি ও তাঁদের স্থিতি বোঝায়। নৃত্যের জগতে সাধারণ ভাষায় একে মুদ্রা বলা হয়। মুদ্রার নানারকম অর্থ করা হয়েছে। সঙ্গীত দর্পণে বলা হয়েছে—"সম্প্রদায়ানুসরণং মুদ্রা হৃদয়রঞ্জনী।" মুদ্রা শব্দের অর্থ করা হয়েছে—"মুদম্ আনন্দং রাতি দদাতি—" অর্থাৎ যা আনন্দ দান করে। হস্তভেদ বা মুদ্রা হচ্ছে নৃত্যের ভাষা।

হস্তভেদের সার্থকতা—এই ভাষার সাহায্যে নৃত্যের বক্তব্য ব্যক্ত করা হয়। অনেক সময় একটি মুদ্রার বিভিন্ন রকম প্রয়োগের দ্বারা নানারকম অর্থও ব্যক্ত করা হয়। অর্থাৎ এই আঙুলচালনা বিশেষ বিশেষ রস ও গভীর অর্থের দ্যোতক। নৃত্যের মধ্যে যখন রূপ, রস, ভাব, ব্যঞ্জনা মূর্ত হয়ে ওঠে তখনই আমরা আনন্দ পাই। এই রসগুলিকে মূর্ত হয়ে উঠতে সহায়তা করে অঙ্গহার, তাল, ভাব এবং হস্তভেদ।

নৃত্যে অর্থ প্রকাশের জন্য অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের থেকেও বাহুপ্রকরণের বিশেষ প্রয়োজন, এবং তার সঙ্গে মুখের অভিব্যক্তিও সমান প্রয়োজন। বাহুপ্রকরণের কাজ বলতে সমস্ত বাহুটির কাজ বোঝায়। নাট্যশাস্ত্রকাররা এই বাহুর কাজকে নানা ভাগে বিভক্ত করেছেন; যথা—বাহুপ্রকরণ, করকরণ হস্তভেদ, নৃত্তহস্ত ইত্যাদি। এক একটি নামোল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য শিল্পীরা বুঝতে পারেন বাহুর কোন অংশের এবং কি ধরণের কাজের কথা বলা হচ্ছে। করকরণ বললে মণিবন্ধ পর্যন্ত একটি বিশেষ ভঙ্গীতে হাতকে ঘোরাতে হবে।

বাহুপ্রকরণ—ভরতমুনি দশপ্রকার বাহুপ্রকরণের কথা বলেছেন—তির্যক, ঊর্ধ্বগতি, অধোমুখ, আবিদ্ধ, অঞ্চিত, কুঞ্চিত, অপবিদ্ধ, মণ্ডলগতি, স্বস্তিক, পৃষ্ঠগ। শার্ঙ্গদেব ষোল রকম বাহু প্রকরণের কথা বলেছেন। মুনি ভরতের দশ রকমের সঙ্গে তিনি আরও ছয় রকম বাহুপ্রকরণ যোগ করেছেন। এগুলি হচ্ছে—আবিদ্ধ, কুঞ্চিত, নম্র, সরল, আন্দোলিত ও উৎসারিত। দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত লয় অবলম্বন করে এই ষোল রকম বাহুর সঙ্গে আবেষ্টিতাদি চতুর্বিধ করণের সমস্ত বা ব্যস্তভাবে যোজনের ফলে হাজার হাজার বর্তনার সৃষ্টি হতে পারে। এই বর্তনাগুলি অত্যন্ত শোভা নিষ্পাদক। ভট্টতণ্ডু চব্বিশ

রকম বর্তনার উল্লেখ করেছেন—পতাক, অরাল, শুকতুণ্ড, পল্লব, খটকামুখ, মকর, ঊর্ধ্ব, আবিদ্ধ, রেচিত, নিতম্ব, কেশবন্ধ, কক্ষ, উরোব, খড়্গ, পদ্ম, দণ্ড, পল্লব, অর্ধমণ্ডল, ঘাতব, ললিত, বলিত, গাত্র, প্রতি ও বর্তনা।

মুনি ভরত ও শার্ঙ্গদেব চার রকম করকরণের উল্লেখ করেছেন—আবেষ্টিত, উদ্বেষ্টিত, ব্যাবর্তিত ও পরিবর্তিত।

আবেষ্টিত—তর্জনী থেকে আরম্ভ করে কনিষ্ঠ পর্যন্ত আঙ্গুলগুলি যথাক্রমে করতলের ভেতর সঙ্কুচিত করতে হবে।

উদ্বেষ্টিত—এতে তর্জনী থেকে কনিষ্ঠ পর্যন্ত আঙ্গুলগুলো যথাক্রমে বাইরের দিকে প্রসারিত করতে হবে।

ব্যাবর্তিত- কনিষ্ঠ থেকে আরম্ভ করে তর্জনী পর্যন্ত আঙ্গুলগুলি যথাক্রমে করতলের ভেতরে সঙ্কুচিত করতে হবে।

পরিবর্তিত—কনিষ্ঠা থেকে আরম্ভ করে তর্জনী পর্যন্ত আঙ্গুলগুলি ক্রমশঃ বাইরে দিকে প্রসারিত করতে হবে।

মহামুনি ভরত বলেছেন—

"বিযুতা ঃ সংযুতাশ্চৈব নৃত্যহস্তা ঃ প্রকীর্তিতা"।

তাঁর মতে করণের সঙ্গে নৃত্যহস্তের প্রয়োগ এবং অর্থাভিনয়ে পতাকা প্রভৃতি হস্তের প্রয়োগ হয়। প্রয়োজনানুসারে এদের মিশ্রণও চলতে পারে। অর্থাভিনয় প্রকাশের জন্যে হস্তভেদগুলি সংযুত ও অসংযুতভেদে নানারকম। নাট্যশাস্ত্র ও হস্তলক্ষণ দীপিকায় ২৪ রকম ও অভিনয় দর্পণে ২৮ রকম অসংযুত হস্তের লক্ষণ আছে।

অসংযুত হস্ত—একটি হাতের দ্বারা যখন অর্থ প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে অসংযুত হস্ত বলা হয়। নাট্যশাস্ত্রে ২৪রকম অসংযুত হস্তের নাম আছে—

পতাকস্ত্রিপতাকশ্চ তথা বৈ কতরীমুখ ঃ।
অর্ধচন্দ্রো হ্যরালশ্চ শুকতুণ্ডস্তথৈব চ॥
মুষ্টিশ্চ শিখরাখ্যশ্চ কপিত্থঃ খটকামুখঃ।
সূচ্যাস্যঃ পদ্মকোশঃ সর্পশিরা মৃগশীর্ষকঃ॥
কাঙ্গুলোহলপদ্মশ্চ চতুরো ভ্রমরস্তথাঃ।
হংসাস্যো হংসপক্ষশ্চ সন্দংশো মুকুলস্তথা॥

ঊর্ণনাভস্তাম্রচূড়শ্চতুর্বিংশতিরীরিতাঃ।
অসংযুতা সংযুতাশ্চ গদতো মে নিবোধত ॥"

অভিনয় দর্পণে ২৮ রকম অসংযুত হস্তভেদের উল্লেখ আছে—

পতাকস্ত্রিপতাকোঽর্ধপতাকঃ কর্তরীমুখঃ।
ময়ূরাখ্যোঽর্ধচন্দ্রশ্চ অরালঃ শুকতুণ্ডকঃ ॥
মুষ্টিশ্চ শিখরাখ্যশ্চ কপিত্থঃ কটকামুখঃ
সূচী চন্দ্রকলা পদ্মকোশঃ সর্পশিরস্তথা ॥
মৃগশীর্ষঃ সিংহমুখঃ কাঙ্গুলশ্চালপদ্মকঃ
চতুরো ভ্রমরশ্চৈব হংসাস্যো হংসপক্ষকঃ ॥
সন্দংশো মুকুলশ্চৈব তাম্রচূড়স্ত্রিশূলকঃ।
ইত্যসংযুতঃ হস্তানামষ্টাবিংশতিরীরিতা ॥"

হস্তলক্ষণদীপিকায় মূল ২৪টি হস্তভেদের লক্ষণ আছে। সেগুলি হচ্ছে—পতাক, ত্রিপতাক, মুদ্রাক্ষ, কর্তরীমুখ, অর্ধচন্দ্র, অরাল, শুকতুণ্ড, মুষ্টি, শিখর, কপিত্থ, কটকামুখ, সূচী, কটকা, সর্পশীর্ষ, মৃগশীর্ষ, হংসপক্ষ, মুকুর, ভ্রমর, হংসাস্য, অঞ্জলী, মুকুল, ঊর্ণনাভ, পল্লব, বর্ধমানক।

পতাক—(নাট্যশাস্ত্র) সকল আঙ্গুলগুলো সমানভাবে প্রসারিত করলে এবং কেবলমাত্র অঙ্গুষ্ঠটি কুঞ্চিত রাখলে পতাক হস্ত হয়। প্রতাপে, প্রেরণে হর্ষে, গর্বে, আমি, আমার প্রভৃতি গর্ব প্রকাশে হাত দুটি পার্শ্বান্তর থেকে নিজের পাশে আগমনকালে ললাট অভিমুখে উর্ধ্বে তুলতে হয়। হাত দুটি উর্ধ্বে উত্থিত করে অগ্নিধারা নিরূপণ করতে এবং আঙ্গুলগুলি উর্ধ্বমুখী করে মাথার ওপর রেখে পুনরায় অধোমুখী করে পুষ্পবৃষ্টি বোঝান হয়। পতাক হাত দুটিকে যুক্ত করে স্বস্তিক এবং স্বস্তিককে বিচ্যুত করে পতাক হাত দুটিকে মণি-বন্ধের সঙ্গে যুক্ত করে বাহুর পরিভ্রমণের দ্বারা পল্বল (ক্ষুদ্র জলাশয়), পুষ্পোপহার, শষ্প (নবতৃণ) প্রভৃতি পৃথিবীতে অবস্থিত বস্তুকে নির্দেশ করা হয়। স্বস্তিককে বিচ্যুত করে আবার বিচ্যুত হাত দুটিকে স্বস্তিক করে, এই ক্রমে সংবৃত, বিবৃত অর্ধসংবৃত ও অর্ধবিবৃত ইত্যাদি নানাভাবে হাত দুটিকে রেখে পতনোন্মুখকে রক্ষা করা, অপরের দৃষ্টি থেকে গোপন করা প্রভৃতি ব্যক্ত করা হয় এবং হাত-দুটিকে অধোমুখে ও উর্ধ্বাভিমুখে চালনা করে বায়ুচালিত ঊর্মির দ্বারা বেলাভূমির বিক্ষোভ ও বেগ দেখানো হয়। রেচকের সাহায্যে হাতদুটির চালনার দ্বারা

পাখীদের পাখা উৎক্ষেপের অভিনয় করতেও এই হস্তভেদ প্রযোজ্য হয়। পতাক হাত দুটির তলদেশ ঘর্ষণের দ্বারা কোন দ্রব্য ধোয়া, মাজা ও পেষণ করা প্রভৃতি বোঝায়। এ ছাড়া শৈলধারণ, ও উদ্ঘাটনে ব্যবহৃত হয়। দশক শতক, সহস্র সংখ্যা বোঝাতেও 'পতাক' ব্যবহার করা হয়।

অভিনয় দর্পণে সংজ্ঞা একই রকম। তবে প্রয়োগের অর্থের পার্থক্য আছে।

অভিনয় দর্পণ অনুসারে:—নাট্যারম্ভ, মেঘ, বন, বস্তুনিষেধে, কুচস্থল, নিশা, নদী, খণ্ডন, বায়ু, প্রতাপ, প্রাসাদ, জ্যোৎস্না, সূর্যকিরণ, কবাটভঙ্গ, আশীর্বাদ, নৃপশ্রেষ্ঠ, মাস, বৎসর ইত্যাদি বোঝায়।

ত্রিপতাক—(নাট্যশাস্ত্র) পতাকহস্তে অনামিকা বক্র হলে ত্রিপতাক হয়।

প্রয়োগ—আবাহন, অবতরণ, বিসর্জন, বারণ, প্রবেশ, চিবুকাদি স্পর্শ, প্রণাম, উপমান উপমেয় ভাব বিচার, বিবিধ বচন, মঙ্গলদ্রব্য (পূর্ণ কুম্ভ ইত্যাদি) স্পর্শ, মস্তক স্পর্শ, উষ্ণীষ ধারণ, মুকুট ধারণ, অনিষ্ট গন্ধে বা শব্দে নাক, মুখ, কান আচ্ছাদন, অঙ্গুলিদ্বয়ের তরঙ্গায়িতভাবে চালনার দ্বারা তীব্রবেগে বিহগ পতন, জলস্রোত, ভুজগ ও ভ্রমরাদির পতন, অশ্রুমার্জন, তিলক বিরচন, রোচনার দ্বারা শরীর লেপন,. ত্রিপ্রতাককে স্বস্তিক করে গুরুজনের পাদ বন্দন এবং ত্রিপতাক হাত দুটির অগ্রভাগ পরস্পর সংশ্লিষ্ট করে বিবাহ দর্শন, বিচ্যুত করে নৃপদর্শন, তির্যগভাবে স্বস্তিক করে গ্রহদর্শন, ঊর্ধ্ব ও নিম্নাভিমুখে তপস্বী দর্শন, পরম্পরাভিমুখে দ্বারদর্শন, উত্তান অবস্থায় চিবুকের কাছে অবস্থান করলে বাড়বানল ও মকর দর্শন, বানরদের উল্লম্ফন, সম্মুখ দিকে অঙ্গুষ্ঠ প্রসারিত করে বালেন্দু দর্শন, ত্রিপতাক হাত পেছনে ফিরিয়ে মানুষের গমন বোঝায়।

অভিনয় দর্পণানুসারে:—মুকুট, বৃক্ষ, বজ্রধর, বাসব, কেতকীপুষ্প, দীপ, বহ্নিশিখাপ্রকাশ, পারাবত, পত্রলেখা, বাণ ও পরিবর্তন বোঝায় ত্রিপতাকার দ্বারা।

অর্ধপতাক (অভিনয় দর্পণ)—ত্রিপতাকহস্তে কনিষ্ঠাকে বক্র করলে অর্ধপতাক হয়। পত্র, ফলক, তীর, উভয়ের, এইরূপ উক্তিতে, করাত, ছুরিকা, ধ্বজ, গোপুর, শৃঙ্গ প্রভৃতি কর্মপ্রয়োগে অর্ধপতাক ব্যবহৃত হয়।

কর্তরীমুখ (নাট্যশাস্ত্র)—ত্রিপতাকহস্তে মধ্যমা থেকে তর্জনীবিশ্লিষ্ট অবস্থায় যদি থাকে এবং হাতের পেছনদিক দৃষ্ট হয় তবে কর্তরীমুখ হয়।

রচনাতে (উক্তিরচনায়), চরণ রঞ্জনে (অলক্তক-রঞ্জনে), কুম্‌কুম্‌ প্রভৃতির দ্বারা তিলক রচনে কর্তরী অধোমুখী হবে। দংশনে, কর্তনে, শৃঙ্গে, লেখনে হাত ঊর্ধ্বমুখী হবে। পতনে, মরণে, অপরাধে, পশ্চাদবলোকনে, বিতর্কে (অনুমান, সন্দেহ, কল্পনা প্রভৃতিতে), নিক্ষেপে, কর্তরীমুখের আঙুলদুটি (মধ্যমা ও তর্জনী) পৃষ্ঠগত হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হবে এবং পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হবে। যাঁরা অভিজ্ঞ, তাঁরা রুরু (একরকম মৃগ), চমর, মোষ, সুরগজ (ঐরাবত), বৃষ, গোপুর (তোরণদ্বার), শৈলশিখর নির্দেশ করতে সংযুত বা অসংযুত হস্তের ব্যবহার করেন।

কর্তরীমুখ (অভিনয় দর্পন)—অর্ধপতাক হস্তের তর্জনী ও কনিষ্ঠা এই দুটি বাইরের দিকে প্রসারিত হলে **কর্তরীমুখ** হয়। স্ত্রীপুরুষের বিচ্ছেদ, বিপর্যস্ত অবস্থা, লুণ্ঠন, নয়নপ্রান্ত, মৃত্যু, ভেদ-ভাবনা, বিদ্যুৎ, বিরহাবস্থায় শয্যায় একাকী শয়ন, পতন ও লতা প্রভৃতি বোঝাতে এই হস্তের প্রয়োগ হয়।

ময়ূর—(অভিনয় দর্পণ) কর্তরীমুখে অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ পরস্পর সংযুক্ত ও আঙুলগুলো প্রসারিত হলে ময়ূর হস্ত হয়। ময়ূরের মুখ, লতা, পক্ষী, বমন, অলকগুচ্ছের অপসারণ, ললাটের তিলক, নদীজল, নিক্ষেপ, শাস্ত্রার্থ বিচার, প্রসিদ্ধ বস্তু বোঝাতে এই হাত ব্যবহৃত হয়।

অর্ধচন্দ্র (নাট্যশাস্ত্র)—অঙ্গুষ্ঠের সঙ্গে আঙুলগুলি ধনুকের মত বক্রাবস্থায় নত হলে অর্ধচন্দ্র হয়। বালতরু, চন্দ্রকলা, শঙ্খ, কলসী, বলয়, বলপ্রয়োগে, উন্মোচন, গণ্ড, ও ভ্রূবিভ্রমের দ্বারা খেদ, ক্রোধ প্রভৃতির প্রকাশে, কৃশ ও স্থূল বস্তুর নির্দেশে ব্যবহৃত হয়। নারীদের রশনা (নিতম্ব), জঘন, কটি, মুখে উক্তি প্রভৃতি রচনা, কুণ্ডল প্রভৃতির অভিনয়ে এই হস্ত ব্যবহৃত হয়।

অর্ধচন্দ্র (অভিনয় দর্পণ)—পতাকের অঙ্গুষ্ঠটি অপসারিত বা বিশ্লিষ্ট হলে অর্ধচন্দ্র হয়। কৃষ্ণাষ্টমীর চাঁদ, ছোট গাছ, শঙ্খ, কলস, বালা, উদ্ঘাটন, আহত অবস্থা, তালপত্র (কর্ণভূষণ), কুণ্ডল, কটিদেশ প্রভৃতিতে এই হস্ত ব্যবহৃত হয়।

অরাল—(নাট্যশাস্ত্র)—তর্জনী ধনুকের মত নত, অঙ্গুষ্ঠ অল্প কুঞ্চিত এবং অবশিষ্ট আঙুলগুলি উন্নত ও পরস্পর বিশ্লিষ্ট ও অল্পবক্র হলে অরাল হস্ত হয়। এর দ্বারা বল, উদ্ধত, বীর্য, কান্তি, দিব্যবস্তু নির্দেশ, গাম্ভীর্য প্রকাশ, আশীর্বাদ ও অন্যান্য শুভকাজের অভিনয় করা হয়। এ ছাড়া স্ত্রীলোকের কেশসংগ্রহ, কেশ-

বিকিরণ, নিজের অঙ্গ উত্তমরূপে দর্শন ইত্যাদি অভিনীত হয়। কৌতুক, বিবাহ, প্রদক্ষিণ প্রভৃতিতে অরালহস্তের আঙুলের অগ্রভাগ স্বস্তিক হয়ে মণ্ডলাকারে ঘুরবে। প্রদক্ষিণ, পরিমণ্ডল, মহাজন ও ভূমিতে রচিত দ্রব্যের অভিনয় করা হয়।

অরাল (অভিনয় দর্পণ)—বিষ, অমৃত পান, প্রচণ্ড ঝড় প্রভৃতিতে এর প্রয়োগ হয়।

পতাকে তর্জনী বক্র হলে অরাল হস্ত হয়।

শুকতুণ্ড (নাট্যশাস্ত্র)—অরাল হস্তের অনামিকা বক্র হলে শুকতুণ্ড হয়। এর প্রয়োগের দ্বারা 'আমি নই,' 'তুমি নও,' 'করো না' ইত্যাদির অভিনয়, আবাহন, বিদায়, অবজ্ঞার সঙ্গে ধিক্কার প্রকাশ পায়।

শুকতুণ্ড (অভিনয় দর্পণ)—নাট্যশাস্ত্রের অনুরূপ।

বাণ প্রয়োগে, বর্ষা ছোঁড়ায়, নিমিত্তে, নিজের গৃহের স্মরণে, মর্মোক্তিতে ও উগ্রভাবে শুকতুণ্ড প্রযুক্ত হয়।

মুষ্ঠি (নাট্যশাস্ত্র)—হাতের তালুর মধ্যে আঙুলগুলির অগ্রভাগ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চেপে ধরলে মুষ্ঠি হয়। প্রহারে, ব্যায়ামে, যুদ্ধে, (প্রতিপক্ষের হস্তধারণে, খণ্ড যুদ্ধে), নির্গমে (আদা প্রভৃতি নিঙড়ানে), পীড়নে (মহিষাদির দোহন ইত্যাদিতে), সংবাহন (মাটি চটকান,), অসি ও যষ্ঠিধারণে, কেশ ও দণ্ডের ধারণে ও মার্জনে এই হস্তের ব্যবহার হয়।

মুষ্ঠি (অভিনয় দর্পণ)—প্রয়োগ নাট্যশাস্ত্রের মত।

স্থিরভাব, কেশগ্রহণ, দৃঢ়তা, বস্তু প্রভৃতির ধারণ ও মল্লদের যুদ্ধ ভাব বোঝাতে মুষ্ঠিহস্তের প্রয়োজন।

শিখর (নাট্যশাস্ত্র)—মুষ্ঠি হস্তের অঙ্গুষ্ঠটি যদি উর্ধ্বে উত্থিত থাকে, তাহলে 'শিখর' হস্ত হয়। রশ্মি (অশ্ব রজ্জু), কুশ, অঙ্কুশ, ধনুক ধারণে এবং তোমর (একরকম অস্ত্র), শক্তি প্রভৃতি অস্ত্রের নিক্ষেপে, অধর, ওষ্ঠ ও পদরঞ্জনে এবং কেশের উর্ধ্বদিকে বিকিরণ প্রভৃতিতে শিখরহস্ত অভিনীত হয়ে থাকে।

শিখর (অভিনয় দর্পণ)—নাট্যশাস্ত্রের মত।

মদনদেব, ধনু, স্তম্ভ, নিশ্চয়, পিতৃতর্পণ, ওষ্ঠ রঞ্জন, প্রবিষ্ট (বস্তুর) রূপ, আলিঙ্গনবিধি, ঘণ্টানিনাদে ও শিবলিঙ্গ ইত্যাদিতে শিখর হস্তের প্রয়োগ হয়।

কপিথ (নাট্যশাস্ত্র)—'শিখর' হাতের তর্জনী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পীড়িত হয়ে বক্র হলে 'কপিত্থ' হস্ত হয়। অসি, ধনুক, চক্র, তোমর, বর্শা, গদা, শক্তি ও বজ্র এবং বাণ এই অস্ত্রগুলি, সত্য ও হিতকর কর্ম এই কপিথের দ্বারা অভিনের।

কপিথ (অভিনয় দর্পণ)—যদি শিখরে অঙ্গুষ্ঠের মস্তকে তর্জনী বক্রভাবে স্থাপন করা যায়, তা হলে 'কপিত্থ' হয়।

লক্ষ্মী, সরস্বতী, নটদের তালধারণ, গোদোহণ, অঞ্জন, লীলাকুসুমধারণ, বস্ত্রাঞ্চলধারণ, বস্ত্রদ্বারা অবগুণ্ঠন ও ধূপ দীপ দ্বারা অর্চন প্রভৃতি বোঝাতে কপিত্থ হস্ত ব্যবহার করা হয়।

কটকামুখ (নাট্যশাস্ত্র)—কপিথ হস্তে কনিষ্ঠার সঙ্গে অনামিকা উৎক্ষিপ্ত ও বক্র হলে কটকামুখ হয়। হোত্রে, হোব্যে, ছত্র ও রজ্জুর গ্রহণ ও ধারণে, ব্যঞ্জন ও দর্পণ ধারণ, খণ্ডনে, পেষণে, বৃহৎ দণ্ডগ্রহণে, মুক্তাহার সংগ্রহ, মাল্য সূত্রধারণে, বস্ত্রপ্রান্তধারণে, মন্থনে, বাণাকর্ষণে, পুষ্পচয়নে, অঙ্কুশধারণে, রজ্জু আকর্ষণে ও স্ত্রী দর্শনে এর ব্যবহার হয়।

কটকামুখ (অভিনয় দর্পণ)—কপিথে তর্জনীর সঙ্গে উর্ধ্বে উত্থিত অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা মিলিত হলে কটকামুখ হয়।

কুসুমচয়ন, মুক্তাহার বা পুষ্পমালাধারণ, শরের মধ্যদেশ আকর্ষণ, নাগবল্লী প্রদান (তাম্বুল), কস্তুরি প্রভৃতির পেষণ, সুগন্ধীকরণ, বচন ও দৃষ্টিপাত প্রভৃতি কাজে কটকামুখের প্রয়োগ হয়।

সূচীমুখ-(নাটশাস্ত্র)—কটকার তর্জনী সম্প্রসারিত হলে সূচীমুখ হয়। তর্জনী পার্শ্বান্তরে কম্পিত, কুঞ্চিত, প্রসারিত ও উর্ধ্বমুখী প্রভৃতি বিভিন্ন গতিতে সঞ্চালিত হয়ে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। বিদ্যুৎ, চক্র, লতা, কর্ণফুল, পতাকা, কুটিল গতি (মীনাদির গতি), সাপ, ধূপ, দীপ, লতা, [১]শিখণ্ড, পতন, বক্রতা ও মণ্ডল অভিনয়ে এই হস্ত ব্যবহৃত হয়। এই হস্ত উন্নত করে তারা, নাসিকা, দণ্ড, যষ্টির অভিনয় করা হয়। ভ্রংষ্ট্রযুক্ত জন্তু বোঝাতে তর্জনী মুখসংলগ্ন হবে। মণ্ডলাকারে তর্জনী ঘোরালে লোকের সর্বস্ব গ্রহণ, সূচীহস্ত অবনত হলে দীর্ঘ অধ্যায় ও দীর্ঘ দিন বোঝায়। হাই তোলা ও বাক্যের অভিনয়ে তর্জনী মুখপ্রান্তে স্থাপন করতে হবে। কোরো না, বলো ইত্যাদির অভিনয়ে তর্জনী প্রসারিত, কম্পিত ও উত্তান হবে। রোষ, স্বেদ, কুন্তল, কুণ্ডল, [২]অঙ্গদ, গণ্ড সজ্জিত

১) কেশগুচ্ছ, ২) হাতে পরা তাগা।

প্রভৃতিতে এই হস্ত ব্যবহৃত হয়। গর্ব, আমি, শত্রুনির্দেশ, ক্রোধ, কর্ণ কণ্ডুয়নে এই হাত কপালে স্থাপিত হবে। মিলনে সংযুক্ত, বিয়োগে বিশ্লেষিত, কলহে স্বস্তিক, বন্ধনে পরস্পর [৩]উৎপীড়িত হবে।

দুটি সূচীহস্ত বাম পাশ থেকে (অভিমুখ) দক্ষিণ পাশে (পরাঙ্মুখ) স্থাপিত হলে দিন ও রাত্রির শেষ বোঝাবে। অগ্রভাগ চালিত হলে রূপ, শীল, আবর্ত, যন্ত্র, শৈল (পর্বত) সূচিত করে। পরিবেষণে সর্বদা অধোমুখী হবে। শিবের অভিনয়ে ঐ হস্ত অধোমুখে ললাটে স্থাপন করতে হবে। হস্ত দ্বয়ের দ্বারা পূর্ণচন্দ্র প্রদর্শন করা হয়।

সূচীহস্ত (অভিনয় দর্পণ)—কটকামুখের তর্জনী ঊর্ধ্বে প্রসারিত হলে সূচীহস্ত হয়।

একার্থে, পরব্রহ্ম ভাবনায়, শত, রবি, নগর, তথা, লোক, [৪]যচ্ছব্দ, [৫]তচ্ছব্দ, বিজন, তর্জন, কৃশতা, শলাকা, দেহ, আশ্চর্য, বেনী, ভাবনা, ছত্র, সামর্থ, পাণি রোমাবলী, ভেরীবাদন, কুম্ভকারের চক্রভ্রমণ, রথচক্রের মণ্ডল, বিবেচনা, দিনান্ত বোঝাতে সূচীহস্ত ব্যবহৃত হয়।

চন্দ্রকলা (অভিনয় দর্পণ)—সূচীহস্তে অঙ্গুষ্ঠটি মুক্ত হলে চন্দ্রকলা হস্ত হয়।

চন্দ্র, মুখ, [৬]প্রাদেশ, [৭]তন্মাত্রাকার বস্তু, শিবের মুকুট, গঙ্গানদী, লগুড় প্রভৃতি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

পদ্মকোশ (নাট্যশাস্ত্র)—বৃদ্ধাঙ্গুলিসহ আঙুলগুলিবিশ্লিষ্ট, কুঞ্চিত, ঊর্ধ্বমুখী ও আঙুলগুলির অগ্রভাগ অসংহত হয়, তবে সেই হাত পদ্মকোশ হাত হয়। বিল্ব, কপিত্থ প্রভৃতি ফল গ্রহণে, কুচ প্রদর্শনে, গ্রহণে, নানা জাতীয় ডালিম প্রদর্শনে, আমিষখণ্ডে, দেবার্চনায়, অগ্রপিণ্ডদানে ও পুষ্পসমূহের প্রদর্শনে পদ্মকোশ হস্ত হয়। মণিবন্ধ দুটি বিশ্লিষ্ট হলে ও আঙুলগুলি কম্পিত ও বিবর্তিত হলে বিকশিত কমলের অভিনয় হয়।

পদ্মকোশ (অভিনয় দর্পণ)—যদি আঙুলগুলি [৮]বিরল, কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত ও তলনিম্নগামী হয়, তাহলে পদ্মকোশ হস্ত হয়। বিল্ব, কপিত্থ, স্ত্রীলোকদের কুচযুগল, আবর্ত, খেলার গোলক, রন্ধনপাত্র, ভোজন, পুষ্পকোরক, আমফল,

৩) মর্দিত, ৪) যে, যাতে, যেরূপে ৫) সে, তা, তাতে. ৬) অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী নিয়ে যে বিঘৎ হয় তার নাম, ৭) প্রাদেশ প্রমাণ ৮) বিশ্লিষ্ট।

পুষ্পবর্ষণ, পুষ্পমঞ্জরী, জবাকুসুম ও ঘণ্টার আকার, বল্মীক, পদ্ম, অণ্ড বোঝাতে পদ্মকোশ হস্ত হয়।

সর্পশির (নাট্যশাস্ত্র)—যার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠসহ আঙুলগুলি সংহত এবং করতলাভিমুখী হয়, সেই হস্ত সর্পশির হয়। জলদানে, সর্পগতিতে, তোয় (জল, কুমকুম, চন্দনাদি) সেচনে, মল্লযুদ্ধের সময় উরুস্ফোটনে, করিকুম্ভ (হস্তিমস্তক) আস্ফালনে আঙুলগুলি অধোমুখী হয়ে ব্যবহৃত হয়।

সর্পশীর্ষ হস্ত—(অভিনয় দর্পণ)—পতাক হস্তের অগ্রভাগ নামিত হলে সর্পশীর্ষ হস্ত হয়। চন্দন, ভুজগ (সাপ), মন্ত্র (ধ্বনি), প্রোক্ষণ (ছিটে দেওয়া), পোষণ, দেবতাদের জলাঞ্জলি দান, হস্তীর কুম্ভদ্বয়ের আস্ফালন ও মল্লদের বাহু স্থান বোঝাতে সর্পশীর্ষ প্রযুক্ত হয়।

মৃগশীর্ষ—(নাট্যশাস্ত্র)—মৃগশীর্ষ হস্তে অধোমুখী আঙুলগুলি একত্রিত হয় এবং কনিষ্ঠা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উর্ধ্বমুখী হয়। এইস্থানে, আছে, অন্য, বোঝাতে মৃগশীর্ষ অধোমুখীভাবে ব্যবহৃত হবে, শক্তির উল্লাসে ও অক্ষপাতে (পাশা খেলায়) উর্ধ্বমুখী হবে এবং গণ্ডাদির স্বেদমার্জনে করতল গণ্ডাভিমুখী হবে এবং আঙুলগুলি উর্ধ্বমুখী হবে। স্ত্রীলোকদের কুট্টমিত ভাব প্রদর্শনেও এই হস্ত ব্যবহৃত হয়।

মৃগশীর্ষ—(অভিনয় দর্পণ)—সর্পশীর্ষ হস্তে কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ প্রসারিত হলে মৃগশীর্ষ হয়। স্ত্রীলোক, কপোল, চক্র, মর্যাদা, ভীতি, বিবাদ, নেপথ্য, আহবান, ত্রিপুণ্ড্রক, মৃগমুখ, [১]রঙ্গবল্লী, [২]পাদসংবাহন, সর্বস্ব, মিলন, ছত্রধারণ, সঞ্চার, প্রিয়াআহবানে এই হস্ত প্রযুক্ত হয়।

সিংহমুখ (অভিনয় দর্পণ)—মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগের সঙ্গে অঙ্গুষ্ঠ মিলিত হলে এবং তর্জনী ও কনিষ্ঠা যদি প্রসারিত হয়, তাহলে সিংহমুখ হয়।

হোম, খরগোশ, গজ (হস্তী), কুশচালনা, পদ্মমালা, সিংহমুখ, বৈদ্য কর্তৃক পাক ও শোধন বোঝাতে এই হাতের ব্যবহার হয়।

কাঙুল—(নাট্যশাস্ত্র)—মধ্যমা, তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ ত্রেতাগ্নির মত স্থাপিত হলে এবং অনামিকা বক্র এবং কনিষ্ঠ উর্ধ্বে উত্থিত থাকলে কাঙুল হস্ত হয়।

এর দ্বারা নানারকম কাঁচা ফল, লঘু কর্ম, ক্রোধজ কাজ এবং আঙুল সঞ্চালনের দ্বারা মরকত, বৈদূর্যমণি বোঝায়।

---

(১) বীণা। (২) পা টেপা।

কাঙ্গুল—(অভিনয় দর্পণ)—পদ্মকোশে যদি অনামিকা নম্র হয় তাহলে কাঙ্গুল হস্ত হয়। সুপুরি বৃক্ষ, স্ত্রীর কুচমণ্ডল, কহ্লার, চাতক ও নারকেল বোঝাতে এই হস্তের প্রয়োগ হয়।

অলপদ্ম—(নাট্যশাস্ত্র)—করতলে আঙ্গুলগুলো আবর্তিত অবস্থায় থেকে পার্শ্বগত ও বিকীর্ণ হলে অলপদ্ম হয়। নিষেধ, তুমি কার, নাই, মিথ্যা বলতে অথবা মূল্যহীন বচন, স্ত্রীলোকদের নিজের সম্বন্ধে উল্লেখ এর দ্বারা করনীয়।

অলপদ্ম—(অভিনয় দর্পণ)—কনিষ্ঠা প্রভৃতি আঙ্গুলগুলি পরস্পর বিরল ও বক্র হলে অলপদ্ম হয়। পূর্ণ বিকশিত পদ্ম, কপিথাদি ফল, আবর্ত, কুচ মণ্ডল, বিরহ, মুকুর, পূর্ণচন্দ্র, সৌন্দর্য ভাবনা [১]ধম্মিল, [২]চন্দ্র শালা, গ্রাম, [৩]উদ্ধৃত, কোপ, তড়াগ, শকট, চক্রবাক, কলকলধ্বনি, শ্লাঘা প্রভৃতি বোঝাতে অলপদ্ম ব্যবহৃত হয়।

চতুর (নাট্যশাস্ত্র)—কনিষ্ঠ উর্ধ্ব ও অবশিষ্ট তিনটি প্রসারিত এবং প্রসারিত তিনটির মধ্যদেশে অঙ্গুষ্ঠটি স্পর্শ করে থাকলে 'চতুর' হয়। গ্রহণ, বিনয় প্রকাশ. নিয়ম, সুনিপুণ, বালিকা, পীড়িত, [৪]কৈতব, প্রতারণা, মিথ্যাচারী, বাক্য, সত্য ও প্রশান্তি প্রভৃতি অর্থ বোঝাতে এই হস্তের ব্যবহার হয়। উপযুক্ত, হিতকর, সত্যবাক্য ও প্রশমে এর ব্যবহার হয়। প্রয়োজনমত এক বা দুই হাত মণ্ডলাকারে ঘোরালে বিবৃত (অনাবৃত), বিচার, আচরণ, বিতর্কিতভাব ও লজ্জিত ভাব প্রকাশিত হয়। উপমান উপমেয় ভাবে পদ্মদলের সঙ্গে নয়নের তুলনা করতে, হরিণের কর্ণ নির্দেশে, দুই হাতের দ্বারা চতুর করতে হবে। লীলা, রতি, রুচি, স্মৃতি, বুদ্ধি, [৫]বিভাবনা, ক্ষমা, পুষ্টি, সংজ্ঞা, আশা, মিলন, শুচিতা, প্রণয়, চাতুর্য, দাক্ষিণ্য, কোমলতা, সুখ, শীল, প্রশ্ন, বার্তা, যুক্তি, বেষ, কোমলতৃণ, সুরত, সম্পদ, দারিদ্র, যৌবন, গৃহ, ভার্য্যা, ইত্যাদি 'চতুর' হস্তের দ্বারা প্রদর্শিত হয়। হাত মণ্ডলাকারে ঘুরিয়ে শুভ্র, রক্ত ও পীতবর্ণ এবং দুটি হাতকে মুদিত করে নীলবর্ণ অভিনয় করতে হবে।

চতুর (অভিনয় দর্পণ)—তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা যদি সংশ্লিষ্ট থাকে এবং কনিষ্ঠা প্রসারিত হয় ও অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা মূলে তির্যগভাবে স্থাপিত হয় তা হলে 'চতুর' কর হয়। কস্তুরী, কিঞ্চিৎ, স্বর্ণ, তামা, লোহা, আর্দ্র, খেদ, রসাস্বাদ

---

(১) উঁচু করে কবরী বাঁধা (২) চিলেকোঠা (৩) পদার্থ, (৪) জুয়াখেলা (৫) বিচার নির্ণয়ে

নয়ন, বর্ণ ভেদ, প্রমাণ, সরস বস্তু, মন্দগতি, খণ্ড খণ্ড করা, আনন, ঘৃত, তেল প্রভৃতি বোঝাতে এই হাতের প্রয়োগ হয়।

ভ্রমর—(নাট্যশাস্ত্র) মধ্যম ও অঙ্গুষ্ঠ যদি সাঁড়াশীর আকারে যুক্ত হয় এবং প্রদেশিনী বক্র হয় এবং অপর আঙুলগুলিও ঊর্ধ্বদিকে উত্থিত হয়, তাহলে 'ভ্রমর' হস্ত হয়। এর দ্বারা স্থলপদ্ম, কুমুদ, দীর্ঘ বৃন্ত, পুষ্পের গ্রহণ, এবং কর্ণভূষণ প্রদর্শিত হয়। ভর্ৎসনাতে, বলবিষয়ে, গর্বপ্রকাশে, শীঘ্রতায়, তাল দিতে, বিশ্বাস উৎপাদনে, সশব্দে মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা তুড়ি দিতে এই হস্ত ব্যবহৃত হয়।

ভ্রমর—(অভিনয় দর্পণ) নাট্যশাস্ত্রের সংজ্ঞার মত। ভ্রমর, শুক, পক্ষ সারস, কোকিল প্রভৃতি বোঝাতে ভ্রমর হস্ত হয়।

হংসমুখ (নাট্যশাস্ত্র)—তর্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ ত্রেতাগ্নির মত সংযুক্ত হলে এবং অবশিষ্ট আঙুল দুটি প্রসারিত হলে হংসমুখ হয়। কোমল, অল্প-শিথিল, লঘুতা, অসারতা ও মৃদুত্বের অভিনয়ে এর অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ স্পন্দিত হয়।

হংসাস্য (অভিনয় দর্পণ)—তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের সংশ্লেষ হেতু মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা যদি বিরলভাবে প্রসারিত হয় তবে হংসাস্য হস্ত হয়। মাঙ্গল্য, সূত্র বন্ধন, উপদেশ নিশ্চয়ে, রোমাঞ্চে, মুক্তা প্রভৃতি, প্রদীপের পলিতা প্রসারিত করা, [১]নিকষ, মল্লিকা, চিত্র ও তার লেখনে, [২]দংশ, [৩]জলবন্ধ প্রভৃতিতে এই হস্ত ব্যবহার করা হয়।

হংসপক্ষ (নাট্যশাস্ত্র) তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা, এই আঙুল তিনটি সমান ভাবে প্রসারিত হ'লে, কনিষ্ঠা উত্থিত হ'লে এবং অঙ্গুষ্ঠ কুঞ্চিত থাকলে হংসপক্ষ হয়। পিতৃতর্পণে, সুগন্ধী দ্রব্যে, ব্রাহ্মণদের প্রতিগ্রহে, আচমনে, ভোজনে, আলিঙ্গনে, রোমাঞ্চে, স্পর্শে, অনুলেপনে, গাত্র সংবাহনে, সুখে, দুঃখে এবং হনু ধারণে, এই হস্তের প্রয়োগ হয়।

হংসপক্ষ (অভিনয় দর্পণ)—সপ শীর্ষহস্তে কনিষ্ঠা যদি সম্যগভাবে প্রসারিত হয়, তবে তা হংসপক্ষ নামে খ্যাত। ষট্‌সংখ্যা, সেতুবন্ধন, নখের দ্বারা রেখাঙ্কন ও আবরণ বোঝাতে এই হস্তের প্রয়োগ হয়।

সন্দংশ (নাট্যশাস্ত্র)—অরাল হস্তের তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সন্দংশের মত হলে এবং করতলের মধ্যভাগ একটু নত হলে সন্দংশ হয়। সন্দংশ তিন রকম—অগ্র,

---

(১) কষ্টি পাথর (২) ডাশ মাছি (৩) জলের বাঁধ

মুখজ ও পার্শ্বগত। সূত্র ও সূক্ষ্মপুষ্পের চয়নে ও গ্রহণে, তৃণ, পর্ণ ও কেশ গ্রহণে, কণ্টক প্রভৃতি গ্রহণে ও আকর্ষণে অগ্রজ ব্যবহৃত হয়। বৃন্ত থেকে পুষ্পচয়ন, শলাকার দ্বারা নয়নে অঞ্জন লেপন, ক্রোধভরে ধিক্কারবচন প্রভৃতিতে মুখজ ব্যবহৃত হয়। যজ্ঞোপবীত ধারণে, লক্ষ্যস্থল ভেদের জন্য ধনুকের গুণ আকর্ষণে, দুই হাতের প্রয়োগ হয়। এ ছাড়া কোমল বচন, ও নিন্দা বচনে, আলেখ্য, নেত্ররঞ্জন, বিতর্ক, বৃন্ত, স্ত্রীলোকের আলতা নিঙ্‌ড়ানোতে এই হাত ব্যবহৃত হয়।

সন্দংশ (অভিনয় দর্পণ)—পদ্মকোশ হাতের আঙুলগুলো যদি ক্রমান্বয়ে বারবার সংশ্লিষ্ট ও বিরল করা যায়, তবে নৃত্যবিদরা তাকে সন্দংশ হস্ত বলেন। উদর, দেবতাকে বলি প্রদানে, ব্রণ, কীট, মহাভয়, পূজা ও পঞ্চসংখ্যা বোঝাতে এই হাতের প্রয়োগ হয়।

মুকুল (নাট্যশাস্ত্র)—হংসমুখকে ঊর্ধ্বমুখী করে আঙুলগুলির অগ্রভাগ একত্র করলে মুকুল হয়। মুকুলের আকৃতি প্রাপ্ত হয় বলে একে মুকুল বলে। দেবতার অর্চনায়, নৈবেদ্যাদি উৎসর্গে, পদ্ম ও মুকুলের রূপায়নে ব্যবহৃত হয় এবং বিটদের (ধূর্ত ও লম্পট) চুম্বনে বিস্ফারিত হয়। ভোজনে, মোহর গণনায়, মুখ সঙ্কোচনে এবং মুকুলিত কুসুমের রূপায়ণেও এই হাত ব্যবহৃত হয়।

মুকুল (অভিনয় দর্পণ)—পাঁচটি আঙুলকে একত্রে মিলিত করলে মুকুল হস্ত হয়। কুমুদ, ভোজন, পঞ্চবাণ, মুদ্রা প্রভৃতি ধারণ, নাভি ও কদলীপুষ্প বোঝাতে এই হস্তের ব্যবহার হয়।

ঊর্ণনাভ (নাট্যশাস্ত্র)—পদ্মকোশ হাতের আঙুলগুলি কুঞ্চিত হলে ঊর্ণনাভ হয়। কেশ গ্রহণে, চৌর্যক্রিয়ায়, মস্তক কণ্ডুয়নে (চুলকানি), কুষ্ঠব্যাধির রূপায়ণে, সিংহ ও ব্যাঘ্রের অভিনয়ে এবং প্রস্তর গ্রহণে ব্যবহৃত হয়।

ত্রিশূল (অভিনয় দর্পণ)—কনিষ্ঠ ও অঙ্গুষ্ঠ কুঞ্চিত হলে ত্রিশূল হয়। বিল্বপত্র ও ত্রিত্বভাব বোঝাতে এই হস্তের প্রয়োগ হয়।

তাম্রচূড় (নাট্যশাস্ত্র)—তাম্রচূড় হস্তে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সন্দংশের মত হবে, তর্জনী বক্র হবে, অবশিষ্ট আঙুলদুটি করতলগত করতে হবে। একে তাম্রচূড় বলা হয়। অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা সশব্দ অবস্থায় বিচ্যুত করে তুড়ি দেওয়া, তাল, বিশ্বাস উৎপাদন, শীঘ্রতা ও সঙ্কেত করণ বোঝাতে এই হস্ত

ব্যবহৃত হয়। মাত্রা, সময়ের পরিমাণ, নিমেষ, ক্ষণ, বালকদের আলাপন ও নিমন্ত্রনে এই হস্তের প্রয়োগ হয়।

তাম্রচূড় (২য় মত) আঙুলগুলি যদি সংযুক্ত অবস্থায় বক্র হয় এবং অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা পীড়িত হয় এবং কনিষ্ঠা প্রসারিত থাকে তবে তাকে তাম্রচূড় বলে। এই তাম্রচূড় দ্বারা শত, সহস্র অথবা লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রদর্শন করা হয়। দ্রুত মুক্ত আঙুলগুলির দ্বারা স্ফুলিঙ্গ ও জলবিন্দু প্রদর্শিত হয়।

তাম্রচূড়—(অভিনয় দর্পণ) মুকুলহস্তে যদি তর্জনী বক্র হয় তবে তাম্রচূড় হস্ত হয়। কুক্কুট, বক, কাক, উট, গোবৎস প্রভৃতি বোঝাতে এই হাতের প্রয়োগ হয়।

একই রকম মুদ্রা দুই হাতে অথবা দুই রকমের মুদ্রা দুই হাতে প্রদর্শন করে অর্থ প্রকাশ করলে সংযুত হস্তভেদ বলা হয়। নাট্যশাস্ত্রে তেরো রকম এবং অভিনয় দর্পণে ২৩ রকমের সংযুত হস্তভেদ আছে।

নাট্যশাস্ত্র—"অঞ্জলিশ্চ কপোতশ্চ কর্কটঃ স্বস্তিক স্তথা।

খটকাবর্ধমানশ্চ হ্যুৎসঙ্গো নিষধস্তথা।

দোলঃ পুষ্পপুটশ্চৈব তথা মকর এব চ।

গজদন্তোঽবহিত্থশ্চ বর্ধমানস্তথৈব চ॥

এতে তু সংযুতা হস্তা ময়া প্রোক্তাস্ত্রয়োদশ।

অভিনয় দর্পণে ২৩ রকম সংযুত হস্তের কথা বলা হয়েছে।

অঞ্জলিশ্চ কপোতশ্চ কর্কটঃ স্বস্তিকস্তথা॥

ডোলাহস্তঃ পুষ্পপুট উৎসঙ্গঃ শিবলিঙ্গকঃ।

কটকাবৰ্দ্ধনশ্চৈব কৰ্ত্তরীস্বস্তিকস্তথা॥

শকটঃ শঙ্খচক্রে চ সম্পুটঃ পাশকীলকৌ।

মৎস্যঃ কূর্মো বরাহশ্চ গরুড়ো নাগবন্ধকঃ॥

খট্বা ভেরুণ্ড ইত্যেতে সঙ্খ্যাতাঃ সংযুতাঃ করাঃ।

ত্রয়োবিংশতিরিত্যুক্তাঃ পূর্ব্বৈর্ভরতাদিভিঃ॥

Mirror or Gestnre এ অন্য গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত ২১ রকম সংযুত হস্তের নাম পাওয়া যায়। যথা—অবহিত্থ, গজদন্ত; চতুরস্র, তলমুখ, স্বস্তিক, গরুড় পক্ষ, নিষধ, মকর, বর্ধমান, উদ্বৃত্ত, পক্ষপ্রদ্যোত, আবিদ্ধচক্র, রেচিত, নিতম্ব, লতা, পক্ষবঞ্চিত, বিপ্রকীর্ণ, অরাল, কটকমুখ, সূচ্যাস্য, অর্ধরেচিত, কেশবন্ধ, মুষ্টিস্বস্তিক, নলিনীপদ্মকোষ, উদ্বেষ্টিতালপদ্ম, উল্বন ও লোলিত।

অঞ্জলি (নাট্যশাস্ত্র)—পতাক হাতদুটি সংযুক্ত করলে অঞ্জলি হয়। দেবতা, গুরুজন ও বন্ধুজনের অভিবাদনে এই হস্ত ব্যবহৃত হয়। অঞ্জলি হাত শিরোস্থিত করে দেবতাদের, আস্যস্থিত করে গুরুজনদের এবং বক্ষঃস্থিত করে বন্ধুদের অভিনন্দন করতে হয়। অনত্র কোন নিয়ম নেই।

অঞ্জলি—(অভিনয় দর্পণ) দুটি পতাকা হাতের তলদেশ সংযুক্ত করলে অঞ্জলি হস্ত হয়। প্রয়োগ—নাট্যশাস্ত্রের মত।

কপোত—(নাট্যশাস্ত্র) উভয় হস্তের পরস্পরের পার্শ্বভাগ মিলিত হলে কপোত হয়। বিনয় প্রদর্শনে, গুরু সম্ভাষণ ও প্রণামে হাত দুটি বক্ষঃস্থলে রাখতে হয়। স্ত্রীলোক অথবা অধমদের পক্ষে শীতে ও আর্তভাবে কম্পিত অবস্থায় বক্ষঃস্থ করতে হয়। আঙুলগুলি ঘর্ষনের দ্বারা পরে মুক্ত করে সখেদোক্তিতে, এই পর্যন্ত, এখন করনীয় নয় এই উক্তিতে ব্যবহৃত হয়।

কপোত—(অভিনয় দর্পণ) ঐ করই কপোত হয় যদি মূল, অগ্রভাগ ও পার্শ্বদেশ মিলিত থাকে। প্রণাম, গুরু সম্ভাষণ ও সবিনয় অঙ্গীকারে ব্যবহৃত হয়।

কর্কট—(নাট্যশাস্ত্র) এক হাতের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে অন্য হাতের আঙুলগুলো প্রবেশ করালে কর্কট হয়। অঙ্গমোটনে, জৃম্ভণে (হাই তোলা , বৃহদাকার দেহে, হনুধারণে (চিবুক), শঙ্খগ্রহণে এই হাত প্রযোজ্য।

কর্কট—(অভিনয় দর্পণ) নাট্যশাস্ত্রের মত। জনসমূহের আগমন, তুন্দ দর্শন (উদর), শঙ্খবাদন, অঙ্গমোটন ও শাখা উন্নমনে ব্যবহৃত হয়।

স্বস্তিক—(নাট্যশাস্ত্র) অরালহস্তদ্বয় যদি বামপাশে উত্তান (চিৎকরে) অবস্থায় মনিবন্ধে বিন্যস্ত হয়, তাকে স্বস্তিক বলে। এই হাত স্ত্রীলোকদের পক্ষে প্রযোজ্য। স্বস্তিক বিচ্যুত করে দিকসমূহ, আকাশ, মেঘ, বন, সমুদ্র, ষড় ঋতু ও পৃথিবী প্রভৃতির অভিনয় করতে হয়।

স্বস্তিক—(অভিনয় দর্পণ) দুটি পতাক কর মণিবন্ধে পরস্পর সংযুক্ত হলে স্বস্তিক হস্ত হয়। মকরে প্রয়োগ হয়।

কটকাবর্দ্ধমান—(নাট্যশাস্ত্র) একটি কটকামুখ যদি অপর কটকামুখের ওপর স্থাপিত হয় তবে তাকে কটকাবর্দ্ধমান বলে। শৃঙ্গারভাবের প্রকাশে তাম্বুলাদির গ্রহণে এবং প্রণামে ব্যবহৃত হয়।

কটকাবর্দ্ধন—(অভিনয় দর্পণ) দুটি কটকামুখ মনিবন্ধে স্বস্তিকাকারে স্থাপিত হলে এই হস্ত হয়। পট্টাভিষেক, পূজা, বিবাহাদিতে প্রযুক্ত হয়।

উৎসঙ্গ—(নাট্যশাস্ত্র) অরালহস্তদ্বয় বিপরীত ভাবে, উত্তান (চিৎ), উর্ধ্বমুখ ও অবনত হলে উৎসঙ্গ হয়। নিষ্পেষণযুক্ত হস্ত রোষে, অমর্ষে এবং এই হাতই নিপীড়িত হলে স্ত্রীলোকের ঈর্ষ্যায় প্রযুক্ত হয়।

উৎসঙ্গ—(অভিনয় দর্পণ) দুটি মৃগশীর্ষ কর যদি পরস্পর পরস্পরের বাহুদেশে স্থাপিত হয়, তবে উৎসঙ্গ হস্ত হয়। আলিঙ্গন, লজ্জা, অঙ্গ প্রভৃতি প্রদর্শনে ও বালক বালিকার শিক্ষাদানে ব্যবহৃত হয়।

নিষধ—(নাট্যশাস্ত্র) মুকুল হস্ত যদি কপিত্থ হস্তের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়, তবে 'নিষধ' হস্ত হয়। সংগ্রহে, গ্রহণে, ধারণে, সময়, সত্যবচনে, সংক্ষেপে নিপীড়িত হাতের দ্বারা অভিনয় করা হয়ে থাকে। বামহাতটি দক্ষিণ হাতের কূপরের (কনুই) ভেতর ন্যস্ত হলে এবং দক্ষিণ হাতটি বামহাতের কূপরের (কনুয়ের) ভেতর মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় ন্যস্ত হলে নিষধ হস্ত হয়। এর দ্বারা ধৈর্য, মদ, গর্ব, সৌষ্ঠব, ঔৎসুক্য, বিক্রম, আটোপ,[১] অভিমান,[২] অবষ্টম্ভ, স্তম্ভ, স্থৈর্যাদি বোঝায়।

দোলহস্ত (নাট্যশাস্ত্র)—কাঁধ দুটি শিথিল করে পতাক হাত দুটি প্রলম্বিত ও মুক্ত রাখলে দোলহস্ত হয়। সম্ভ্রমে, বিষাদে, মূর্চ্ছায়, মত্ততায়, আবেগে, ব্যাধিপ্লুত অবস্থায় ও শস্ত্রক্ষতে এই হাত প্রযুক্ত হয়।

ডোলাহস্ত (অভিনয় দর্পণ)—পতাক হাতদুটি উরুদেশে স্থাপিত হলে ডোলাহস্ত হয়। নাট্যারম্ভে এই হাত প্রযোজ্য।

পুষ্পপুট—(নাট্যশাস্ত্র) দুটি সর্পশির হাত যদি পার্শ্বসংশ্লিষ্ট থাকে তাহলে 'পুষ্পপুট' হয়। ধান, ফুল, ভোজ্যপদার্থ, নানারকম সজল পদার্থ এই হাতের দ্বারা গ্রহনীয়। উপহারের মত দেয়, জল আনয়ন ও অপসারণ করনীয়।

পুষ্পপুট—(অভিনয় দর্পণ) পরস্পর সংশ্লিষ্ট হাতদুটিকে সর্পশীর্ষ করলে পুষ্পপুট হয়। নীরাজনবিধিতে ; বারি, ফল প্রভৃতির গ্রহণে, সান্ধ্যোপসনায়, অর্ঘ্যদানে, মন্ত্রপুষ্প বোঝাতে প্রযোজ্য হয়।

মকর—(নাট্যশাস্ত্র) একটি পতাক হস্তের ওপর আর একটি পতাক হস্ত উপর্যুপরি স্থাপিত করে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উর্ধ্বমুখী এবং আঙুল নিম্নমুখী হলে

১। দর্প, গর্ব, আত্মাভিমান ইত্যাদি। ২। ভয়, ঔদ্ধত্য, গর্ব, সাহস, স্থির সংকল্প ইত্যাদি

মকর হস্ত হয়। সিংহ, বাঘ, সাপ, কুমীর, মকর, মৎস্য ও মাংসাশী জীব ও অন্যান্য প্রাণী দেখাতে মকর হাত হয়।

শিবলিঙ্গ—(অভিনয় দর্পণ) বাম হাতে অর্ধচন্দ্র ও ডান হাতে শিখর করলে 'শিবলিঙ্গ হয়। শিবলিঙ্গ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

কটকাবৰ্দ্ধন—(অভিনয় দর্পণ) দুটি কটকামুখ হাতে পরস্পরের মণিবন্ধে সংযুক্ত করে যে স্বস্তিক হয় তার নাম কটকাবৰ্দ্ধন হস্ত। পট্টাভিষেকে, পূজা, বিবাহাদিতে প্রযুক্ত হয়।

কর্ত্তরী স্বস্তিক—(অভিনয় দর্পণ) দুই হাতের কর্ত্তরীমুখ স্বস্তিকাকারে সংযুক্ত হলে কর্ত্তরীস্বস্তিক হয়। শাখা, গিরিশিখর, বৃক্ষ প্রভৃতি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

শকট—(অভিনয় দর্পণ) ভ্রমর হাতের মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ প্রসারিত হলে শকট হয়। রাক্ষসের অভিনয়ে ব্যবহৃত হয়।

শঙ্খ—(অভিনয় দর্পণ) এক হাতের শিখরের অন্তর্গত অঙ্গুষ্ঠের সঙ্গে অপর অঙ্গুষ্ঠটি মিলিত হয়ে তর্জনী দ্বারা যুক্ত ও আশ্লিষ্ট হলে শঙ্খ হস্ত হয়। শঙ্খ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়।

চক্র—(অভিনয় দর্পণ) যখন দুটি অৰ্দ্ধচন্দ্র হাত তির্যগভাবে পরস্পরের তলদেশ স্পর্শ করে তখন তাকে চক্র হস্ত বলে। চক্র বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

সম্পুট—(অভিনয় দর্পণ) চক্রে আঙুলগুলি কুঞ্চিত হলে 'সম্পুট' হয়। বস্তুর আচ্ছাদন বা বাক্স বোঝাতে 'সম্পুট' হয়।

পাশ—(অভিনয় দর্পণ) দুটি সূচীহাতের তর্জনী দুটি পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও কুঞ্চিত হলে 'পাশ' হয়।

পরস্পর কলহ, পাশ ও শৃঙ্খল বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

কীলক—(অভিনয় দর্পণ) মৃগশীর্ষ হাতে কনিষ্ঠাদুটি কুঞ্চিত হয়ে সংযুক্ত হলে 'কীলক' হয়।

স্নেহে, পরিহাস ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

মৎস্যহস্ত—(অভিনয় দর্পণ) যখন একটি অধোমুখ করপৃষ্ঠের ওপর অধোমুখ অপর হাতটি ন্যস্ত হয়, আর অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা দুটি কিছু প্রসারিত থাকে, তখন তাকে মৎস্য বলে। মৎস্যরূপ প্রদর্শনে এর প্রয়োগ হয়।

কূর্মহস্ত—(অভিনয় দর্পণ) চক্রহস্তে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় ও কনিষ্ঠাদ্বয় ছাড়া অপর আঙুলগুলির অগ্রভাগ কুঞ্চিত হলে কূর্ম হস্ত হয়। কূর্ম বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

বরাহহস্ত—(অভিনয় দর্পণ) এক হাতের মৃগশীর্ষের ওপর অন্যহাতের অপর মৃগশীর্ষটি যদি স্থাপিত হয় ও উভয় হাতের কনিষ্ঠাদ্বয় ও অঙ্গুষ্ঠদ্বয় যদি পরস্পর মিলিত হয় তবে তাকে বরাহহস্ত বলে বরাহ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

গরুড়হস্ত—(অভিনয় দর্পণ) দুটি অর্ধচন্দ্র হাতের তলদেশ যদি তির্যগভাবে থাকে ও অঙ্গুষ্ঠ দুটি পরস্পর সংযুক্ত থাকে, তবে তাকে গরুড় হাত বলে। গরুড় পাখী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

নাগবন্ধ হস্ত—(অভিনয় দর্পণ) যদি দুটি সর্পশীর্ষ স্বস্তিকাকারে সংবদ্ধ হয়, তবে নাগবন্ধ হয়। নাগবন্ধে এর প্রয়োগ হয়।

খট্টাহস্ত—(অভিনয় দর্পণ) এক হাতের চতুরে অপর হাতের চতুর নিবেশ করে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠকে উন্মুক্ত করলে খট্টাহস্ত হয়। খট্টা ও শিবিকা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

ভেরুণ্ড—(অভিনয় দর্পণ) দুটি কপিত্থ হাত মণিবন্ধে সংযুক্ত হলে ভেরুণ্ড হয়। ভেরুণ্ড পাখী ও পক্ষীদম্পতি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

গজদন্ত—(নাট্যশাস্ত্র) যখন সর্পশির হাত দুটিতে কনুই ও কাঁধ বক্র হয় তখন সেই হাত গজদন্ত নামে খ্যাত হয়। অভিনবগুপ্ত এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, যখন সর্পশির হাত দুটি একে অন্যের বাহুকে ঠিক উপরিভাগে বেষ্টন করে তখন তাকে 'গজদন্ত' বলা হয়। বরের যাত্রা, বধূগ্রহণ, গুরুভার, স্তম্ভগ্রহণে, এবং পর্বতের শিলোৎপাটনে ব্যবহৃত হয়।

অবহিত্থ—(নাট্যশাস্ত্র) শুকতুণ্ড হাত দুটি বক্ষাভিমুখী করে ধীরে ধীরে অধোমুখী করলে অবহিত্থ হয়। দৌর্বল্যে, নিঃশ্বাসে, গাত্রদর্শনে ও ক্ষীণত্বে, উৎকণ্ঠা প্রকাশে ব্যবহৃত হয়।

বর্ধমান হস্ত—(নাট্যশাস্ত্র) হংসপক্ষকে পরাঙ্মুখ করলে বর্ধমানহস্ত হয়। জাল (পর্দা), বাতায়ন প্রভৃতি উন্মোচনে এই হাত ব্যবহৃত হয়।

আচার্য ভরত উপসংহারে বলেছেন যে, বাস্তবক্ষেত্রে অভিজ্ঞ নট চিন্তাপূর্বক নিজ নিজ আকৃতি, প্রচেষ্টা, চিহ্ন ও জাতি বিষয়ে হস্তাভিনয় প্রদর্শন করবেন।

কথাকলি নৃত্যে মূল ২৪ রকম হস্তভেদের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অনুশীলনের দ্বারা এই ২৪ রকম হস্তভেদ থেকে আরও অনেক মুদ্রার অথবা

হস্তভেদের সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় পাঁচ-শো মুদ্রার উদ্ভব হয়েছে বলে কথাকলি নৃত্যশিল্পীরা দাবী করেন। এক একটি বড় বড় কাহিনীকে মুদ্রার সাহায্যে পরিস্ফুট করা হয় বলে একে 'নৃত্যের ভাষা' বলা হয়ে থাকে।

ভরত বিংশতি রকম করকর্মের উল্লেখ করেছেন—উৎকর্ষণ, বিকর্ষণ, পরিগ্রহ, নিগ্রহ, আহ্বান, তোদন, সংশ্লেষ, বিয়োগ, রক্ষণ, মোক্ষণ, বিক্ষেপ, ধূনন, বিসর্গ, তর্জন, ছেদন ভেদন, স্ফোটন, মোটন ও তাড়ন। নাট্যতত্ত্বাশ্রিত হস্তপ্রচার তিন রকম—উত্তান, পার্শ্বগ ও অধোমুখ।

সকল রকম হস্তপ্রচারই প্রয়োগকালে চোখ, ভ্রূ, ও মুখরাগাদি দ্বারা যথাবিধি ব্যঞ্জনাযুক্ত করতে হবে। উত্তম নটরা (রাজা, অমাত্য, বিদূষক প্রভৃতি) উত্তমবস্তুর নির্দেশে (দেবতা, গুরু, নৃপ প্রভৃতি) অঞ্জলি হস্ত প্রভৃতি ললাটদেশে স্থাপন করবেন। মধ্যম নটরা অধমবস্তুর নির্দেশে বক্ষঃস্থলে চতুরাদি হস্ত স্থাপন করবেন এবং অধম নটরা অধম বস্তুর নির্দেশে শুকতুণ্ডাদি হস্ত অধোগত করবেন। তবে চন্দ্রতারাদি দর্শনে অধমেরও ললাটদেশে হস্ত স্থাপন করা বিধিবিরুদ্ধ নয়। উত্তম নট অল্প হস্ত প্রচার করবেন, মধ্যম নট অপেক্ষাকৃত বেশী এবং অধম নট সব থেকে বেশী করবেন। বিষণ্ণে, মূর্চ্ছায়, লজ্জায়, জুগুপ্সায়, শোকে, পীড়ায়, গ্লানিতে, নিদ্রায় হস্তের বিকল অবস্থায়, নিশ্চেষ্ট-অবস্থায়, তন্দ্রায়, জড়তায়, ব্যাধিগ্রস্ত, জরাগ্রস্ত, ভয়ার্ত, শীতার্ত, মত্ত, প্রমত্ত, ও উন্মত্ত অবস্থায়, চিন্তায়, তপস্যায়, তুষারপাতে, আচ্ছন্ন অবস্থায়, বদ্ধ অবস্থায়, জলপ্লাবনে, নিদ্রার ভানে হস্তাভিনয় হবে না। অর্থাৎ উক্ত ক্ষেত্রসমূহে বাহ্য দ্রব্যগুণাদির (কমল, ভ্রমর প্রভৃতির) হস্তাভিনয় নিষিদ্ধ নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কপোতের মত ভয়, কর্কটের মত মদন বিজৃম্ভণ, শুকতুণ্ডের মত ঈর্ষ্যাদির প্রকাশক হস্তপ্রচার বিধিসম্মত।

ভরতের মতে নাট্যতত্ত্বসমাশ্রিত হস্তপ্রচার তিন রকম—উত্তান, পার্শ্বগ ও অধোমুখ। অন্যমতে (ভট্টোদ্ভট্ট) পাঁচ রকম—উত্তান, বর্তুল, ত্র্যস্র, পার্শ্বগ ও অধোমুখ।

ভরত নৃত্তসমাশ্রিত হস্তের প্রয়োগকে নৃত্তহস্ত বলেছেন ত্রিশ রকম নৃত্তহস্তের নাম পাওয়া যায়।

চতুরশ্র—বক্ষ থেকে আট আঙুল দূরত্বে দুই হাতের খটকামুখ যদি অধোমুখী হয় এবং অংশ (স্কন্ধ) ও কূর্পর (কনুই) সমরেখায় থাকে তাহ'লে চতুরশ্র হয়।

উদ্বৃত্ত—হংস পক্ষ হাত দুটি যদি তালবৃন্তের মত ব্যাবৃত (ঘূর্ণিত) হয়, তাহলে উদ্বৃত্ত হস্ত বলে।

তলমুখ—চতুরস্র হস্ত দুটিকে হংসপক্ষ করে তির্য্যগ্‌ভাবে অভিমুখী করে রাখলে তলমুখ হয়। অভিনব গুপ্ত বলেছেন মাদল এবং মধুর বাদ্য প্রভৃতিতে প্রযোজ্য।

স্বস্তিক—তলমুখকে মনিবন্ধে স্বস্তিকাকারে রাখলে স্বস্তিক হয়।

বিপ্রকীর্ণ—স্বস্তিক বিচ্যুত হলে বিপ্রকীর্ণ।

অরালখটকামুখ—স্বস্তিকের মত পতাক হাত করে অলপল্লবের দ্বারা ব্যবর্তন করতে হবে। পরে সেই হাতটিকে উর্ধ্বমুখে পদ্মকোশ করে সঙ্গে সঙ্গেই অরালে আবর্তন করে একটি অরাল ও অপরটি চতুরস্রের দ্বারা খটকামুখ করলে অরালখটকামুখ হয়। কেউ কেউ বলেন চতুরস্রের পরিবর্তে স্বস্তিকও ব্যবহার করা যায়। অপরমতে পুর্বে দুটি অরাল করতে হবে এবং অরালদুটিকে খটকামুখ করতে হবে।

আবিদ্ধবক্র—বাহু, স্কন্ধ ও কনুইয়ের অগ্রভাগ (পতাক হস্তে) বক্র করে আবর্তন করলে এবং অধোমুখতল যুক্ত করলে আবিদ্ধবক্র হয়।

সূচীমুখ—সর্পশীর্ষ হাতদুটির মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠকে যুক্ত করে হাতদুটিকে তির্যগ্‌ভাবে পর্যায়ক্রমে প্রসারিত করলে সূচীমুখ হয়।

রেচিত—হংসপক্ষ দুটিকে দ্রুত ভ্রমণ করিয়ে উত্তান করে তলদেশ প্রসারিত করলে রেচিত হয়।

অর্ধরেচিত—বাম হাত চতুরস্রে রেখে দক্ষিণ হাত রেচিত হলে অর্ধরেচিত হয়।

উত্তানবঞ্চিত—কূর্পর ও অংস কিঞ্চিৎ সঞ্চালন করে দুই হাতে ত্রিপতাক করে তির্যগ্‌ভাবে রাখলে উত্তানবঞ্চিত হয়।

পল্লব—পতাক হাত দুটি মণিবন্ধ থেকে বিচ্যুত করলে পল্লব হয়।

নিতম্ব—পতাক হাতদুটিকে কাঁধ থেকে পর্যায়ক্রমে নিতম্বে স্থাপন করলে নিতম্ব হয়।

লতা—পতাক হাত দুটি তির্যগভাবে প্রসারিত হলে লতা হয়।

কেশবন্ধ—কেশের থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পার্শ্বস্থিত হলে কেশবন্ধ হয়।

করিহস্ত—যদি সমুন্নত লতা হস্ত একদিক থেকে অপরদিকে বিলোলিত ভাবে (দোলায়িত) নেওয়া হয় এবং অপর হাত কানের ওপর ত্রিপতাক করা হয়, তবে করিহস্ত হয়।

পক্ষবঞ্চিত—ত্রিপতাক হাত দুটির অগ্র ভাগ (একটি কটিদেশে ও একটি মস্তকে) সংশ্লিষ্ট হয় তাহলে পক্ষবঞ্চিত হয়।

পক্ষপ্রদ্যোতক—ঐ দুটি হাত বিপরীতভাবে অর্থাৎ কটিদেশের হাতটি মস্তকে এবং মস্তকের হাতটি কটিতে থাকলে পক্ষপ্রদ্যোতক হয়।

দণ্ডপক্ষ—হস্তদ্বয় হংসপক্ষ করে ব্যাবৃত, পরিবর্তিত এবং প্রসারিত করলে দণ্ডপক্ষ হয়।

উর্ধ্বমণ্ডল—পতাক হাত দুটি উর্ধ্বদেশে বিবর্তন করালে উর্ধ্বমণ্ডল হয়।

গরুড়পক্ষ—অধোমুখ করতলদ্বয় আবিদ্ধ হলে গরুড়পক্ষ হয়।

পার্শ্বার্ধ্বমণ্ডল—অলপল্লব ও অরাল হাতকে বক্ষোদেশ থেকে উত্থিত করে অর্ধ্বভ্রমণ করিয়ে পাশে এনে অবস্থান করালে পার্শ্বার্ধ্বমণ্ডল হয়।

পার্শ্বমণ্ডল—পতাক হস্তদ্বয় উর্ধ্বদেশ থেকে পাশের দিকে ভ্রমণ করালে পার্শ্বমণ্ডল হয়।

উরোমণ্ডল—একটি উদ্বেষ্টিত ও অপরটি পাশে আবেষ্টিত হয়ে বক্ষোদেশে স্থাপিত হলে উরোমণ্ডল হয়।

মুষ্টিস্বস্তিক—হাত দুটি মণিবন্ধের অন্তে রেখে একটি হাত কুঞ্চিত (অরাল-বর্তন) এবং অপরটি অঞ্চিত (অলপল্লব) করতে হবে।

অলপদ্মক—অলপল্লবকে যদি বুকের থেকে উদ্বেষ্টিত করে কাঁধ পর্যন্ত উত্থিত করা হয়, তাহলে 'অলপদ্মক' হয়।

নলিনীপদ্মকোশ—পদ্মকোশ হাত যদি ব্যাবৃত ও পরিবর্তিত হয়, তাহলে 'নলিনীপদ্মকোশ' হয়।

উল্বন—অলপল্লব হাতদুটির অগ্রভাগ উদ্বেষ্টিত করে হাতদুটি উর্ধ্বে প্রসারিত ও আবিদ্ধ হলে উল্বন হয়।

ললিত—পল্লবকে শিরোদেশে স্থাপিত করলে 'ললিত' হয়।

বলিত—লতা হস্তকে কূর্পরস্থানে (কনুই) স্বস্তিক করলে বলিত হয়। অভিনয় দর্পণে তেরো প্রকার নৃত্তহস্তের কথা বলা হয়েছে। এইগুলি হচ্ছে—পতাক, স্বস্তিক, ডোলাহস্ত, অঞ্জলি, কটকাবর্ধন, শকট, পাশ, কীলক, কপিত্থ, শিখর, কূর্ম,

হংসাস্ত ও অলপদ্ম। এছাড়া দেবদেবী, দশঅবতার, নবগ্রহ, প্রভৃতির উল্লেখ আছে। নন্দিকেশ্বর নৃত্যহস্তের পাঁচটি গতির কথা বলেছেন—ঊর্দ্ধা, অধো, উত্তরা, প্রাচী ও দক্ষিণা। যে পদচালনা করা হবে ঠিক সেইভাবে উভয় হাতের গতি হবে। বামাঙ্গের দিকে বাম হস্ত-পদ, দক্ষিণ হস্তপদ দক্ষিণ দিকে চালনা করতে হবে।

অসংযুত হস্ত

নাম—	নাট্যশাস্ত্র	অভিনয় দর্পণ	হস্তলক্ষণদীপিকা
পতাক		একই প্রকার	
ত্রিপতাক		একই প্রকার	
অর্ধপতাক	×		
কর্তরীমুখ		একই প্রকার	

নাম—	নাট্যশাস্ত্র	অভিনয় দর্পণ	হস্তলক্ষণদীপিকা
ময়ূর	×		
অর্ধচন্দ্র	অভিনয় দর্পণের সর্পশীর্ষের মত		
অরাল		একই প্রকার	
শুকতুণ্ড		একই প্রকার	
		একই প্রকার	একই প্রকার

নাম— নাট্যশাস্ত্র অভিনয়দর্পণ হস্তলক্ষণদীপিকা
শিখর
একই প্রকার
কপিত্থ
একই প্রকার
সূচী
কটকামুখ

নাম—	নাট্যশাস্ত্র	অভিনয় দর্পণ	হস্তলক্ষণদীপিকা
চন্দ্রকলা	×	হস্তলক্ষণ দীপিকার মত	
সর্পশীর্ষ			একই রকম অভিনয় দর্পণ
পদ্মকোশ		একই প্রকার	
মৃগশীর্ষ		একই প্রকার	
সিংহমুখ		হস্তলক্ষণদীপিকার মৃগশীর্ষের মত	
কাঙ্গুল		একই প্রকার	

নাম—	নাট্যশাস্ত্র	অভিনয় দর্পণ	হস্তলক্ষণদীপিকা
অলপল্লব		একই প্রকার	
চতুর	অভিনয় দর্পণের মতন। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মধ্যমকরে স্থাপন করতে হবে।		
ভ্রমর	একই প্রকার		
হংসাস্য			একই প্রকার
হংসপক্ষ		একই প্রকার	

নাম—	নাট্যশাস্ত্র	অভিনয় দর্পণ	হস্তলক্ষণদীপিকা
সন্দংশ			
মুকুল	সন্দংশের ন্যায় (অঃ দঃ)	একই প্রকার	একই প্রকার
তাম্রচূড়	২য় মত ১ম মত		

ঊর্ণনাভ

ব্যাঘ্র (অতিরিক্ত)
নাট্য শাস্ত্রের
ঊর্ণনাভের মত।

ত্রিশূল

মুকুর

নাম—	নাট্যশাস্ত্র	অভিনয় দর্পণ	হস্তলক্ষণদীপিকা
বর্ধমানক			
মুদ্রাক্ষ			

সংযুত হস্ত

নাম—		অভিনয় দর্পণ
অঞ্জলী		একই প্রকার
কপোত		একই প্রকার
কর্কট		নাট্যশাস্ত্রের মত
স্বস্তিক		

নাম— নাট্যশাস্ত্র অভিনয় দর্পণ
কটকাবর্ধমান
কটকাবর্ধন
উৎসঙ্গ
নিষধ
১ মত
২য় মত
দোলহস্ত
(ডোলাহস্ত) পতাক হস্ত উরুতে রাখতে হবে।
পুষ্পপুট
একই প্রকার
মকর
মৎস
শিবলিঙ্গ

নাম—	নাট্যশাস্ত্র	অভিনয় দর্পণ
কর্ত্তরীস্বস্তিক	×	
শকট	×	
শঙ্খ	×	
চক্র	×	
সম্পুট	×	
পাশ	×	
কীলক	×	
কূর্ম		

নাম—	নাট্যশাস্ত্র	অভিনয় দর্পণ
বরাহ	×	
গরুড়	×	
নাগবন্ধ	×	
খট্বা	×	
ভেরুণ্ড	×	
গজদন্ত		
অবহিথ		
বর্দ্ধমান		

নৃত্যের প্রকার ভেদ

ব্যয়ীরচৎ ত্রয়মিদং ধর্মকামার্থ মোক্ষদম্ ।
কীর্তি—প্রাগলভ্য—সৌভাগ্য—বৈদগধ্যানাং প্রবর্ধনম্ ।
ঔদার্য—স্থৈর্য—ধৈর্যাণাং বিলাসস্ত চ কারণম্ ॥

নৃত্যের-প্রকারভেদ

নৃত্যের জগতে আমরা ভরতের নাট্যশাস্ত্রের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। প্রাচীনকালে নৃত্যগুরুরা মুনিভরতের নাট্যশাস্ত্রকেই বিশেষভাবে অনুসরণ করতেন এবং ভারতীয় নৃত্য নাট্যশাস্ত্রের ভিত্তিতেই রচিত হয়েছিল।

ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে বলেছেন—"নাট্যস্য নট-বৃত্তস্য-শাস্ত্রং শাসনোপায়ং গ্রন্থং প্রবক্ষ্যামিতী," "নাট্যবেদঃ নাট্যশাস্ত্রম্"। সুতরাং নাট্যের অর্থাৎ নটবৃত্তির অনুশাসন যাতে লিপিবদ্ধ আছে তাই নাট্যশাস্ত্র। পক্ষান্তরে তিনি নাট্যবেদকেই নাট্যশাস্ত্র বলেছেন। নাট্যাচার্য ভরত গন্ধর্ববেদ ও নাট্যবেদের বিশ্লেষণে বলেছেন যা গীত প্রধান তা গন্ধর্ববেদ এবং যা অভিনয় প্রধান তা নাট্যবেদ।

এই নাট্যবেদ বা নাট্যশাস্ত্র ব্রহ্মা কর্তৃক উক্ত ও মুনিভরত কর্তৃক যথাযথ পরিপাটির সঙ্গে নিরূপিত। নন্দিকেশ্বরের অভিনয়দর্পণও একটি উল্লেখ যোগ্য নাট্যশাস্ত্র। নাট্যাচার্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রে গুনীরূপে কহিণ; সদাশিব, ব্রহ্মা ভরত, তণ্ডু প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। সঙ্গীতমেরুতে কোহলও নিম্নলিখিত সঙ্গীতাচার্যদের নাম করেছেন—ভট্ট তণ্ডু, শম্ভু, সুমন্ত, পুরারি, ক্ষেমরাজ, লোহিত ভট্ট ইত্যাদি। শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীতরত্নাকরেও এই সব গুনীদের নাম পাওয়া যায়—ভরত, কাশ্যপ, মতঙ্গ, যাষ্টিক, শার্দুল বিশ্বখিল, কোহল, দত্তিল, কম্বল, অশ্বতর, বায়ু, বিশ্ববসু, অর্জুন, নারদ, তম্বরু, অঞ্জনেয়, মাতৃগুপ্ত, স্বাতী, গুণ, বিশ্বরাজ, ক্ষেত্ররাজ, রাহুল, রুদ্রত, নান্যভূপাল, ভোজরাজ, সোমেশ, মহীপতি ইত্যাদি। সঙ্গীতমকরন্দেও এই সকল গুনীর নাম পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ তেলাঙ নাট্যশাস্ত্রকার হিসেবে পাঁচজন ভরতের নাম করেছেন—আদি ভরত, নাট্যশাস্ত্রকার ভরত, দত্তিল ভরত, কোহল ভরত ও যাষ্টিক ভরত। রামকৃষ্ণ তেলাঙ এঁদেরই পঞ্চ ভরত আখ্যা দিয়েছেন। শারদাতনয় ছয়জন ভরতের নামোল্লেখ করেছেন - নাট্যশাস্ত্রকার ভরত, নন্দী ভরত, মতঙ্গ ভরত, কশ্যপ ভরত, কোহল ভরত ও তণ্ডু ভরত। ডঃ রাঘবন 'পঞ্চ ভারতীয়ম' নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।

নাট্যাচার্য ভরতের নাট্যশাস্ত্রে একশত পুত্রের ভেতর কোহল, দত্তিল ও তণ্ডুর নাম পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্রে আছে যে, ভরতের এই একশ পুত্রের দ্বারাই মর্ত্তে নাট্য প্রচলিত হয়। এই প্রসঙ্গে মুনিরা নাট্যাচার্য ভরতকে প্রশ্ন করেন—'মানবরা অসীম সাহসিক কার্যাবলী দ্বারা নাট্যের সৃষ্টি করেছেন। অতএব এ বিষয়ে যে বস্তু মানব সমাজ থেকে গোপন করে রাখা হয়েছে তা সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করুন। পূর্বরঙ্গে যে সকল দেবতাদের আবাহন করে পূজা করা হয়, তাঁদের বিষয়েও আমরা অবগত হতে চাই। পূর্বরঙ্গে কুতপবাদ্যের অবতারণা কেন করা হয় এবং এতে কি উদ্দেশ্য সাধিত হয়? এতে কোন দেবতা তুষ্ট হন এবং তুষ্ট হলে কি উপকার করেন, নাট্যাচার্য শুদ্ধভাবে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হয়ে রঙ্গপুজোর উদ্দেশ্যে বারিসিঞ্চন করেন কেন? নাট্য স্বর্গ থেকে মর্ত্তে কি ভাবে এলো? আপনার বংশধররা শূদ্র বলে পরিচিত হলেন কেন?" মুনিদের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে ভরত একে একে সকল প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি বলেন—'আমি পূর্বে পূর্বরঙ্গতে যা বলেছি তাতে বিঘ্ননাশের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। বর্ম যেমন ক্ষেপণাস্ত্র থেকে দেহকে রক্ষা করে, হোমও সেই রকম পাপ থেকে আমাদের রক্ষা করে। এই ভাবে জপ, হোম, স্তুতি, গীত ও বাদ্য প্রভৃতির দ্বারা দেবতাদের কার্য্যাবলী ও গুণাবলীর প্রশংসা করলে তাঁরা তুষ্ট হয়ে বলেন—আমরা অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে প্রীত হয়েছি। এগুলি দেবতা ও অসুরদের আনন্দদানের পর জনচিত্তে আনন্দ দান করে বলে একে 'নান্দী' বলা হোক। যখন গীত ও বাদ্যের মাধ্যমে এই সকল শুভসূচক বাক্য উচ্চারিত হয়ে সেই স্থানকে প্রতিধ্বনিত করে, তখন সকল অমঙ্গল দূরীভূত হয়ে সৌভাগ্য সূচিত হয়। নান্দী বেদমন্ত্রের মতই কার্য্যকরী। দেবরাজ ও শঙ্করের কাছে শুনেছি সঙ্গীত, জপ ও পূতবারি স্নানের থেকে সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। মঞ্চে প্রণাম করতে করতে নাট্যাচার্যের ক্লান্তি আসে বলে পবিত্র বারি সিঞ্চনের বিধি আছে। বারিসিঞ্চনের পর নাট্যাচার্য মন্ত্রের দ্বারা জর্জর পুজো করবেন।

নাট্য স্বর্গ থেকে মর্ত্তে কি ভাবে প্রচার হল সে সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত বলব। আমার পুত্ররা নাট্যবেদে বিশেষভাবে পারদর্শী হয়ে জ্ঞানমদে মত্ত হয় এবং হাস্য রসাত্মক প্রহসন দ্বারা জনসাধারণের বিরক্তি উৎপাদন করে। একদা তারা একটি জনসভায় মুনিদের ব্যাঙ্গাত্মকভাবে অনুকরণ করে দুষ্টু কাজ

গুলি অভিনয় করে। এতে গ্রাম্য আচার ব্যবহার অনুকরণ করা হয় এবং এর বিষয়বস্তু যেমন অসাধু তেমনই নিষ্ঠুর ছিল।

এইজন্যে কেউ একে সমর্থন করে নি। এই সকল নাট্য দেখে দেখে ঋষিরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁদের এইরকম উপহসিত হবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। মুনিরা বলেন, যে বিদ্যার (নাট্যের) গর্বে গর্বিত হয়ে তোমরা স্বেচ্ছাচারিতা আরম্ভ করেছ, সেই কুবিদ্যা ধ্বংস হবে। মুনি ও ব্রাহ্মণদের কাছে তোমরা বেদের অনুগামী বলে স্বীকৃতি পাবে না এবং তোমরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়ে তাদের কার্য্যাবলী অনুসরণ করবে। তোমাদের বংশধররা অশুদ্ধ এবং নর্তক হবে। তাদের স্ত্রী ও পুত্র কন্যারাও অন্যের দাসত্ব করবে।

দেবতারা এই বার্তা শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে মুনিদের বিবেচনা করতে অনুরোধ করেন। দেবতারা ইন্দ্রকে মুখপাত্র করে মুনিদের বললেন, দুঃখকষ্টে জর্জরিত হয়ে নাট্য ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। ঋষিরা বললেন, ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না, কিন্তু অভিশাপের অবশিষ্ট অংশ কার্যকরী হবে।

এই ভাবে অভিশপ্ত হয়ে ভরত পুত্ররা জীবন ত্যাগ করতে মনস্থ করলেন এবং ভরতকে বললেন আমরা তোমার দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে নাট্যদোষে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হলাম। ভরত সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—ঋষিবাক্য অসত্য হয় না। সুতরাং তোমরা আত্মহত্যা কোরো না। তবে তোমরা একে প্রচার করবার জন্যে তোমাদের শিষ্য ও বংশধরদের শিক্ষা দাও। স্মরণ রেখো, এই নাট্যকলা ব্রহ্মা দ্বারা বর্নিত হয়েছে এবং অত্যন্ত কষ্টে এর উদ্ভাবন হয়েছে ও বেদে এর মূল নিহিত রয়েছে। আমি অপ্সরাদের কাছে শুনেছি যে তোমাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

রাজা নহুষ পরবর্তীকালে নিজের ক্ষমতা, বুদ্ধিমত্তা ও যাগযজ্ঞাদির বলে স্বর্গের অধিপতি হন। গন্ধর্বদের গান্ধর্ববিদ্যা ও দেবতাদের নাট্যকলা দেখে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তিনি নিজের প্রাসাদে এই নাট্য বিদ্যা অভিনয় করাবার জন্য দেবতাদের কাছে নিবেদন করেন। উত্তরে দেবতারা বৃহস্পতিকে মুখপাত্র করে বললেন মানুষের সঙ্গে স্বর্গের কন্যাদের সাক্ষাতের নিয়ম নেই। স্বর্গের অধিপতি হিসেবে আমরা আপনাকে এই উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি নাট্যাচার্যকে আপনার সন্তুষ্টির জন্যে প্রাসাদে নিয়ে যান। তদানুসারে এই নাট্যকলা মর্তে প্রচার করবার জন্যে নহুষ কৃতাঞ্জলি হয়ে ভরতকে অনুরোধ

করেন। তিনি বলেন—আমার পিতামহের প্রাসাদের অন্তঃপুরে পুরনারীদের কাছে উর্বশী এই কলার ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু উর্বশীর অন্তর্ধানে আমার পিতামহ যখন বিরহে অস্থির হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন তখন এই নাট্যকলা লুপ্ত হয়ে গেল। যাতে বিশেষ বিশেষ তিথিতে যজ্ঞের সময় এই নাট্যকলা অনুষ্ঠিত হয়ে শুভ ও শুভ সূচনা করে তাই আমার ইচ্ছে। এতে আপনার খ্যাতি বিস্তার লাভ করবে। এই কথা শুনে ভরত তাঁর শতপুত্রকে শাপমুক্ত করবার জন্যে এবং নাট্যকলা প্রচারের জন্যে মর্তে প্রেরণ করেন।

পরম পুরুষার্থ—

পরমপুরুষার্থ প্রাপ্তির জন্য নাট্যশাস্ত্র উপযোগী, কিন্তু কিভাবে এর প্রাপ্তি হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, সাধু ও নৃপতিদের চরিত্র রূপায়ণ নিরীক্ষণ করে ধর্মভাবের উদয় হয়। এই ভাবে ধর্মপ্রাপ্তি হয়। তাঁদের চরিত্র অভিনয় করে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চরম সাফল্য লাভ করা যায়। জীবনের এই সাফল্যই হচ্ছে অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন। সঙ্গীতের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে রমনীরা আত্মসমর্পণ করে। একেই বলা হয়েছে কাম। শিব অর্থাৎ সুন্দরকে পুজো করে চরম জ্ঞান লাভ করা যায় এবং এই জ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষ লাভ করা যায়। এর মাধ্যমে সকল রকম জ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি ও কর্ম রূপায়িত হয়। প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রে 'পরম পুরুষার্থের' এই ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

নাট্যের উপযোগিতা—

নাট্যাচার্য ভরত নাট্যের উপযোগিতা সম্বন্ধে বলেছেন দুঃখার্ত, শ্রমার্ত, শোকার্ত ও তপস্বীজনের চিত্তবিনোদনের জন্য এর সৃষ্টি। নাট্য ধর্ম, যশ, আয়ু ও বুদ্ধি বৃদ্ধি করে এবং জনসাধারণকে নানাভাবে উপদেশ দান করে। মুনি ভরত ও নন্দিকেশ্বর উভয়েই বলেছেন যে, নাট্য এবং নৃত্য সর্বদা যদি সম্ভব না হয়, তবে পর্বকালে অবশ্য দর্শনীয়। রাজ্যাভিষেকে, বিবাহে, প্রিয় সঙ্গমে, নগর প্রবেশে, পুত্রজন্ম প্রভৃতি মঙ্গল কাজে অবশ্য করনীয়।

দৃশ্যকাব্য—

নাট্য ও নৃত্যকে দৃশ্যকাব্য বলা হয়েছে। দৃশ্যকাব্য দুই রকম—বাক্যার্থাভিনয় ও পদার্থাভিনয়। নাট্যকে বাক্যার্থাভিনয় বলা হয়েছে। কারণ নাটক বাচিক প্রধান ও রস প্রধান। নৃত্যকে পদার্থাভিনয় বলা হয়েছে। কারণ গীতের পদকে অভিনয়ের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় এবং এটা

ভাবপ্রধান। নাট্যকে অবস্থানুকৃতিও বলা হয়। রসাধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি।

ধর্মী—

মুনি ভরতের মতে অভিনয়ের লক্ষণ দুরকম—লোকধর্মী, নাট্যধর্মী। স্বাভাবিক ভাবযুক্ত, শুদ্ধ, অবিকৃত, সাধারণের জীবিকা ও কার্যকলাপ সংক্রান্ত এবং অঙ্গলীলাবিবর্জিত, স্বাভাবিক অভিনয়যুক্ত, নানারকম স্ত্রী ও পুরুষাশ্রিত যে নাট্য তাই **লোকধর্মী**। নাট্যধর্মী সম্বন্ধে নাট্যাচার্য বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন অতিবাক্য, ও কার্যকলাপযুক্ত, অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন, অতিভাষিত, লীলান্বিত অঙ্গহার যুক্ত অভিনয়, নাট্য লক্ষণযুক্ত, স্বর ও অলঙ্কার যুক্ত, স্বর্গ ও দিব্যপুরুষাশ্রিত যে নাট্য তা **নাট্যধর্মী** বলে কথিত। লোকে প্রসিদ্ধ দ্রব্য যখন মূর্ত হয়ে অভিলাষ যুক্ত হয়ে নাট্যে প্রযুক্ত হয় তখন তা নাট্যধর্মী। নিকটে উক্ত বাক্য পরস্পর না শোনা এবং অনুক্ত বাক্য শোনা নাট্যধর্মী বলে অভিহিত। শৈল, যান, বিমান, চর্ম, কর্ম, আয়ুধ (অস্ত্র), ধ্বজ মূর্তরূপে ব্যবহৃত হলে নাট্যধর্মী হয়। সুন্দর অঙ্গবিন্যাস ও উৎক্ষিপ্ত পদক্ষেপে নৃত্য ও গমন **নাট্যধর্মী** বলে অভিহিত। লোকের সুখ দুঃখ ও নানা কার্যাত্মক স্বভাব আঙ্গিকাভিনয় যুক্ত হলে তা নাট্যধর্মী। নানাবিধিসমাশ্রিত রঙ্গমঞ্চসংক্রান্ত যে কক্ষবিভাগের কথা বলা হল তা নাট্যধর্মী, সকলের সহজভাব, অভিনয়ের প্রয়োজনোদ্ভূত সকল কিছু অঙ্গভঙ্গি, অলঙ্কার নাট্যধর্মী বলে কথিত।

শার্ঙ্গদেবও ধর্মী নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে লোকধর্মীর দুটি ভেদ,-চিত্তবৃত্ত্যর্পিকা ও বাহ্যবস্ত্বনুকারিনী। চিত্তবৃত্ত্যর্পিকা চিত্তবৃত্তিকে প্রকাশ করে; যথা গর্ব, অহঙ্কার, প্রভৃতি বোঝাতে নট শিরে পতাক হস্তের প্রয়োগ করেন। বাহ্যবস্তু অনুকরণ করলে তা বাহ্যবস্ত্বনুকারিনী হয়, যথা—পদ্মকোশ হাতের দ্বারা কমল প্রভৃতির অনুকরণ; নাট্যধর্মী হচ্ছে সৌকুমার্যাত্মিকা, কৈশিকীবৃত্তি আশ্রিত। এতে দুরকম ভেদ আছে—একটিতে বিশুদ্ধ কৈশিকী-বৃত্তি অবলম্বন করতে হবে, অপরটিতে আংশিক লোকবৃত্তির আশ্রয় নিতে হবে। নাট্যধর্মীতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অতিক্রম করে প্রয়োজনানুরূপ ঘটনার কল্পনা করা হয় এবং এতে স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তির বিপরীত রূপায়ণেরও অবকাশ আছে। এতে বিভিন্ন রকমের অঙ্গহারাদির অভিনয়ের প্রাধান্য বিদ্যমান। স্ত্রী ও পুরুষ একে অন্যের ভূমিকায় চরিত্রোচিত কণ্ঠে অভিনয় করতে পারেন।

লোকধর্মী সম্বন্ধে বলা হয়েছে—এই নাট্যে স্থায়ী ও ব্যভিচারী প্রভৃতি ভাবগুলি যথাস্থানে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এতে স্বকল্প ও বিকল্প রূপগুলিও শুদ্ধভাবে প্রযোজ্য। এটি বর্তনাদি অঙ্গহার বিবর্জিত এবং এতে লোকপ্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত বিশুদ্ধভাবে রূপায়িত হয়। এতে স্ত্রী পুরুষ নিজ নিজ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং এতে সঙ্গীতের প্রাচুর্য থাকে। আঙ্গিকাভিনয়ে ধর্মীর-দুই ভেদই প্রদর্শিত হয়। বাচিকাভিনয় হচ্ছে লোকধর্মী। কিন্তু বাচিকাভিনয় যখন রাগবদ্ধ হয়ে আঙ্গিকাভিনয়ে ব্যবহৃত হয় তখন নাট্যধর্মী হয়। আহার্যাভিনয়ে হার, কেয়ূরাদিভূষণ লোকধর্মী। কিন্তু ফুৎকৃত ধ্বজ-যানাদি, ভূষণ হচ্ছে নাট্যধর্মী। সাত্ত্বিকাভিনয়েও নটের দ্বারা প্রদর্শিত স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিকভাব লোকধর্মী। কিন্তু এই সাত্ত্বিকভাবগুলি হস্তাভিনয়ের দ্বারা প্রদর্শিত হলে নাট্যধর্মী হয়।

নাট্যের প্রয়োগে সন্তুষ্ট হয়ে নাট্যকে সম্যক সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে দেবতারা নানা উপকরণ দ্বারা ভরতের পুত্রদের সাহায্য করেন। শক্র দিলেন ধ্বজ, ব্রহ্মা দিলেন কুটিলক (বিদূষকের ব্যবহারের উপযোগী জলপাত্র), সূর্য্য দিলেন ছত্র, শিব দিলেন সিদ্ধি, পবন দিলেন ব্যজন, বিষ্ণু দিলেন সিংহাসন, কুবের দিলেন মুকুট, সরস্বতী দিলেন অভিনয়ের বানী, অবশিষ্ট দেবতারা যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব ও পন্নগরা দিলেন ভাব, রস, রূপ, বল প্রভৃতি।

পূর্বরঙ্গবিধি শ্রবণ করবার পর মুনিরা ভরতকে পাঁচটি প্রশ্ন করেন নাট্যসম্বন্ধে। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে নাট্যবিচক্ষণরা নাট্যে রসের ব্যাখ্যা কি ভাবে করেছেন? ভাব কাকে বলে এবং তাতে কি ভাবায়! সংগ্রহ, কারিকা ও নিরুক্ত কাকে বলে? তাঁদের প্রশ্ন শুনে নাট্যাচার্য ভরত তার উত্তর দিয়েছিলেন এই ভাবে—সূত্র ও ভাষ্যের বিস্তারিত বর্ণনার সংক্ষেপকে **কারিকা** বলা হয়। রস ও ভাব সম্বন্ধে রসাধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। রস, ভাব, অভিনয়, ধর্ম, বৃত্তি, প্রবৃত্তি, সিদ্ধি, স্বর, আতোদ্য, গান ও রঙ্গ হল নাট্যের সংগ্রহ। পূর্ব সিদ্ধান্ত নিষ্পন্ন করতে যে ব্যাখ্যা করা হয়, তাকে **নিরুক্ত** বলা হয়।

বৃত্তি ও প্রবৃত্তি—

ভোজের মতে বৃত্তি, প্রবৃত্তি ও রীতি নিত্যসম্বন্ধী। নাট্যশাস্ত্রানুসারে চার রকম বৃত্তির উল্লেখ আছে—ভারতী সাত্বতী, কৈশিকী ও আরভটী। বৃত্তি বলতে চেষ্টা অথবা ক্রিয়াকে বোঝায়। এই চারটি বৃত্তির ওপর নাট্য প্রতিষ্ঠিত

"চতস্রো বৃত্তয়ো হ্যেতা যাসু নাট্য প্রতিষ্ঠিতম্"। এর মধ্যে ভারতী, সাত্বতী ও আরভটী পুরুষের উপযোগী। নীলকণ্ঠ যখন কৈশিকী বৃত্তির প্রয়োগ করেন তখন নাট্যাচার্য ভরত তা প্রত্যক্ষ করে বুঝেছিলেন যে, এ কেবল মাত্র স্ত্রীলোক-দের পক্ষেই সম্ভব, পুরুষের পক্ষে নয়। নাট্যাচার্য ভরত ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা করলে ব্রহ্মা মন থেকে অপ্সরাদের সৃষ্টি করেন এবং এই অপ্সরারাই কৈশিকী বৃত্তির প্রয়োগ করে। সাহিত্য দর্পণে এই চারটি বৃত্তির প্রসঙ্গে বলা হয়েছে "চতস্রো বৃত্তয়ো হেতা সর্বনাট্যস্য মাতৃকাঃ।" সঙ্গীত রত্নাকরে বৃত্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, ঋগ্বেদ থেকে ভারতী, যজুর্বেদ থেকে সাত্বতী, অথর্ব বেদ থেকে আরভটী ও সামবেদ থেকে কৈশিকীর জন্ম হয়েছে। ভোজ বলেছেন—বৃত্তি হচ্ছে অনুভব। বুদ্ধি থেকে এর জন্ম, চেষ্টা-বিশেষঃ বিন্যাসক্রমঃ। অভিনব গুপ্ত একে বলেছেন—'ব্যাপার' এবং আনন্দবর্ধন বলেছেন 'ব্যবহার'। ভোজ বলেছেন কাজের ধরণ বা প্রবৃত্তি হচ্ছে 'বৃত্তি'। ডঃ রাঘবন ইংরেজীতে এর অনুবাদ করেছেন "Temper and atmosphere of the Situation."

বৃত্তির উৎপত্তি—(নাট্যশাস্ত্রে বৃত্তির সম্বন্ধে এইভাবে ব্যাখ্যা আছে।)

ভারতী—ভগবান বিষ্ণু যখন পৃথিবীকে এক সাগরে পরিণত করে অনন্ত শয্যায় শয়ন করেছিলেন তখন বীর্যও মদে উন্মত্ত হয়ে দুই অসুর মধু ও কৈটভ যুদ্ধ করার জন্য খুব তর্জন করেছিল। তারা নানারকম কর্কশ বাক্য বলতে বলতে দুই বাহু বিমর্দিত করে, মুষ্টি ও জানু দ্বারা অক্ষয় ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। বাক্যের এই প্রয়োগকে শ্রীমধুসূদন 'ভারতী' বৃত্তি বলে অভিহিত করেন। ভারতীবৃত্তি সংস্কৃতবাক্য প্রধান। একে বাগ্‌বৃত্তিও বলা চলতে পারে। বাচিক অভিনয়ের দ্বারা এর ভাব প্রকাশিত হয়। এই বৃত্তি সাধারণতঃ পুরুষদের করনীয়। করুণ ও অদ্ভুত রসে ভারতী হয়।

সাত্বতী—শার্ঙ্গ নামে ধনুর বল্গিত, দীপ্ত স্তোত্র, অসংভ্রান্ত, সত্ত্বর দ্বারা সাত্বতী সৃষ্টি হ'ল। সাত্বতী মনের সত্ত্বভাব প্রকাশক। সুতরাং এটি মনো-ব্যাপার প্রধান। এর দ্বারা শৌর্য, ত্যাগ, দয়া প্রভৃতি প্রকাশ করা যায়। বীর ও অদ্ভুত রসে সাত্বতী বৃত্তি হয়।

কৈশিকী—ভগবানের লীলা থেকে উদ্ভূত বিচিত্র অঙ্গহার সমূহের দ্বারা কে শিখা বেঁধেছিলেন তাতে কৈশিকী বৃত্তির সৃষ্টি হয়েছিল। এই বৃত্তি উল্লাসদীপ্তা

এবং শৃঙ্গারনির্ভরা। যা সৌকুমার্য দ্বারা মণ্ডিত তাই কৈশিকী বৃত্তি। শৃঙ্গারে ও হাস্যে কৈশিকীবৃত্তি হবে।

আরভটী— [১]সংরম্ভ ও আবেগবহুল নানা চারী থেকে উদ্ভূত নিযুদ্ধ করণ থেকে আরভটীর সৃষ্টি হল। আরভটী কায়সম্ভবা অর্থাৎ শরীরের সঙ্গে যুক্ত। মায়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধ আরভটীর অন্তর্ভুক্ত। ভয়ানক, বীভৎস ও রৌদ্রে আরভটী বৃত্তির প্রয়োগ হয়।

দেশভেদে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তির প্রয়োগ ছিল। দাক্ষিণাত্যে শৃঙ্গার রসযুক্ত কৈশিকী বৃত্তির প্রচলন ছিল। পশ্চিমদেশে ধর্মের প্রাধান্য বলে সাত্বতী বৃত্তির প্রয়োগ ছিল। উত্তর ভারতে ভারতী, আরভটী ও সামান্য কৈশিকীরও প্রয়োগ ছিল, পূর্ব ভারতে ভারতীর প্রয়োগ ছিল।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে বৃত্তিহীন কাব্য, গীত, ও নৃত্য শোভা পায় না। নাট্যশাস্ত্রে চার রকম প্রবৃত্তির উল্লেখ আছে, যথা—আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী, ও ঔড্রমাগধী। কিন্তু প্রবৃত্তি কি? মুনি ভরত এর বিশ্লেষণ করেছেন—

"পৃথিব্যাং নানাদেশবেশভাষাচারা বার্তাঃ খ্যাপয়তীতি বৃত্তিঃ প্রবৃত্তিশ্চ-নিবেদনে।" পৃথিবীর নানাদেশের বেশভূষা, ভাষা ও আচার ব্যবহারের বার্তা প্রচার করে বলেই ভারতী প্রভৃতিকে বৃত্তি বলা হয়েছে এবং যে যে দেশে যে যে প্রবৃত্তির প্রয়োগের প্রাধান্য ছিল, প্রবৃত্তিগুলির নামকরণ সেই অনুসারেই হয়েছে। অভিনব গুপ্ত প্রবৃত্তি শব্দের দ্বারা জ্ঞানকে লক্ষ্য করেছেন। তিনি বলেছেন—"নিবেদনে নিঃশেষণে বেদনে জ্ঞানে প্রবৃত্তিশব্দঃ।" ভোজ প্রবৃত্তি ও রীতি সম্বন্ধে এইরকম ব্যাখ্যা করেছেন—প্রবৃত্তি "বেশ বিন্যাস ক্রমঃ" এবং রীতি হচ্ছে—"বচন-বিন্যাস-ক্রমঃ।" সিংহভূপাল প্রবৃত্তি বলতে প্রাদেশিক ভাষা, ক্রিয়া ও বেশ বলেছেন।

সিদ্ধি—

নাট্যাচার্য বলেছেন সকল অভিনয় সিদ্ধির প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত। বাক্য, সত্ত্ব ও অঙ্গ থেকে জাত এবং নানা ভাব ও রসাশ্রিত সিদ্ধি দ্বিবিধ—দৈবিকী ও মানুষী। মানুষী সিদ্ধির দশটি অঙ্গ। দৈবিকী সিদ্ধি তিন রকম।

১) ক্রোধ

অভিনয়—নাট্য ও নৃত্য পরস্পর ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধী। উভয়ই অভিনয়কে আশ্রয় করে। অভিনয়কে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—আঙ্গিক বাচিক আহার্য ও সাত্ত্বিক।

আঙ্গিক—অঙ্গসমূহের দ্বারা নির্দেশিত অভিনয়কে 'আঙ্গিক' অভিনয় বলা হয়।

বাচিক—বাক্যের দ্বারা বিরচিত অভিনয়কে 'বাচিক' অভিনয় বলা হয়।

আহার্য্য—শরীরের অলঙ্করণকে 'আহার্যাভিনয়' বলা হয়।

সাত্ত্বিক—সাত্ত্বিক ভাব দ্বারা নট বিভাবিত হলে তা সাত্ত্বিক অভিনয় হয়।

নৃত্য ও নৃত্ত—নাট্যাচার্য ভরত নৃত্ত ও নৃত্যের ভেতর কোন ভেদ রাখেন নি। কিন্তু পরবর্তী নাট্যশাস্ত্রকাররা নৃত্য ও নৃত্তের ভেতর প্রভেদ করেছেন। তাঁরা নৃত্ত, নৃত্য ও নাট্যকে একত্রে সঙ্গীত বলেছেন।

মার্গ ও দেশী—মার্গ ও দেশীভেদে নৃত্য দুরকম। মার্গ সম্বন্ধে পরবর্তী নাট্যশাস্ত্রকাররা বলেছেন—"নৃত্যবেদিনাং মার্গশব্দেন প্রসিদ্ধমিতি। দ্রুহিণেন যদুদ্দিষ্টং প্রযুক্তং ভরতেন চ। মহাদেবস্য পুরতঃ তন্মার্গাখ্যং বিমুক্তিদম্। যা দ্রুহিণের (ব্রহ্মার) দ্বারা কথিত, ভরত যা মহাদেবের পুরোভাগে প্রয়োগ করেছিলেন, তা মার্গ আখ্যা লাভ করেছে। এই মার্গ নৃত্য মুক্তি দান করে। নাট্য, নৃত্য, নৃত্ত, গীত, বাদ্য প্রভৃতি এর অন্তর্ভুক্ত। সঙ্গীত রত্নাকরে বলা হয়েছে যে, আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক এবং আহার্য এই চারপ্রকার অভিনয়যুক্ত ভাবের অভিব্যঞ্জক নৃত্যই মার্গ নামে অভিহিত হয়। আর চতুর্বিধ অভিনয় বর্জিত সাধারণ গাত্রবিক্ষেপই হচ্ছে নৃত্ত। আর এই নৃত্তকেই 'দেশী' বলা হয়েছে। পরবর্তীকালের সঙ্গীতশাস্ত্রকাররা বলেছেন—

"দেশে দেশে তু সঙ্গীতং তদ্দেশীত্যভিধীয়তে।" যা দেশে দেশে প্রচলিত তাই দেশী সঙ্গীত।

অভিনয় দর্পণে নৃত্যবিধির এই রকম পরিচয় আছে—

"আস্যেন লম্বয়েদ্ গীতং হস্তেনার্থ প্রদর্শয়েৎ।
চক্ষুর্ভ্যাং দর্শয়েদ্ভাবং পাদাভ্যাং তালমাদিশেৎ।"

"যতো হস্তস্ততো দৃষ্টির্যতো দৃষ্টিস্ততো মনঃ।
যতো মনস্ততো ভাবো যতো ভাবস্ততো রসঃ॥"
নৃত্তং বাদ্যানুগং প্রোক্তং বাদ্যং গীতানুবর্তি চ।"

মুখে গান, হাতের দ্বারা অর্থ প্রদর্শন, নয়নের দ্বারা ভাব এবং পদদ্বয়ের দ্বারা তাল দেখাতে হয়। যেখানে হাত সেইখানে দৃষ্টি, যেখানে দৃষ্টি সেখানে মন, যেখানে মন, সেইখানে ভাব এবং যেখানে ভাব সেইখানেই রস। নৃত্ত বাদ্যকে অনুসরণ করে ও বাদ্য গীতের অনুসারী হয়।

নাট্যকে দশটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—নাটক, প্রকরণ, অঙ্ক, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ইহামৃগ, ভাণ, বীথি ও প্রহসন। এ ছাড়া ১৮টি উপরূপক আছে—নাটিকা, প্রেক্ষণ, তোটকবর্ণ, শটক, গোষ্ঠি, সংলাপক, শিল্পক, ভাণ, হল্লীসক, রাসক, উল্লপক, শ্রীগদিতা, প্রস্থান, নাট্যরাসক, প্রেষণ, দুর্মল্লিকা, শাসিকা ও কাব্য। এইসব রূপক ও উপরূপকের আলোচনা করতে গিয়ে নাট্যাচার্য এবং তাঁর পরবর্তী গুনীরা নৃত্য, গীত ও বাদ্যের ব্যাপক আলোচনা করেছেন। কারণ এইগুলির অধিকাংশই নৃত্যগীতসম্বলিত।

কিঞ্চিৎ ধর্মপ্রধান রূপক হলে 'নাটক' হয়। 'প্রকরণ' হচ্ছে ক্রীড়াপ্রধান। সমবকার সৌন্দর্যাত্মক ও এতে কৈশিকীবৃত্তির প্রয়োগ হয়। একটিমাত্র পাত্র যখন অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে নৃসিংহ শূকরাদির বর্ণনা করেন, তখন তাকে 'ভাণ' বলা হয়। এতে তাললয়সমন্বিত দেশীয় ভাষায় গীতের ব্যবহারও আছে। সঙ্গীতমকরন্দ অনুসারে ভাণ একাঙ্ক নাটিকা। এতে একজনমাত্র পাত্র থাকে। এতে কৈশিকীবৃত্তি অবলম্বন করা হয় এবং বীর, শৃঙ্গার, সৌভাগ্য প্রভৃতি সূচিত হয়। শঙ্খ প্রভৃতি বাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উপরূপকের ভেতর নাটিকা, রাসক প্রভৃতিতে নৃত্য থাকে। ১৮টি উপরূপক ছাড়া ডোম্বিকা, ষিদ্গক, ভাণিকা, রাসক্রীড়া প্রভৃতি নৃত্যপ্রধান নাট্যেরও উল্লেখ দেখা যায়। ভোজ ১৮টি উপরূপকের মধ্যে গোষ্ঠী, নর্তনক ও কাব্য প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন যেগুলি নৃত্যপ্রধান। নাটিকার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—"বহুনৃত্যগীতপাঠ্যা-রতি সম্ভোগাত্মিকা চৈব"। নাটিকাতে স্ত্রী চরিত্র বেশী থাকে, চার অঙ্কবিশিষ্ট হয় এবং বহু নৃত্যগীতের সমাবেশ থাকে—"স্ত্রীপ্রায় চতুরঙ্কিকা।" নায়ক ধীরললিত ও নৃপ হবেন। নায়িকা নৃপবংশজ, নবানুরাগা অথবা সংগীতব্যাপৃতা ও নৃত্য পারদর্শিনী হবেন।

রাসক—এতে অনেক নর্তকী অংশ গ্রহণ করেন। রাসক বিভিন্নরকম তাললয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে উর্ধ্বসংখ্যা চৌষট্টি যুগল অংশ গ্রহণ করতে পারেন। সঙ্গীতদামোদরের মতে এটি একাঙ্ক, এতে সূত্রধার নেই। তবে এটি

অনেকার্থবাচক নান্দীযুক্ত এবং এতে কৈশিকী ও ভারতীবৃত্তির যোগ থাকে। সাহিত্য দর্পণে এইরকম বিবরণ আছে—রাসক পঞ্চপাত্র যুক্ত ও ভাষা[1] বিভাষা[2] সংযুক্ত হবে। এতে কৈশিকী ও ভারতী বৃত্তি থাকবে। এটি একাঙ্ক, সূত্রধারহীন ও উৎকৃষ্ট নান্দীযুক্ত। এতে খ্যাত নায়িকা ও মূর্খ নায়ক থাকে। এটি উদাত্ত ভাব সমন্বিত হয় এবং এতে মুখ, প্রতিমুখ ও সন্ধি থাকে।

নাট্যরাসক—এটি একাঙ্ক ও বহু তাললয় সমন্বিত। এতে উদাত্ত নায়ক এবং উপনায়ক থাকবে ও শৃঙ্গার রসাপ্লুত 'বাসক সজ্জিকা' নায়িকা থাকবে। এটি দশরকম লাস্যাঙ্গযুক্ত হবে। এতে শুধুমাত্র সন্ধি নয়, কখনও কখনও প্রতিমুখ থাকবে। ভোজের মতে নাট্যরাসক বসন্তকালে শুধুমাত্র নারীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অঙ্গহারের সাহায্যে পিণ্ডী ও ভেদ্যক রূপায়িত হয়। সমবেতভাবে এই সকল বিভিন্ন অঙ্গহারের সমাবেশে নানা রকম ভঙ্গী প্রদর্শিত হয়। ভোজ নাট্যরাসককে 'চর্চরী' বলেছেন। হর্ষের রত্নাবলীতে বসন্তকালের নৃত্যকে চর্চরী বলা হয়েছে। চর্চরীকে একরকম তাল ও গীতও বলা হয়েছে। ভোজের মতে এতে বাদ্যকররা ছন্দোবদ্ধ অক্ষর ও সঙ্গীত ব্যবহার করেন। এর অন্তে মঙ্গলাচরণ থাকে। কথিত আছে, ক্ষীর সমুদ্রে অমৃত লাভের পর দেবতারা আনন্দে এই রকম নৃত্য করেছিলেন। 'হরবিজয়ে' রাজনক রত্নাকর 'রাসক' অথবা নাট্যরাসককে রাসকঙ্ক বলেছেন। বাৎসায়নের কামসূত্রে হল্লীসক ও নাট্যরাসক সম্বন্ধে বলা হয়েছে—হল্লীসকং ক্রীড়ানকৈঃ গায়নৈর্নাট্যরাসকৈঃ"। অর্থাৎ হল্লীসক ক্রীড়াপ্রধান এবং নাট্য রাসক গীতপ্রধান।

বিলাসিকা—বিলাসিকা দশলাস্যাঙ্গযুক্ত এবং শৃঙ্গারবহুল। এতে বীট, বিদূষক ও পীঠমর্দনের সমাবেশ থাকবে, সন্ধি ও নায়কবর্জিত হবে। বিষয় বস্তু সংক্ষিপ্ত এবং নেপথ্য (বেশরচনা) অতি উত্তম হবে। এটি শৃঙ্গার প্রধান হেতু দর্শকের মনে শৃঙ্গাররসের সৃষ্টি করে বলেই এর নাম 'বিলাসিকা।

হল্লীসক · মণ্ডলাকারে নৃত্যকে 'হল্লীসক' বলা হয়। এতে একজন পুরুষ নর্তক থাকেন এবং অবশিষ্ট সকলেই স্ত্রীলোক। গোপাঙ্গনাদের নিয়ে শ্রীহরি এইরকম নৃত্য করেছিলেন। অলঙ্কার পরিচ্ছেদে ভোজ বলেছেন, দুটি বিশেষ

১। মধ্যমপাত্রের ব্যবহার্য ভাষা—মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী প্রভৃতি

২। হীনপাত্রের ব্যবহার্য ভাষা—চাণ্ডালী, শাবরী প্রভৃতি।

তালে নাচলে 'হল্লীসক' নৃত্য রাস নৃত্যে পরিণত হয়,—"তদিদং হল্লীসকমেব তালবন্ধবিশেষযুক্তং রাসম এবেত্যুচ্যতে।" "সাহিত্য দর্পণে" বলা হয়েছে যে, সপ্তাষ্টাদশ স্ত্রী ও একজন পুরুষ থাকবেন। এটি কৈশিকীবৃত্তি সঙ্কুল ও বহুতাল-লয়-সমন্বিত হবে। মুখান্তে সন্ধি থাকবে। 'শৃঙ্গার প্রকাশ' ও 'নাট্যদর্পণে' একইরকম ব্যাখ্যা আছে। এতে সংস্কৃত অথবা শৌরসেনী ভাষা ব্যবহৃত হবে।

আসারিত—হরিবংশে ও নাট্যশাস্ত্রে 'আসারিত' নৃত্য সম্বন্ধে সামান্য পার্থক্য আছে। হরিবংশে বলা হয়েছে যে প্রথম নর্তকী প্রবেশ। অভিনয় প্রদর্শন, তাল ও ছন্দের অনুযায়ী অঙ্গহার প্রয়োগ এবং পরিশেষে দেবতার স্থানে গিয়ে নৃত্য প্রদর্শন। নাট্যাচার্য ভরত তাণ্ডব লক্ষণে আসারিত নৃত্যের বর্ণনা দিয়েছেন—কুতপবিন্যাসের পর নর্তকী 'আসারিত' নৃত্য করবে। কুতপবিন্যাসের পর উপোহণ শেষ হলে নর্তকী ভাণ্ডবাদ্যের তালে তালে বিশুদ্ধ করণ সহযোগে নৃত্য করবে। এর সঙ্গে যে বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগ হবে তাতে জাতিরাগের বিকাশ থাকবে। বৈশাখ স্থানকে অবস্থিত সর্বরেচককারিনী নর্তকী সঙ্গীতের সঙ্গে চারীর প্রয়োগ করে অঞ্জলিতে ফুল নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করবে। হাত, পা, কটি ও গ্রীবার রেচক প্রদর্শনের পর পুষ্পাঞ্জলি দান করে দেবতাদের প্রণাম করে নৃত্য আরম্ভ করবে। এই সময় গীত বা বাদ্যের সমাবেশ থাকবে না। কিন্তু অঙ্গহার প্রয়োগের অনুযায়ী বাদ্যের প্রয়োগ হবে।

সৌষ্ঠব—ব্যায়ামের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নাট্যাচার্য সৌষ্ঠবের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে যদি কটিদেশ ও কর্ণ সমরেখায় ও কনুই, স্কন্ধ মস্তক সমানভাবে থাকে এবং বক্ষ যদি সমুন্নত হয় তাহ'লে তাকে 'সৌষ্ঠব' বলে। অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুষ্ঠু সমাবেশের নাম সৌষ্ঠব। নৃত্য ও নাট্যে সৌষ্ঠবহীন অঙ্গ শোভা পায় না। উত্তম ও মধ্যম পাত্রদের এই সৌষ্ঠব সম্পাদনের জন্য বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। কারণ নৃত্য ও নাট্য সম্পূর্ণ ভাবে সৌষ্ঠবের ওপর প্রতিষ্ঠিত। অচঞ্চল, অকুব্জ, সন্নগাত্র, অনুত্যচ্চ ও চলপাদ—এইভাবে সৌষ্ঠবাঙ্গ প্রযোজ্য।

রেখা—'রেখা' বলতে কতকগুলি মনোমুগ্ধকর ভঙ্গী অথবা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যথাযথ সন্নিবেশ বোঝায়—"অঙ্গপ্রত্যঙ্গকানাং যঃ সন্নিবেশো যথোচিতঃ। সৈবোক্তা জনতাচিত্তনয়নানন্দদায়িনী ইতি রেখা।" 'সঙ্গীত রত্নাকর' ও 'সঙ্গীত দর্পণে' বলা হয়েছে মস্তক, নেত্র, কর প্রভৃতি অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ সমূহের

জনচিত্তহারী সন্নিবেশেরনাম রেখা। Mirror of Gesture এ অঙ্গ সৌষ্ঠব ও অবয়ব সঙ্গতিকে রেখা বলা হয়েছে।

সন্ন—শার্ঙ্গদেব বলেছেন "সন্ন স্বস্থানবিশ্রান্তং নিষন্নং অচল স্থিতি।" অর্থাৎ স্বস্থানে বিশ্রামরত অবস্থার নাম 'সন্ন' এবং সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চল অবস্থানের নাম 'নিষন্ন'।

কলাস—নৃত্যকালীন সাময়িক বিরতিকে 'কলাস' বলে। এতে বাদ্যকর একই সময় নিজ নিজ বাদ্যযন্ত্রে আঘাত করলে পাত্র চিত্রার্পিতের মত নিশ্চল থাকবে।

চতুরশ্র—নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, বৈষ্ণব স্থানে যদি হাতদুটি যুগপৎ কটি ও নাভি দেশে সঞ্চালিত হয় এবং বক্ষদেশ সমুন্নত থাকে, তা'হলে চতুরশ্র হয়। "কটীনাভিচরৌ হস্তৌ বক্ষশ্চৈব সমুন্নতম। "বৈষ্ণবস্থানমিত্যঙ্গং চতুর-শ্রমুদাহৃতম্॥" নৃত্তহস্তের ভেতর চতুরশ্র মুদ্রার উল্লেখ আছে। চতুরশ্র তালের উল্লেখও পাওয়া যায়।

ভ্রমরী—নাট্যশাস্ত্রে ষোলরকম চারীর মধ্যে একটির নাম 'ভ্রমরী'। সঙ্গীত রত্নাকরে ৩৬ রকম উৎপ্লুতিকরণের মধ্যে ভ্রমরীর উল্লেখ আছে, যেমন বাহ্য ভ্রমরী, অন্তর্ভ্রমরী, ছন্নভ্রমরী, তিরিপভ্রমরী, অলগভ্রমরী, চক্রভ্রমরী, উচিতভ্রমরী, শিরো-ভ্রমরী ও দিগ্‌ভ্রমরী। নাট্যশাস্ত্রে ভ্রমরীর ইঙ্গিত আছে। মতান্তরে ভ্রমরী সমগ্র দেহের ভঙ্গীবিশেষ। পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে যে, সমুদ্র পুত্র জালন্ধর দেবতাদের বিতাড়িত করলে দেবতারা ব্রহ্মার সঙ্গে হরের কাছে উপস্থিত হন। হর তখন প্রত্যেক দেবতাকে নিজ নিজ তেজ বিকিরণ করে অস্ত্র প্রস্তুত করতে বললেন। এই সকল তেজ একত্রীভূত হলে কেউ তাকে ধরে রাখতে পারলেন না। তখন ভগবান শম্ভু হাস্য করে সেই তেজের ওপর বাম পায়ের পার্ষ্ণি (গোড়ালি) দ্বারা ভ্রমরী নৃত্য করতে লাগলেন। তারপর মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা তেজরাশির ওপর শঙ্করকে নৃত্য করতে দেখে বাদ্যধ্বনি করলেন। তখন থেকে নৃত্যের ভেতর ভ্রমরী নৃত্যও স্থান লাভ করল। অভিনয় দর্পণে সাত রকম ভ্রমরীর উল্লেখ আছে—উৎপ্লুতভ্রমরী, চক্রভ্রমরী, গরুড় ভ্রমরী, একপাদ ভ্রমরী, কুঞ্চিত ভ্রমরী ও আকাশভ্রমরী এবং অঙ্গভ্রমরী।

উৎপ্লুতভ্রমরী—উভয়পায়ের দ্বারা সমপাদে অবস্থান করে উৎপ্লবন পূর্বক সমস্ত দেহকে অন্তরালে ভ্রামিত করালে উৎপ্লুতভ্রমরী হয়।

চক্রভ্রমরী—পদদ্বয় ভূমিতে বার বার ঘর্ষণ (ঘসৃটিয়ে) করে দুইহাতে ত্রিপতাক ধারণ করে চক্রবৎ ঘুরলে চক্রভ্রমরী হয়।

গরুড়ভ্রমরী—একটি পা তির্য্যগভাবে প্রসারিত করে (পেছনের) জানু ভূমিতে স্পর্শ করাতে হবে। বাহুদ্বয় সম্যগ্‌ভাবে প্রসারিত করে ভ্রামিত (ঘোরান) করতে হবে।

একপাদ ভ্রমরী—এক পায়ে ভর দিয়ে অপর পাটি ঘোরাতে হবে।

কুঞ্চিত ভ্রমরী—জানুকে কুঞ্চিত করে ভ্রমণ (ঘোরা) করতে হবে।

আকাশ ভ্রমরী—উৎপ্লবন পূর্বক পাদুটি প্রসারিত এবং পরস্পর দূরে স্থাপিত করে সমস্ত অঙ্গকে ভ্রামিত করতে হবে।

অঙ্গ ভ্রমরী—পাদুটি এক বিতস্তি অন্তরে (দূরে) রেখে অঙ্গকে ভ্রামণপূর্বক কেউ যদি স্থিতি আশ্রয় করে, তা'হলে তাকে অঙ্গ ভ্রমরী বলে।

চালক—ষোল রকম বাহুভঙ্গী যদি শোভমান ভঙ্গীতে হয়. তাহলে তাকে 'চালক' বলে।

শুষ্কবাদ্য—নৃত গীতহীন একক বাদ্যই 'শুষ্কবাদ্য' নামে পরিচিত। গীত বা নৃত্যের বিরামের সময় শুষ্কবাদ্যের প্রয়োগ হয়।

ভাণ্ডবাদ্য—পুষ্করবাদ্যে (চর্মজাতীয় বাদ্য-মৃদঙ্গ ইত্যাদি) প্রদেশিনী (তর্জনী) দ্বারা আঘাত করলে ভাণ্ডবাদ্য বলে কথিত হয়। অর্থাৎ মৃদঙ্গকে ভাণ্ডবাদ্য বলা হয়েছে।

তৌর্যত্রয়—গীত, বাদ্য ও নৃত্যের একত্র সমাবেশকে ভাণ্ডবাদ্য বলে।

ত্রিবলীবাদ্য—আমকাঠ সমুদ্ভুত বাদ্য বিশেষ। মঙ্গলবিজয়ে অথবা দেবালয়ে বাজান হয়ে থাকে।

তিরিপ—একরকম ভ্রমরী। তির্যগ্‌ভাবে ঘুরে জঙ্ঘাকে স্বস্তিক করলে তিরিপ হয়।

তাণ্ডব ও লাস্য—নর্তনকে তাণ্ডব ও লাস্য দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রে দেখা যায় যে, মহেশ্বর স্বয়ং তাণ্ডব নৃত্য করে বিশেষ সমাদরের সঙ্গে তণ্ডুকে শিক্ষা দেন এবং গীত ও বাদ্যের সাহায্যে এই নৃত্য প্রবর্ত্তনের আদেশ দেন। মহেশ্বরের প্রিয় অনুচর তণ্ডুকে লক্ষ্য করে এই নৃত্যের প্রবর্ত্তন হয় বলে এর নাম তাণ্ডব—তণ্ডু+ষ্ণ=তাণ্ডব। নাট্যাচার্য ভরত যদিও লাস্য ও তাণ্ডবের প্রয়োগ বিষয়ে নারী পুরুষের অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্ট করে

কিছু বলেন নি, তথাপি দ্বাদশ অধ্যায়ের ২০১ নং শ্লোকে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

"উদ্ধতা যেঽঙ্গহারাঃ স্যুর্যাশ্চার্যো মণ্ডলাণি বা
তানি নাট্যপ্রয়োগজ্ঞৈর্ণ কর্তব্যানি যোষিতাম্।"

নাট্যাচার্য বলেছেন—তণ্ডু কর্তৃক প্রযুক্ত শৃঙ্গার-রস-সম্ভব সুকুমার অঙ্গ-বিক্ষেপের নাম 'তাণ্ডব'। "তথাহি সুকুমার প্রয়োগশ্চ শৃঙ্গাররস সম্ভবঃ।" তস্য তণ্ডুপ্রযুক্তস্য তাণ্ডবস্য বিধিক্রিয়াম (সংপ্রবক্ষ্যামীতিশেষঃ)॥'

নাট্যশাস্ত্রের টিকাকার অভিনব গুপ্ত তাঁর টীকায় বলেছেন—"বর্ধমানক—গীত-তালাভিনয়সম্বন্ধ তয়োদিতং তাণ্ডবং বক্ষ্যতীতি।" পরবর্তী নাট্যশাস্ত্র-কাররা তাণ্ডব ও লাস্যের সুস্পষ্ট ভেদ নির্ণয় করেছেন। অভিনয় দর্পণে বলা হয়েছে—অনন্তর তণ্ডুর কাছ থেকে তাণ্ডবের জ্ঞান লাভ করে মুনিরা মর্ত্যের মানুষদের সেই জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। পার্বতী বানাসুরের দুহিতা উষাকে লাস্য শিক্ষা দেন। সঙ্গীতরত্নাকরে বলা হয়েছে—নৃত্ত তাণ্ডব পর্যায়ভুক্ত এবং নৃত্য লাস্য পর্যায়ভুক্ত। বর্ধমানক, আসারিত প্রভৃতি গীত, প্রাবেশিকী প্রভৃতি ধ্রুবা, তলপুষ্পপুট প্রভৃতি করণ ও স্থিরহস্ত প্রভৃতি অঙ্গহার সমাযুক্ত তণ্ডু কর্তৃক উদ্ধত প্রয়োগের নাম 'তাণ্ডব' এবং সুকুমার প্রয়োগের নাম লাস্য। সঙ্গীত রত্নাকরের মতে তাণ্ডবের তিনটি ভেদ—'বিষম, 'বিকট ও 'লঘু। ঋজু ভ্রমণাদিকে তিনি 'বিকট' বলেছেন। অল্প করণ প্রয়োগকে তিনি 'লঘু বলেছেন।

শারদাতনয় বলেছেন, তাণ্ডবের অঙ্গহার ও করণ উদ্ধত, বৃত্তি হচ্ছে আরভটী। লাস্যের অঙ্গহার কোমল ও সুকুমার। বৃত্তি হচ্ছে 'কৈশিকী'। শারদাতনয়ের মতে মধুর ও উদ্ধত ভেদে লাস্য ও তাণ্ডবের ভেদ নির্ণয় করা হয়েছে। নট ও নর্তকীরা একসঙ্গে রসভাবযুক্ত যে অঙ্গচালনা করেন, যাতে মার্গ (নৃত্য) ও দেশী (নৃত্ত) এই দুটির মিশ্রণ আছে, যাতে অঙ্গহার ও লয়গুলি সুকুমার ভাবযুক্ত, কৈশিকী বৃত্তির ও গীতের যাতে প্রাধান্য আছে তাই লাস্য। তাঁর মতে তাণ্ডব ত্রিবিধ ও লাস্য চার রকম। 'চণ্ড, 'প্রচণ্ড ও 'উচ্চণ্ড হচ্ছে তাণ্ডব এবং 'লতা', পিণ্ডী', 'ভেদ্যক', ও 'শৃঙ্খলক' হচ্ছে লাস্য। সঙ্গীত দামোদরের মতে তাণ্ডব দু রকম—'পেবলি ও 'বহুরূপা। লাস্যও দু রকম—'ছুরিত ও ও 'যৌবত'। পেবলি বলতে অভিনয়শূন্য অঙ্গবিক্ষেপ বোঝায়। বহুরূপে 'উদ্ধত

ভাবের প্রকাশ থাকে। নায়িকার ভেতর ভাবরসের বিকাশকে 'ছুরিত বলা হয়। নর্তক নর্তকীদের লীলাময় মধুর নৃত্য 'যৌবত' বলে অভিহিত হয়। শার্ঙ্গদেবের মতে লাস্য হচ্ছে কামবর্ধক।

পরবর্তী শাস্ত্রকারদের ভেতর অনেকে সাতরকম তাণ্ডবের বর্ণনা করেছেন আনন্দ তাণ্ডব, ত্রিপুর তাণ্ডব, সন্ধ্যাতাণ্ডব, গৌরী তাণ্ডব, কালিকা তাণ্ডব, ঊর্ধ্ব তাণ্ডব ও সংহার তাণ্ডব।

তামিল সঙ্গীত গ্রন্থ 'নটনাদী বাদ্যরঞ্জনম এ বারো রকম তাণ্ডবের উল্লেখ করা হয়েছে। যথা—

আনন্দ তাণ্ডব	থেকে	জেদী নাট্যম (যতি)
সন্ধ্যা তাণ্ডব	থেকে	গীত নাট্যম্
শৃঙ্গার তাণ্ডব	থেকে	ভরত নাট্যম্
ত্রিপুর তাণ্ডব	থেকে	পেরানী নাট্যম্
উর্ধ্ব তাণ্ডব	থেকে	চিত্র নাট্যম্
মুনি তাণ্ডব	থেকে	লয় নাট্যম্
সংহার তাণ্ডব	থেকে	সিম্মালা নাট্যম
উগ্র তাণ্ডব	থেকে	রাজ নাট্যম্
ভুত তাণ্ডব	থেকে	মার্কেণ্ডেয়নাট্যম্
প্রলয় তাণ্ডব	থেকে	পাবৈ নাট্যম্
ভুজঙ্গ তাণ্ডব	থেকে	পিত্ত নাট্যম্
শুদ্ধ তাণ্ডব	থেকে	পাদসার নাট্যম্।

মুনি ভরত দশরকম লাস্যাঙ্গের উল্লেখ করেছেন—যথা—গেয়পদ, স্থিতপাঠ্য, আসীন, পুষ্পগন্ধিকা, প্রচ্ছেদক, ত্রিমূঢ়, সৈন্ধব, দ্বিমূঢ়ক, উত্তমোত্তম, ও উক্ত-প্রত্যুক্ত। উপবিষ্ট হয়ে গীত পরিবেশনকে 'গেয়পদ' বলা হয়েছে। 'স্থিতপাঠে' প্রাকৃতভাষায় আবৃত্তিমূলক গান করতে হবে। চারটি পদে ত্র্যস্র তালে গীত হলে আসীন। পুষ্পগন্ধিকাতে কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের সহযোগিতা থাকবে এবং সুন্দর অঙ্গহারে তা নিষ্পন্ন করতে হবে। 'প্রচ্ছেদকে' নৃত্যই প্রধান থাকে। ত্রিমূঢ়কেও সুন্দর ললিত শব্দযুক্ত গীত থাকবে। এতে অঙ্গহার অথবা বিক্ষেপক থাকবে না। 'সৈন্ধবে' কোন সুচারু অঙ্গহার অথবা রেচক থাকবে না তবে বাদ্যযন্ত্র থাকবে। 'দ্বিমূঢ়'কে চঞ্চৎপুট তালে মুখ প্রতিমুখ

থাকবে। 'উত্তমোত্তমে' হেলার প্রয়োগ হবে। 'উক্তপ্রত্যুক্তে' সুন্দর বাক্যালাপ থাকবে এবং ক্রোধ ও ক্রোধের প্রশমিত রূপ থাকবে।

নাট্যাচার্য ভরত নাট্যে ধ্রুবা গীতির উল্লেখ করেছেন। বিশেষ বিশেষ স্থানে এর প্রয়োগ হত। নৃত্যকালে ক্রমভঙ্গ করে যে নাট্যগীতির পরিবেশন করা হত তাকে 'আক্ষেপিকী' বলা হত। নাট্যাচার্য বর্ধমানক বলতে কলা ও অক্ষরের বৃদ্ধি বলেছেন। এর অর্থই হচ্ছে তালের পরিবর্তন করা। শুদ্ধ পদ্ধতিতে কঠিন বাদ্যপদ্ধতি, দীপ্ত নর্তন, কবিতা প্রভৃতি বর্জনীয়। এতে শুধুমাত্র কোমল অঙ্গাভিনয় প্রযোজ্য।

নর্তকীর গুণাবলী—প্রাচীন নাট্যকাররা নর্তকীর গুণাবলী সম্বন্ধে বলেছেন সুষ্ঠু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পন্না, চৌষট্টি রকম কলাবিদ্যায় নিপুণা, চতুরা, প্রশ্নকুশলা, স্ত্রী দোষ বর্জিতা, প্রগলভা, আলস্যমুক্তা, জিতশ্রমা, নানাশিল্প প্রয়োগকুশলা, নৃত্যগীতবিচক্ষণা, সমাগত নারীদের মধ্যে রূপ, যৌবন ও কান্তিতে অতুলনীয়া যিনি তিনিই নর্তকী। সঙ্গীত রত্নাকরে বলা হয়েছে —নর্তনাধার যিনি তিনি 'পাত্র' বলে অভিহিত হন। এই পাত্র তিনভাগে বিভক্ত—মুগ্ধ, মধ্য ও প্রগ্‌লভ। এতে যৌবনের তিনটি ভাগ বর্ণনা করা হয়েছে। এই যৌবনবতী পাত্ররা কি ধরণের হবে তারও ব্যাখ্যা আছে। সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠযুক্তা, চারুবক্তা, বিশালনেত্রা, বিম্বাধরা, কান্তদন্তা, সুকণ্ঠী, ক্ষীণ-কটি সম্পন্না, স্থূলনিতম্বিনী, লাবণ্যবতী, সুতালরক্ষণে অভিজ্ঞা, গীতবাদ্যবিশারদা এবং রসোচিত গাত্রবিক্ষেপে নিপুনা তিনিই শ্রেষ্টা পাত্রী বা পাত্র। সঙ্গীত রত্নাকরে নট ও নর্তকের একটি সুনির্দ্দিষ্ট সীমারেখা টানা হয়েছে। চারপ্রকার অভিনয়ে যিনি অভিজ্ঞ এবং ভাণাদিভেদের জ্ঞান যাঁর আছে তিনিই 'নট'— "চতুর্ধাঽভিনয়াভিজ্ঞো, নটোভাণাদিভেদবিদ্।" নর্তক সম্বন্ধে বলা হয়েছে "মার্গনৃত্তে কৃতশ্রম ইতি"। যিনি মার্গনৃত্যে অভ্যস্ত, তিনি নর্তক। অভিনয় দর্পণে বলা হয়েছে তন্বী, রূপবতী, শ্যামা, পীনোন্নতপয়োধরা, প্রগল্‌ভা, রসিকা, কমনীয়া, ধরতে ও ছাড়তে নিপুণা, বিশালনয়না, গীত বাদ্যও তালকে বুঝতে সক্ষম, অতি উত্তম মূল্যবান মনোহর বেশভূষায় সজ্জিতা, প্রসন্নমুখপঙ্কজবিশিষ্টা গুণযুক্তা নর্তকী বা পাত্রী বলে উক্ত হয়ে থাকে। নাট্যশাস্ত্রে নিম্নলিখিত গুণগুলি পাত্রের গুণ বলে বলা হয়েছে,—বুদ্ধি, সত্ত্ব, সুন্দর স্বাভাবিক রূপ, লয়তালের জ্ঞান, পরিপূর্ণ যৌবন, কৌতূহল,

গ্রহণ, ধারণ, গান নাট্য প্রভৃতিতে অধিকার, লজ্জা, ভয়, শ্রম, সহিষ্ণুতা ও উৎসাহ।

সভাপতিলক্ষণ—অভিনয় দর্পণে সভাপতি লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—ধীমান, শ্রীমান, বিবেকী, বিতরণে নিপুণ, গানবিদ্যায় প্রবীণ, সর্বজ্ঞ, কীর্তিশালী, সরসগুণ যুক্ত, হাবভাবে অভিজ্ঞ, মাৎসর্য ও দ্বেষহীন, প্রজাহিতরত, সদাচারী, দয়ালু, ধীর, দান্ত, কলাবান ও অভিনয়ে চতুর। ইনি হবেন দর্শকসমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। শুধু তাই নয়, পুরস্কার বিতরণে নিপুণা হলে সভাপতিকে গুনবানও হতে হবে। সুতরাং গুণবান রাজাই সভাপতি হবার যোগ্য হতেন। সঙ্গীত রত্নাকরেও সভাপতির গুণাবলী সম্বন্ধে বলা হয়েছে—শৃঙ্গারী, ভূরিদাতা, মান্য, পাত্রবিবেচক, শ্রীমান, কৌতুকরত, বাগ্মী, নির্মৎসর, নর্মনিপুণ, সুধী, গম্ভীরভাবযুক্ত, সকলকলাকুশল, সমস্তশাস্ত্রবিজ্ঞানসম্পন্ন, কীর্তিলোলুপ, প্রিয়বাদী, পরচিত্তজ্ঞ, মেধাবী, ধারণাশক্তিযুক্ত, তূর্যত্রয়বিশেষজ্ঞ, পারিতোষিকদানবিৎ, সর্ববিধ উপকরণযুক্ত, দেশী ও মার্গের বিভাগ যিনি জানেন, হীন ও অধিক বিবেকনিপুণ, প্রাজ্ঞ, স্বতে, ধীরবুদ্ধি, নিজাধীন, পরিজনসেবিত, ভাবুক রসিক, সত্যবাদী, উচ্চকুলসম্ভূত, সর্বদা প্রসন্নবদন, স্থিরপ্রীতিমান, কৃতজ্ঞ, করুণাবরুণালয়, ধর্মিষ্ঠ, পাপভীরু ও বিদ্বানদের বন্ধু। এতগুলি গুণাবলী থাকলে তবেই তিনি সভাপতি হবার যোগ্য।

সূত্রধার—সূত্রধারের কলা, বিজ্ঞান, দেশ এবং আঞ্চলিক প্রচলিত বেশভূষার জ্ঞান, ভাষা, নাট্যশাস্ত্র এবং কাব্যশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য এবং জ্যোতিষ, ইতিহাস, কানুন ও শরীরবিজ্ঞানে গভীর জ্ঞান থাকা চাই। সূত্রধার হবেন মেধাবী, কুশাগ্রবুদ্ধি, গম্ভীর, স্বাস্থবান, মৃদুস্বভাব, আত্মসংযমী, ক্ষমাশীল, সত্যবাদী, ও পক্ষপাতিত্ব শূন্য। ইনি নাট্যদলের মুখপাত্র। সঙ্গীতদামোদরে আছে—

"নর্তকীয় কথাসূত্রং প্রথমং যেন সূচ্যতে।
রঙ্গভূমিং সমাক্রম্য সূত্রধারঃ স উচ্যতে॥"

অর্থাৎ যিনি রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে প্রথম নর্তকীয় কথাসূত্রকে সূচিত করেন, তিনি 'সূত্রধার'।

গৌণ্ডলী—প্রাচীন নৃত্যপদ্ধতি। এতে কঠিন বাদ্যপ্রবন্ধ থাকবে। এলাদি বর্জিত সালগসূড়ে অবস্থিত গীতে, ধ্রুব প্রবন্ধে, ও কোমল লাস্যাঙ্গে এই নৃত্য

করতে হবে। পাত্র স্বয়ং ত্রিবলীধারণ করে বাদ্য করতে করতে গীত ও নৃত্য করবেন। এইরকম নৃত্যরত পাত্রকে গৌণ্ডলী বলা হয়। নৃত্যগীত বর্জিত হলে যুক গৌণ্ডলী হয়। কর্ণাটদেশে এর জন্ম এবং দেশী পদ্ধতির অন্তর্গত। অন্তে একতালিযুক্ত, সালগস্থূড় ও রূপক ধ্রুবাদি সাতরকম লয়যুক্ত গীতের সঙ্গে নৃত্য সমাপন করলে 'গৌণ্ডলী' হয়।

পেরণী—সঙ্গীতরত্নাকরে পেরণীবিধি সম্বন্ধে বলা হয়েছে—ভস্মপ্রভৃতি শ্বেতচূর্ণ অঙ্গে লেপন করে মুণ্ডিত মস্তকে শিখা ধারণ করে এবং ঘর্ঘরিকা জাল জঙ্ঘায় বেঁধে পদদ্বয়ের দ্বারা পাট বাদ্য করতে করতে যিনি নৃত্য করেন, তাঁকে 'পেরণী' বলে। শিল্পীকে [১]পাঁচঅঙ্গে', তালে, কলাও লয়ের বিষয়বিচক্ষণহতে হয়।

পাত্রের দশটি প্রাণ—

অভিনয় দর্পণে পাত্রের দশটি প্রাণের উল্লেখ করা হয়েছে—জবত্ব (Quickness), স্থিরতা (Firmness), রেখা (Attractivepose,) ভ্রমরী (Easy rotation), দৃষ্টি (Looking), শ্রম (Endurance), প্রীতি (Affability), মেধা (Intelligence), বচ : (Clear enunciation), গীত (Music)।

চতুর দামোদর রচিত সঙ্গীত দর্পণে মধ্যযুগীয় উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় দেশী ও মার্গ নৃত্যের কতকগুলি তথ্য পাওয়া যায়। এইগুলি বর্তমান নৃত্যপদ্ধতির উৎপত্তির বিষয়ে আলোচনা করতে বিশেষ সহায়ক। শুধু তাই নয়, কালের গতিতে এবং যুগের দাবীতে নৃত্যের কি ভাবে রূপ পরিবর্তিত হয়েছে তারও ধারণা করা যায়।

সঙ্গীতদর্পণ ঃ—

মুখচালি—নৃত্যানুষ্ঠানের আদিতে যে নৃত্য হয় তাকে 'মুখচালি' বলা হয়। এতে অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ দুই রকম গীতের প্রয়োজন হয় এবং মঙ্গলার্থ 'গণেশ' শব্দ ব্যবহৃত হয়। পর্দার পেছনে নৃত্যশিল্পী পুষ্পথালি নিয়ে দণ্ডায়মান থাকবেন। পর্দা অপসারিত হলে বাদ্যবৃন্দের সহযোগে দর্শকদের আনন্দ বর্ধন করে নৃত্যশিল্পী রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে পুষ্প নিক্ষেপ করবেন। কেউ পুষ্পের সংখ্যা একুশটি নির্দেশ করেছেন, কারও মতে এর কোন নির্দেশ নেই। একে নৃত্যের উপক্রমণিকা বা মুখচালি বলা হয়।

১। পঞ্চাঙ্গ—ঘর্ঘর, বিষম, ভাবাশ্রয়, কবিবিচার ও গীত।

যতি নৃত্য—বাদ্য জাতীয় শব্দের অক্ষরের ওপর ভিত্তি করে সঙ্গীতের সঙ্গে যে নৃত্য করা হয় তাকে যতি নৃত্য বলে। এই নৃত্য অত্যন্ত কোমল এবং এতে 'চচ্চতপুট' তাল ব্যবহৃত হয়। যতি বাদ্যের অক্ষর এই রকম হয়—তত্তং তত্তথা দাধি কিট কথো তকিট তকিট ধকিট তাথোংগা থোংগা থৈতাতি থৈতাতি থেই থেই থেই তি থেই থেই থা।

শব্দচালি—এই নৃত্য বাদ্যযন্ত্রের অক্ষরের সঙ্গে সমতা রেখে পর্যায় ক্রমে বার বার করা হয়। অর্থাৎ বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাদ্যযন্ত্র বার বার বিরাম দিয়ে বাজাতে হবে। বার্তিকাদি পাঁচটি মার্গে করা হয়।

উড়ুপ নৃত্য—বিভিন্ন ভঙ্গীতে ভ্রমরী ও চালকের সঙ্গে দ্রুত নৃত্যকে উড়ুপ নৃত্য বলা হয়।

নেড়ি নৃত্য—রেখা, মুদ্রা ও প্রমাণ সহকারে নানা কর বিভূষিত হয়ে দিকচক্রাভিমুখে নৃত্যকে 'নেড়ি' নৃত্য বলে। আদি তালে ও বিলম্বিত লয়ে এই নৃত্য করতে হয়।

করণ নেড়ি—করণ সংযুক্ত নৃত্যকে 'করণ নেড়ি' বলে।

নড় নেড়ি—করণ নেড়ি দ্রুতভাবে করা হলে 'নড় নেড়ি' বলে।

ভাব নেড়ি—রসভাবাদিপুষ্ট হলে 'ভাব নেড়ি' হয়।

শুদ্ধ নেড়ি——শুদ্ধ পদ্ধতি এবং পতাকাযুক্ত নৃত্য 'শুদ্ধ নেড়ি' হয়।

শালঙ্গ নেড়ি—সংযুত ও অসংযুত নৃত্তহস্তের মিলনে যে নৃত্য করা হয় তাকে 'শালঙ্গ নেড়ি' বলে।

ভিন্ন—রূপক তালের দ্বারা বারবার চালকা করলে 'ভিন্ন' বলে অভিহিত হয়।

চিত্র—বিচিত্র 'চালকা', 'রেখা' ও 'সৌষ্ঠব' এ শোভিত হয়ে একতালী তালে ও চিত্রতর মার্গে করা হলে তাকে 'চিত্র' বলা হয়।

নত্র—এই নৃত্য ক্রীড়ার তাল অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়। বালকরা খেলবার সময় যেমন চাকার মত ঘোরে, এই নৃত্যও সেইরকম। এতে যতিগুলির সঙ্কোচন ও প্রসারণ হয়।

খুল্ল—'সম' ও ,বিষম' তালে নৃত্য হলে 'খুল্ল' হয়।

জারমান—আদিতালে অনুষ্ঠিত নৃত্যকে 'জারমান' বলে।

মুরু—উৎকট স্থানকে অবস্থান করে তির্যগ্‌ভাবে বার বার ঘুরতে হবে। দুই হাতে ত্রিপতাক মুদ্রা ধারণ করে ক্রীড়াতালের অনুসরণে দুজনে করতে হবে।

উৎকট—মাটিতে চরণদুটি সম্যগ্‌ভাবে স্পর্শ না করে সরলভাবে রাখতে হবে। যোগ, ধ্যান, সন্ধ্যা, জপ ইত্যাদিতে 'উৎকট' ব্যবহৃত হয়।

হুল্ল—এক চরণ উৎক্ষিপ্ত করে বপুকে বার বার দোলাতে হবে। একে 'হুল্ল' বলে। লঘুশেখর তালে অথবা আদিতালে করতে হয়।

লাবণী—উৎঘট্ট তালে কটির ঊর্ধ্বভাগ ঘোরালে 'লাবণী' হয়। সমপাদে ও আদিতালে করা হয় এই নৃত্য। দ্রুতভাবে বাম থেকে ডানদিকে করতে হবে।

কর্তরী—জঙ্ঘা দুটিকে স্বস্তিক করে ভ্রমণ করলে 'কর্তরী' হয়।

তুল্ল—সৌষ্ঠবে অধিষ্ঠিত থেকে 'গজলীল' তালে সকলদিক ঘুরে নৃত্য করলে তাকে 'তুল্ল' বলে।

প্রসর— বাহু দুটি বার বার সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করতে হবে এবং সেই অনুসারে চরণদুটিকেও সেইভাবে চালনা করতে হবে। আদি তালে ও মধ্যম লয়ে এই আঙ্গিকক্রিয়া অনুষ্ঠিত হলে তাকে 'প্রসর' বলে। সুতরাং উড়ুপ নৃত্যে যে বারোটি ভাগ তাকে এইভাবে ভাগ করা যেতে পারে—নেড়ি, ভিন্ন, চিত্র, নত্র, খুল্ল, জারমান, মুরু, হুল্ল, লাবণী, কর্তরী, তুল্ল ও 'প্রসর'। এই নৃত্যগুলির ব্যাখ্যা থেকে নৃত্যের রূপ সম্যগ ভাবে বোঝা না গেলেও একটি ধারণা করা যেতে পারে।

ধ্রুবাড—করণ ও 'তাল' সহযোগে [১]উৎপ্লুতাদি নৃত্য কিংবা দুটি অথবা তিনটি আকাশচারীর মধ্যে [২]তিরিপ এবং অন্তে মুরু নৃত্য হলে তাকে 'ধ্রুবাড' নৃত্য বলা হয়। অথবা দুটি লাগ একটি একপদ ও পরে 'তিরিপ' হলে ধ্রুবাড নৃত্য বলা হয়।

লাগ নৃত্য—কর্ণাটক ভাষায় লাগের অর্থ হচ্ছে উৎপ্লুতি। স্থূলবদ্ধ একপায়ে উল্লম্ফন করবার সঙ্গে সঙ্গেই অনুপতন হলে তাকে কর্ণাটক ভাষায় লাগ্ নৃত্য বলা হয়। 'লগ্' কথাটি সঙ্গীতরত্নাকরে উৎপ্লবনের ভেতর পাওয়া যায়। যথা—অলগ্, কূর্মালগ, অন্তরালগ্ ইত্যাদি।

---

১) উল্লম্ফন ২) তির্যগ্‌ভাবে ঘুরে জঙ্ঘাকে স্বস্তিক করা

রায়রঙ্গাল—যদি দুই পায়ে উল্লম্ফন করে অনুপতন হয়, তাহ'লে 'রায়রঙ্গাল' হয়।

অড়াল—স্থলুবদ্ধ হয়ে উল্লম্ফন করে চরণদুটি পাখীর পাখার মত বিস্তৃত করে ভ্রমণ করতে করতে ভূমিতে পতন হলে তাকে 'অড়াল' নৃত্য বলে।

নিঃশঙ্ক—স্থলুবদ্ধ হয়ে উল্লম্ফন পূর্বক মিলিত চরণে দূরে ভূমিতে পতিত হলে তাকে 'নিঃশঙ্ক বলে।

হুরুমগ্নী—অলাত অঙ্গহার পরিত্যাগ করে একটি পা'কে পেছনের দিকে করে শীঘ্রগতিতে অপর পায়ের দ্বারাও ঐইরকম করলে হুরুময়ী হয়।

লঙ্ঘিকজঙ্ঘিকা—প্রথমে একটি চরণ সম্মুখে প্রসারিত করে অপর চরণ দ্বারা লঙ্ঘন করতে হবে। তারপর স্থলুর ভঙ্গীতে অবস্থান করলে তাকে 'লঙ্ঘিকজঙ্ঘিকা' বলে।

অড়ুস্তর—লঙ্ঘিকজঙ্ঘিকা নৃত্য করবার পর পাদুটি সম্মুখভাগে মিলিত হলে 'অড়ুস্তর' বলা হয়।

ঢেক্কী—পাদুটি সমানভাবে রেখে পায়ের পার্শ্বদেশ দিয়ে একপার্শ্ব থেকে অপর পার্শ্বে উল্লম্ফন করলে তাকে 'ঢেক্কী' বলে।

দিণ্ডু—পাদুটি জড়িয়ে উর্ধ্বে উল্লম্ফন পূর্বক ভূমি স্পর্শ করলে তাকে 'দিণ্ডু' বলে।

বীস—ভূমিতে একটি পা স্থাপন করে দ্বিতীয় পাটিও পূর্ববৎ পার্শ্বদেশ দ্বারা সুন্দরভাবে স্থাপন করলে তাকে 'বীস' বলে।

পক্ষিশার্দূল—যদি মণ্ডলীতে অবস্থিত হয়ে হাত দুটি সম্মুখে প্রসারিত করে ভ্রমন করান হয়, তাহ'লে তাকে 'পক্ষিশার্দূল' বলে।

রুবাড লাগ নৃত্যের অনেকগুলি ভাগ আছে। যথা—রায়ঙ্গাল, নিঃশঙ্ক, হুরুময়ী, লঙ্ঘিকজঙ্ঘিকা, অড়ুস্তর, দিণ্ডু, ঢেক্কী, বীস, পক্ষিশার্দূল ইত্যাদি।

শব্দনৃত্য—অঙ্গহার দ্রুত এবং পাদুটির দ্বারা তৎকার হলে ও বাদ্যাক্ষর রসযুক্ত হলে 'শব্দনৃত্য' হয়। নট যদি অঙ্গ ও লোচনভঙ্গীর দ্বারা ভাব, পায়ের দ্বারা 'শব্দাক্ষরের' তাল ও লয় এবং মুখের দ্বারা 'শব্দাক্ষর উচ্চারণ করেন, তাহলে তাকে শব্দ নৃত্য বলা হয়। চতরস্র করে এক হাতে শিখর মুদ্রা এবং অন্য হাত নাভির ওপর রাখতে হবে। আবার এক হাত বক্ষের ওপর রাখতে হবে এবং অপর হাতে পতাক মুদ্রা করতে হবে। এর পর এক

পা পুরোভাগে রেখে 'সূচী' মুদ্রা করে দ্বিতীয় পাকে অঞ্চিত করতে হবে এবং আয়ত হস্তে তৎকারে সমে আসতে হবে। হাতের দ্বারা শিখর মুদ্রা করে নাভি ও বক্ষের দুইপাশে ও স্কন্ধে রেখে এর সঙ্গে ঘুরে ভ্রমরী করতে হবে। একে শব্দনৃত্য বলা হয়। শব্দ নৃত্যের কয়েকটি ভাগ আছে। যেমন শুড়শব্দ, বিবর্তনা, চমৎকার নৃত্য ইত্যাদি।

বিবর্তনা—অঙ্গ ও উপাঙ্গের সমন্বয় হলে 'বিবর্তনা' নৃত্য হয়।

চমৎকার—অক্ষরের সঙ্গে সমতা রেখে দুহাত মিলিত করে নৃত্য করলে তাকে 'চমৎকার' বলে। এতে অক্ষরের প্রাধান্য থাকে।

গীতিনৃত্য—গীত ও তালকে অনুসরণ করে এবং আদি বর্ণকে সংঘাতের (তাল) দ্বারা দেখিয়ে পাত্রকে সুন্দর ভাবে নৃত্য করতে হবে। গীতের অর্থানুসারে নৃত্য করতে হবে। স্থায়ী প্রভৃতি বর্ণকে অঙ্গের দ্বারা, ভাবকে উপাঙ্গের দ্বারা এবং অর্থকে হাতের দ্বারা প্রকাশ করে ও পায়ের দ্বারা তালের 'গ্রহ' ও 'সম' দেখাতে হবে। গীতিনৃত্যকে কতকগুলি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—স্বরমঠ, সালগসূড়, শুদ্ধসূড়, ধ্রুবগীত, মঠ, রূপক, ঝম্পাতাল, তৃতীয়ক, অড্ডতাল, একতালি ইত্যাদি।

স্বরমঠ নৃত্য—গীতের রাগের ভেতর তিনটি স্বর মুখ্য—[১]গ্রহ, [২]অংশ ও [৩]ন্যাস। এই তিনটি স্বরের সঙ্গে অভিনীত হলে তাকে স্বরমঠ নৃত্য বলে।

সালগসূড়—সপ্তভালে (ধ্রুব, মঠ, রূপক, ঝম্পা, তৃতীয়ক অষ্টতালী ও একতালী) করা হয়। সঙ্গীত রত্নাকরের মতে ধ্রুব, মঠ, প্রতিমঠ, নিসরুক, অড্ডতাল, রাস এবং একতালী, এই সাতটি তালে এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়।

শুদ্ধ সূড়—এলা, করণ, ঢেঙ্কী. বর্তনা, ঝোম্বড়া, লম্ভ, রাস ও এক তালী এই ৮টি বিষয় থাকলে তাকে 'শুদ্ধ সূড়' বলা হয়।

ধ্রুবগীতি—ধ্রুবতালে আরম্ভ করে 'চচ্চৎপুট' তালে শেষ করতে হবে। বেষ্টিতাদি করণের দ্বারা অঙ্গহার পরিবর্তন করতে হবে। দক্ষিণাদিক্রমে সমভাবে উভয়দিকে গতি রেখে সুন্দর হস্তভঙ্গী সহকারে ধ্রুবতালেনাচতে হবে। [৪]উদগ্রাহ ও আভোগের সঙ্গে নৃত্যের শেষে উদ্‌গ্রাহের আদিতে শেষ করতে হবে।

১) গ্রহস্বর—যেখান থেকে গীতের স্বর আরম্ভ হয় ২) অংশস্বর-যে স্বরটির বহুল প্রয়োগ হয়। ৩) ন্যাস-স্বরগীতের সমাপ্তিকে বলা হয় ৪) উদগ্রাহ—গীতের আদিকে বলা হয়। ৫) আভোগ—গীতের অন্তকে বলা হয়। ৬) ন্যাস-সমাপক

ষষ্ঠ নৃত্য—ধ্রুব নৃত্য দুই, তিন অথবা চারবার করতে হবে এবং আভোগ নৃত্য একবার করতে হবে। ধ্রুবের আদিতে বিচিত্র হস্তভঙ্গীর দ্বারা 'ন্যাস' করতে হবে।

রূপক—রূপক তালে উদগ্রাহ ও আভোগ দ্রুত লয়ে গান করলে নৃত্যের ধ্রুবগীতিতে দ্রুতলয় হয়ে থাকে। একে রূপক নৃত্য বলা হয়।

ঝম্পাতাল—ঝম্পাতালের মধ্যমলয়ে গীত চলতে থাকলে যদি সমানভাবে দূরে পদক্ষেপ হয়, ও তালের সপ্তম প্রাণ কলার সঙ্গে করভঙ্গী সহকারে লাস্যাঙ্গ হয়, তাহলে তাকে ঝম্পাতাল নৃত্য বলে। এর অন্তরা কলাযুক্ত হবে।

তৃতীয়ক—তৃতীয় তালে দ্রুতমানে সুন্দর করভঙ্গীর দ্বারা কলাযুক্ত লাস্যাঙ্গে অভিনয় করলে তাকে 'তৃতীয়ক' নৃত্য বলে।

অড্ডতাল—যে নৃত্যে অড্ডতাল তালে বিলম্বিত লয়ে উদগ্রাহাদি গীত হয়ে থাকে, তাকে 'অড্ডতাল' নৃত্য বলা হয়ে থাকে। এতে সুন্দর করভঙ্গীর সঙ্গে ধ্রুবগান হবে।

একতালী—যখন একতালী গীত দ্রুত গাওয়া হয়, তখন মধ্যে মধ্যে 'ভ্রমরী' এবং 'চালকা' প্রযুক্ত হবে এবং গীতকলা আলাপ ও লাস্যাঙ্গযুক্ত হবে। নৃত্যবিদরা একে একতালী নৃত্য বলেছেন। নৃত্যের বিচিত্র রীতি এতে অনুসরণ করতে হবে। এই নৃত্যগুলি শুদ্ধপদ্ধতির অন্তর্গত

সূলু নৃত্য—মন্দ মন্দ বায়ুচালিত কম্পমান দীপশিখার মত দেহ আন্দোলিত হলে তাকে সূলু নৃত্য বলে।

দেশী নৃত্যবিধির অন্তর্গত হচ্ছে চিন্দু, দেশী কট্টরী, বন্ধ নৃত্য, কন্দনৃত্য, কট্টরী, বৈপোতাধ্যম্, পেরণী, গোণ্ডলী ইত্যাদি। চিন্দুনৃত্য দুভাগে বিভক্ত-বিড়চিন্দু ও কালচারী চিন্দু।

কালচারী—উচ্চ ঘর্ঘরী ধ্বনির সঙ্গে তান, তাল, সূলু প্রভৃতির সমন্বয় হলে তাকে 'কালচারী' বলে। তুড়ী বাদ্যের সঙ্গে যতিযুক্ত হয়ে সেই সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত নৃত্য নানা বিচিত্র গতি সম্পন্ন হয়। এতে সঙ্গে সুন্দর পাট বাদ্য ও [1]কিঙ্কিনীধ্বনি থাকবে। মধ্যে মধ্যে কলাযুক্ত লাস্যাঙ্গের প্রয়োগ থাকবে। এই নৃত্য ত্রিশূল হাতে করতে হয়। এই গান দ্রাবিড় ভাষায় উদগ্রাহ ধ্রুবপদে গীত হলে 'চিন্দু' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এই নৃত্য সম্পূর্ণভাবে আভোগবির্জিত হয়।

---

১) কিঙ্কিণী—বীণা বা ঘুঙুর

কট্টরী নৃত্য—তেলেগু ভাষায় একটি যতি সমন্বিত একটি পদ তালহীন-ভাবে আলাপের সঙ্গে নিবদ্ধ করা হলে তাকে পট্টি বলে। কিন্নরী তালে এই নৃত্য করা হয়; এই নৃত্য মৃদঙ্গ অথবা ততবাদ্যযুক্ত হলে 'সূলুপ' হয়। উদ্‌গ্রাহাদিযুক্ত কর্ণাট ভাষায় রচিত পদের সঙ্গে যে কোন তালে এই নৃত্য করলে কট্টরী নৃত্য বলা হয়।

কৈপোতাখ্যম্—চতুষ্টয় রেচক, বিধুত ও কম্পিত শিরোভেদ প্রভৃতির সঙ্গে এই নৃত্য করতে হবে। লাস্য অঙ্গে মুক্ত (আদিতাল) নৃত্য হবে। এই নৃত্যে অন্ধ্র বা কর্ণাটিক ভাষা থাকবে এবং এতে রসদৃষ্টির প্রাধান্য থাকবে।

বন্ধনৃত্য—এই নৃত্যে দুটি থেকে পাঁচটি সুন্দরী-স্ত্রী অংশ গ্রহণ করে। হাত ও পায়ের সঙ্গে করণের প্রয়োগ হলে 'বন্ধ নৃত্য' হয়।

কল্প নৃত্য—যে কোন করণে এবং যে কোন স্থান'কে ন্যাসবিধির প্রয়োগ করতে হবে। একে 'কল্প' নৃত্য বলা হয়। এই নৃত্যে ও গীতে নৃত্যবিদ্‌রা প্রায়ই কল্পতালের প্রাধান্য স্বীকার করে থাকেন।

জক্করী নৃত্য—যবন ভাষাযুক্ত গীতের সঙ্গে গজরা প্রভৃতি বাদ্যে আঁচল ধরে এই নৃত্য করা হয়। এই নৃত্য তিনটি লয় সমন্বিত হয় এবং এতে কোমল অঙ্গহার ও ভ্রমরী প্রভৃতির প্রাধান্য থাকে। এতে ধ্রুব ও ঝম্পা প্রভৃতি তালও থাকে। এই নৃত্য সশব্দ ক্রিয়াযুক্ত ও চেষ্টা বিবর্জিত নৃত্য। পারসিক পণ্ডিতরা নিজ ভাষায় উদগ্রাহাদি সমন্বিত করে একে 'জক্করী' নামে অভিহিত করেছিলেন। এই নৃত্য যবনদের অতি প্রিয়।

কথক

"ফুলের মত সুন্দরী এই
নর্তকীরা ভাগ্যহীনা—
নিঠুর হয়ে তোমরা ওগো
কোয়ো না কেউ এদের ঘৃণা।"

ওমরখৈয়াম্, ৭৪।

কথক

কথক নৃত্য সম্বন্ধে নৃত্যজগতে যথেষ্ট মতভেদ ও তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই নৃত্যের বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য যা আছে তা যথেষ্ট প্রামাণিক বলে মনে করা যায় না। সুতরাং সারা ভারতের ঐতিহাসিক পটভূমিতে সামান্য তথ্য, কিম্বদন্তী ও অনুমানের ওপর নির্ভর করে নিরপেক্ষভাবে কথক নৃত্যের মোটামুটি একটি ইতিহাস রচনায় সচেষ্ট হচ্ছি। কথক নৃত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারকম অনুকূল ও প্রতিকূল আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে যাতে অহেতুক গুণারোপ অথবা দোষারোপ করা হয়েছে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কেউই তার বিচার করতে চান না। কথক নৃত্যের পৃষ্ঠপোষকরা বলেন, এটি প্রাচীন ভারতের একটি প্রাচীন হিন্দু মন্দির নৃত্য। মধ্যযুগে এর মধ্যে চন্দ্রের রাহুর মত সামান্য মাত্র ঐসলামিক প্রভাব পড়ে একে সামান্য বিকৃত করেছিল। এখন আবার ঠিক হয়ে গিয়েছে। বিশ বছর আগে এঁরা এটুকুও স্বীকার করতেন না। অনেকে আবার বলেন এটি পুরোপুরি বৈদেশিক নৃত্য। কিন্তু দুটি মতই সমীচীন বলে মনে হয় না। কারণ এই নৃত্যের আবয়বিক কাঠামো ও ঐতিহাসিক পটভূমিকা আলোচনা করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে এটি মধ্যযুগীয় হিন্দু ও মুসলিম্ সংস্কৃতির মিশ্রণে উদ্ভূত একটি ভারতীয় নৃত্য। আমাদের প্রাচীন নাট্যশাস্ত্র ও ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস এই বিষয়টির ওপর আলোকপাত করতে যথেষ্ট সহায়তা করবে।

কথক ও কথকতার প্রভেদ

কথক সম্প্রদায়ের কথকতা বা কথক নৃত্য এক নয়। অথবা কথকতা থেকেও কথক নৃত্যের উৎপত্তি হয় নি। এই বিষয়ে একটি সমীক্ষা করা যেতে পারে। কথকঠাকুরদের উপজীবিকা ছিল পুরাণের কথা জনসমক্ষে সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রচার করা। একেই কথকতা বলা হয় এবং যাঁরা এই কথকতা করেন তাঁদের কথক ঠাকুর বলা হয়। এঁরা গ্রন্থিক নামেও অভিহিত হতেন। এই প্রথা বহু প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে চলে আসছে। মধ্যযুগে এঁরা 'ভাট,' 'চারণ' ইত্যাদি নামে অভিহিত হতেন। ভাট বা চারণরা গীতিধর্মী কবিতায়

সাহায্যে রাজা ও ধনী সম্প্রদায়ের কীর্তিগাথা প্রচার করতেন। পৌরাণিক যুগেও যে এঁদের অস্তিত্ব ছিল তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণের ভূমিখণ্ডে আছে যে, একবার মুনিরা মহাযশা পৃথুর গুণাবলী বর্ণনা করে সূত ও মাগধকে তাঁর স্তব কাজে নিযুক্ত করলেন। এতে পৃথু প্রসন্ন হয়ে সূত, মাগধ, বন্দি ও চারণদের তৈলঙ্গ ও হৈহয় দেশ দান করলেন। তবে কথকরা শুধুই ভগবানের স্তুতি করতেন। প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্রেও এর উল্লেখ আছে। আলঙ্কারিকরা কথা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

অনেকে মনে করেন কথকতা থেকে কথক নৃত্যের উৎপত্তি হয়েছে। এ সত্য প্রমাণ করা খুবই কঠিন কাজ। কারণ আলোচনা করলে দেখা যায় যে এই দুইয়ের মধ্যে গভীর পার্থক্য আছে। এই বিতর্কে প্রবেশ করার পূর্বে কথকতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। ভোজ ব্যতীত ভামহ, দণ্ডী, বামন রুদ্রত প্রভৃতি লেখকরা কথাকে শ্রব্য কাব্যের মধ্যে গণনা করেছেন। ভামহ কাব্যকে চারভাগে ভাগ করেছেন। চতুর্থভাগে তিনি স্বর্গবন্ধ (মহাকাব্য), অভিনেয়ার্থ (নাটক), আখ্যায়িকা ও কথা সম্বন্ধে বলেছেন। দণ্ডী গদ্য আলোচনায় আখ্যায়িকা ও কথার আলোচনা করেছেন। বামন বলেছেন নাটকের আরও কতকগুলি সাহিত্যিক রূপ আছে, যথা—কথা, আখ্যায়িকা ও মহাকাব্য। রুদ্রত মহাকথা ও খণ্ডকথার মধ্যে বৈষম্য দেখিয়েছেন। মহাকথায় মহাকাব্যের কাহিনী গদ্যাকারে বলা হয় এবং এর মুখবন্ধে ভগবানের ও গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। খণ্ডকথায় অপ্রধান কাহিনী থাকে। রসের ভেতর প্রবাস শৃঙ্গার, করুণ অথবা প্রথম অনুরাগকে অবলম্বন করে এর কাহিনী অগ্রসর হয়। আনন্দবর্ধন পর্যবন্ধ, পরিকথা, খণ্ডকথা, সকলকথা প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। পরিকথা সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত ভাষায় কাহিনী আকারে পরিবেশন করা হয় এবং খণ্ডকথা ও সকল কথা প্রাকৃত ভাষায় পদ্যাকারে বর্ণনা করা হয়। ভোজ আখ্যানের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতে তাকে দৃশ্যকাব্যের পর্যায়ে গণ্য করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন—

> "আখ্যানকসংজ্ঞাং তত্ লভ্যতে যত্তভিনয়ন পঠন্ গায়ন্।
> গ্রন্থিক একঃ কথয়তি গোবিন্দবদবহিতে সদসি"।

আখ্যানে পাঠ্য, গীত, অভিনয় এই রকমই থাকবে। গ্রন্থিক এই তিনের সাহায্যে গোবিন্দের কথা বর্ণনা করবেন। সুতরাং আমরা দেখছি যে সমাজে

কথকতার একটি বিশেষ স্থান ছিল। এই কথকতা সম্বন্ধে আলঙ্কারিকরাও বিশেষ বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন। প্রাচীনকাল থেকে এখনও পর্যন্ত কথকতা চলে আসছে। কালের রথচক্রে এখনও পিষ্ট হয় নি। গ্রন্থিকদের উপজীবিকাই ছিল 'কথকতা'। বংশপরম্পরায় এই কাজই তাঁরা করতেন। সেইজন্ত কথকঠাকুরদের অভিনয় সম্বন্ধে একটি জন্মগত অধিকার ছিল। অনুমান করা হয় এই সম্প্রদায় থেকে কথক নৃত্যের প্রসার হয়েছে বলে এর নাম কথক হয়েছে। অনেকে মনে করেন কথকতার পরবর্তী রূপ হচ্ছে কথক নৃত্য এবং কথকতার সঙ্গে এর বহু সাদৃশ্য আছে। সেইজন্যে একে হিন্দু মন্দির নৃত্য বলা যেতে পারে। কিন্তু এই অভিমতও দ্বিধাহীনভাবে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ কথা সম্বন্ধে আমরা যে বিবরণ পেলাম তার সঙ্গে কথকনৃত্যের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এখন পর্যন্ত আমরা কথকতা যা শুনি তার অধিকাংশই শ্রব্য কাব্যের অন্তর্গত। মধ্যযুগেও বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচারের হাতিয়ার হিসেবে কথকতার প্রচলন ছিল এবং বিশেষভাবে বৈষ্ণব আচার্যরা এর জন্যে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। বৃন্দাবনের ছয়জন গোস্বামীর ভেতর রঘুনাথ ভট্ট সেখানকার প্রধান ভাগবত ছিলেন এবং তাঁর ভাগবতী কথা শ্রবন একটি বিশেষ আনন্দের বিষয় ছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কথকতার ভাষাগত পরিবর্তন ছাড়া আর বিশেষ কোন রূপ বদলায় নি। সুতরাং কথকতার পরিবর্তিত রূপ হিসেবে কথক নৃত্যকে গণ্য করা যায় না, অথবা দুটি যে সমগোত্রীয় তা'ও বলা যায় না।

কথকতার ইতিহাস আলোচনা করে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, এটি প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির একটি বিশেষ শাখা। কিন্তু তাই বলে 'কথক' ঠাকুর ও 'কথক' নৃত্য এক নয়। এর বিচার করতে হলে দুটিরই আবয়বিক ও ঐতিহাসিক পটভূমিকা আলোচনা করতে হয়। প্রথমত কথকতা বাচিক অভিনয় প্রধান। কথকতায় অভিনয়ের স্থান থাকলেও নৃত্যের কোন স্থান নেই। অপরপক্ষে কথক নৃত্য আঙ্গিক প্রাধান, অভিনয় গৌণ, নৃত্য প্রধান এবং বাচিকাভিনয়ের স্থান নেই। তবে বাচিকাভিনয়ের অন্তর্গত বলে ধরে নিলে মুখে বোল বলা এবং ঠুম্‌রী অথবা গজল গানের সঙ্গে 'ভাও বাৎলান' (অভিনয়) করা হয়ে থাকে। গানের সময় শিল্পী বসে স্বয়ং গান গেয়ে অভিনয় করে থাকেন যেটি প্রায় প্রত্যেক ভারতীয় নৃত্যেরই বৈশিষ্ট্য। পূর্বে 'বাঈজী' শ্রেণীর ভেতর এটি বিশেষ ভাবে

প্রচলিত ছিল। অনেক সময় বোলের সাহায্যে দেবতার স্তব বা স্তুতি করা হয়। কিন্তু এর জন্য বাচিকাভিনয় প্রধান হয়ে ওঠে নি।—

সাধারণতঃ কথকতা পক্ষকাল, কখনও কখনও মাসাধিক কাল ধরেও চলে। অর্থাৎ একটি কাহিনী ধারাবাহিক ভাবে সমাপ্ত করতে এই রকমই সময় লেগে যায়। কথক নৃত্য কোন একটি বিশেষ কাহিনীকে অবলম্বন করে ধারাবাহিক ভাবে বর্ণনা করে না। অথবা এর বিষয় বস্তু যে পৌরাণিকই হতে হবে তার বাধ্যতা নেই। তবে অধিকাংশ কাহিনী শৃঙ্গাররসাত্মক রাধাকৃষ্ণের লীলা থেকে নেওয়া হয়। অভিনয় প্রদর্শনের সময় কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার কোন একটি বিশেষ ভাবের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এখানেই কথক নৃত্যের সঙ্গে কথকতার একটি বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কথকনৃত্যের সঙ্গে কথকতার পার্থক্য এইভাবে নির্ণয় করা যেতে পারে—

কথক	কথকতা
আঙ্গিকাভিনয় প্রধান	বাচিকাভিনয় প্রধান
বাচিকাভিনয়ের অভাব	আঙ্গিকাভিনয়ের—অভাব
নৃত্যের (অভিনয়ের) ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ঘটনার আংশিক রূপায়ণ মাত্র	একটি ধারাবাহিক পরিপূর্ণ কাহিনীর বাচিকাভিনয়ের সাহায্যে বর্ণনা

রাসনৃত্যের সঙ্গে কথকনৃত্যের সম্বন্ধ—

রাসনৃত্যকে কথক নৃত্যের জনক বলা হয়। এই কারণে কেউ কেউ কথক নৃত্যের নিষ্কলঙ্ক উৎপত্তির কথা বলে থাকেন। দুটি ক্ষেত্রে তুলনামূলক বিচারের দ্বারা এর সত্যতা নির্ণয় কিছু পরিমাণে সম্ভব হতে পারে। উত্তরভারতের রাসলীলা ও কথকনৃত্যের মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়। উত্তরভারতে অধুনা শাস্ত্রীয় নৃত্য বলতে কথককেই বোঝায়।

উত্তর ভারতে ষোড়শ শতাব্দী ও তার পরবর্তীকালে রাসের ব্যাপক প্রচলন হয়। শুধু উত্তর ভারতে নয়, সমগ্র ভারত খণ্ডের বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক লোক সঙ্গীতের ভিত্তিতে রাসের ব্যাপক প্রচলন হয়। এর পূর্বেও তৃতীয় দশক থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতেও ভক্তি যুগে বৈষ্ণবীয় প্রভাবের প্রাবল্যে বিচ্ছিন্ন ভাবে পূর্ব ভারত ও দক্ষিণভারতে রাসের প্রচলন ছিল। এই সময় সুলতানদের আধিপত্য ছিল। তারপর মোগলরা এসে স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে পূর্বভারতে ও দক্ষিণভারতে গীতগোবিন্দের প্রভাব দেবদাসীদের মধ্যে

প্রবলভাবে ছিল। শুধু তাই নয়, গ্রাম গঞ্জের সঙ্গীত গোষ্ঠীর ওপর ও এর প্রভাব ছিল। এই সব বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত সঙ্গীত গোষ্ঠী থেকে পরবর্তীকালে বংশ পরম্পরায় রামলীলা ও কৃষ্ণলীলা নাট্যসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। কৃষ্ণলীলার অন্তর্গত বলা যেতে পারে রাসলীলাকে।

প্রথমত রাসের প্রকৃত রূপটি আমাদের জানতে হবে। 'হরিবংশ পুরাণ' ও শ্রীমদ্ভাগবতে রাস সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

"রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেণ তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥
শ্রীমদ্ভা।—৩৩।৩

যোগেশ্বর কৃষ্ণ তাঁর অলৌকিক যোগবলে একই সময় বহু কোটি কৃষ্ণরূপ ধারণ করে প্রতি দুই দুই গোপীর মধ্যে আবির্ভূত হন এবং কোটিযুগলে বিভক্ত হয়ে মণ্ডলাকারে অলৌকিক রাস নৃত্য করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রীশুভঙ্কর রচিত সঙ্গীতদামোদরে রাসক ও নাট্যরাসকের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাতে রাসক সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে যে, রাসকে কোন সূত্রধার থাকবে না, কিন্তু উৎকৃষ্ট নান্দীযুক্ত হবে। মুখ্য নায়িকা ও খ্যাত নায়ক থাকবে। কৈশিকী ও ভারতীবৃত্তিযুক্ত, ত্রিসন্ধিক, পঞ্চপাত্র যুক্ত ইত্যাদি হলে রাসক হয়। নাট্যরাসকে বাকসজ্জা নায়িকা ও উদাত্ত নায়ক থাকবে। অবশ্য শুভঙ্করের পূর্বে শারদাতনয় তিনটি রাসকের উল্লেখ করেছেন—দণ্ডরাসক, মণ্ডলরাসক ও নাট্যরাসক। দণ্ডরাসকের বর্ণনা পাওয়া যায়—

পরিভ্রমন্ত্যঃ বিচিত্রবন্ধৈঃ ইমা দ্বিষোড়শনর্তক্যঃ।
খেলন্তি তালানুগতপাদাঃ তবাঙ্গনে দৃশ্যতে দণ্ডরাসঃ।"

এতে বত্রিশজন নর্তকী তালানুসারে পদক্ষেপ করে এবং ভ্রমরী করে বিভিন্ন ভঙ্গী রচনা করবে। দণ্ডরাসকে নর্তকীরা পরস্পর দণ্ডের দ্বারা আঘাত করে। পার্শ্বদেব বলেছেন যুগলে দাঁড়িয়ে পরস্পর দণ্ডের দ্বারা অথবা হাতের তালুর দ্বারা আঘাত করবে। মণ্ডলরাসকে মণ্ডলাকারে ঘুরে রাস করতে হয়। গুজরাট, বাংলা, উড়িষ্যা, রাজস্থান প্রভৃতি জায়গায় রাসের প্রচলন ছিল।

সুতরাং একটি বিষয় আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, বহু প্রাচীনকাল থেকে রাসের প্রচলন হয়ে আসছে। তবে আমরা আজকাল 'রাস' বলতে যা বুঝি তার থেকে এর যথেষ্ট প্রভেদ রয়েছে। কারণ কালভেদে এবং দেশের বৃত্তি ও

প্রবৃত্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে। তবুও ভারতের প্রায় সব প্রান্তের রাসের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে 'রাস' হচ্ছে সমবেত নৃত্য। এমন কি মধ্যযুগে মুসলমান শাসনের সময়ও রাসের প্রচলন ছিল।

উত্তর ভারতে ঐস্লামিক রাজ্য স্থাপনের সঙ্গেই সঙ্গেই হিন্দু সাংস্কৃতিক প্রভাব কমে যায়। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে মহাপ্রভুর প্রেমের বন্যায় উত্তর ভারত প্লাবিত হলে রাসের ব্যাপক প্রচলন হয়। দীর্ঘদিন মন্দিরের সঙ্গীত বন্ধ থাকবার পর আবার ধ্বনিত হয়। মন্দিরে মন্দিরে, নাটমণ্ডপেও রাস অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এর প্রমাণও পাওয়া যায়। ফাগুসনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, চন্দস থেকে দু মাইল পূর্বে অবস্থিত 'ধমনর' নামে এক জায়গায় একটি ছোট গ্রামে পাহাড়ের ওপর দুটি স্তম্ভ আছে। এই দুটি স্তম্ভকে 'রাসমন্দির' বলা হয়। এই স্তম্ভে লেখা আছে—'রামজীনা রাস করায়া। ফাল্গুন মাসে নাগানন্দ রামজী এই রাস করিয়েছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যে সুদূর রাজস্থানে যেখানে হিন্দু রাজা ও মুসলমান সম্রাটদের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ হত সেখানেও এই রাসের প্রবর্তন হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে লক্ষ্ণৌ ও রাজস্থান কথক নৃত্যের পীঠস্থান হয়েছিল। রাসের থেকে কথকনৃত্যের জন্ম হয়েছিল অথবা রাসের মধ্যে কথকনৃত্যের অনুপ্রবেশ ঘটেছে কি না এ কথা বলা খুবই কঠিন কাজ।

'রাস' উত্তরভারতের স্থানীয় সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সুরুকরে আজ পর্যন্ত 'রাসকে' আশ্রয় করে সঙ্গীতনৃত্যবহুল যে নাট্যগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে তার প্রধান ভাষা হচ্ছে ব্রজ ভাষা, ব্রজবুলি, অবধী ও হিন্দী। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মার্গ ও দেশীর একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছিল তার প্রমাণ ও আমরা সেই সময় রচিত সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রগুলিতে পাই। সুতরাং রাস যে তৎকালীন দেশী নৃত্যকে অবলম্বন করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। তবে রাস যে ধর্মনির্বিশেষে সকলের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ১৩০০ শতাব্দীতে একজন উদার মুসলমান দ্বারা অপভ্রংশ মিশ্রিত পশ্চিমী রাজস্থানী ভাষায় 'রাস' নাটক লিখিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে এতে অপভ্রংশ লুপ্ত হয়ে জনসাধারণের রাজস্থানী ভাষা প্রবেশ করে। অনেকে আবার সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, আভীর জাতির সামূহিক নৃত্যকে ভ্রমবশত লাস্তরাস সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। রাজস্থানের

আভীর ও গোপজাতির প্রচলিত প্রেমোপাখ্যানের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকতে পারে এবং সেই জন্যেই হয়তো এরকম ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং রাসের নৃত্যাংশে কথক নৃত্যের অনুপ্রবেশও বিচিত্র নয়। এবং কথকনৃত্যেও রাসের প্রভাব খুবই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ কথকনৃত্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা একটি বিশেষ স্থান পেয়েছে।

কথকনৃত্যের উৎস, ইতিহাস কি করে উভয় সংস্কৃতির মিশ্রণ হল—

কথকনৃত্যের উৎস ও ইতিহাসকে জানতে হলে আমাদের একটু প্রাচীন ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে।

ভারতে যখন বিভিন্ন ধর্মের পরস্পর সংঘাতের ফলে ধর্মবিপ্লব দেখা দিল, সেই সময় ৭১২ খৃষ্টাব্দে আরবরা সিন্ধু আক্রমণ করে প্রথম ঐস্লামিক অভিযানের সূচনা করেন। এই সময় ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতি উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল। মুসলমানদের এই অভিযান হিন্দু সংস্কৃতির ওপর কোন আঘাত দিতে পারে নি; বরং তাঁরাই হিন্দু সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। এমন কি তাঁরা বাগদাদে হিন্দু পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করে সংস্কৃত সাহিত্য, জ্যোতিষ, দর্শন, রসায়ন প্রভৃতি বহুরকম শাস্ত্র আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়ে নিয়েছিলেন। হ্যাভেল বলেছেন—ইস্লামের শৈশব অবস্থায় ভারতই মুসলমানদের দর্শন, ধর্মের আদর্শ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও স্থাপত্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন। যাই হোক, এই অভিযানকে ষ্ট্যানলি লেনপোল বলেছেন—"A triumph without result."

আরবদের পর তুর্কীদের ভারত আক্রমণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ মামুদ মথুরা, বৃন্দাবন, গোয়ালিয়র জয় করে হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেন এবং হিন্দুদের ওপর অত্যাচার সুরু করেন। অলকোয়ামিনের বিবরনীতে আছে যে, এই সময় সোমনাথের মন্দিরে পাঁচশো দেবদাসী নৃত্য করত। মামুদ সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন করেন এবং অনেক দেবদাসীকে ক্রীতদাসী করে নিয়ে যান। উত্তরভারতে হিন্দু সংস্কৃতির বিকৃতি ঘটবার এই প্রথম সূচনা। এরপর উত্তরভারতে ১২০৬ থেকে ১২৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তুর্কীদাসরা রাজত্ব করেন।

তুর্কীরা শিল্পকলায় ভারতীয় শিল্পীদের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। বিশেষ করে স্থাপত্যশিল্পে এঁদের হিন্দু শিল্পীদের শরণাপন্ন হতে হত। এই সব হিন্দু শিল্পীরা নিজেদের কল্পনানুযায়ী বাড়ীঘর নির্মাণ করত।

সেইজন্তে তুর্কীরাজত্বের সময় স্থাপত্যে হিন্দুপ্রভাব দেখা যায়। সেই সময় পর্যন্ত হিন্দু সংস্কৃতি, শিল্প ও ললিতকলা স্ব মহিমায় চলবার চেষ্টা করছিল। তুর্কীজয়ের পর কয়েক শতাব্দি ধরে হিন্দুর বহুমুখী প্রতিভা ও সভ্যতার গতি ভীষণভাবে বাধা পায়। উত্তরভারতে দেবদাসী প্রথা বিলুপ্ত হতে চলেছিল। তার পরিবর্তে বিভিন্ন দেশ থেকে অপহৃত, ধর্মচ্যুত রূপসী নর্তকীর দল রাজ অন্তঃপুরে স্থান পেতে লাগল। তারাই সুলতানের এবং রাজামহারাজদের মনোরঞ্জনের জন্ত নৃত্য গীতের চর্চা করত। এইভাবে বিভিন্ন শক্তির আক্রমণে পর্যুদস্ত উত্তরভারতে আচার, ব্যবহার, সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে ধীরে ধীরে একটি বিরাট পরিবর্তন আসছিল।

এরপর মোগলদের ভারত আক্রমনে এই পরিবর্তন আরও তীব্রতর হয়ে ওঠে। হিন্দুদের পীড়ন করে এবং সম্পূর্ণভাবে তাঁদের দমন করে মোগলরা তাঁদের প্রভাব সাহিত্যে, শিল্পে. অর্থনীতিতে ও সামাজিকতায় এইভাবে রেখে গিয়েছেন যে, সমগ্র উত্তরভারতে তার প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

আকবরের সময় শিল্পকলার বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। শিল্পকলার ভেতর চিত্রকলা ও সঙ্গীতের বিশেষ উন্নতি হয়। কারণ ঐ দুটি কলা নিত্যসম্বন্ধী এবং সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রধান উপকরণ। নবাবদের দরবারে এই দুটি শিল্পকলার বিশেষ সমাদর ছিল। এর ফলে বহিরাগত সংস্কৃতিকে অস্বীকার না করে বরং তার সঙ্গে মিশে একটি নতুন সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছিল যা শিল্পজগতে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছিল, একটি নতুন জাগরণ এনেছিল—

"The origin, nature and development of Mughal painting is similar to Mughal architecture. It is a combination of many elements. The chinese art which was influenced by the Buddhist Indian art, iranian and Hellence art and Mongolian art, was introduced into Iran in the 13th century and it continned to flourish up to the 16th century. This art was carried by the Mughals into India from persia. In the time of Akbar it was completely absorbed by the Indian art,"

যদিও বহিরাগত শিল্পের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের মিশ্রণ হয়েছিল, তবুও

একটি বিষয় লক্ষ্য করবার মত যে, সকলেই ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এমন কি পারস্যও ভারতের স্পর্শ কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

পারস্যের অন্তর্গত 'ইরাণ' নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বহু প্রাচীনকাল থেকেই ইরাণের সঙ্গে ভারতের একটি যোগসূত্র রয়েছে। ইরাণ দেশের অধিবাসিদের 'ঐরাণ' বলা হয়। ইরার গর্ভে পুরুরবার জন্ম হয় এবং উত্তরপুরুষরা 'ঐর' নামে পরিচিত হয়। তাদের বাসস্থানের নামকরণ হল 'ঐরাণ' অথবা 'ইরাণ'। এরা ক্রীয়াহীনহেতু ভারত থেকে নির্বাসিত হয়েছিল। মনুর দশম অধ্যায়ে এর উল্লেখ আছে। সুতরাং পারস্য সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির একটি স্বভাবজাত ঐক্য রয়েছে। সেইজন্যে সংস্কৃতির বিনিময়ে দুই দেশের মিলন আরও সুগম হয়েছিল।

১২৩০ খৃষ্টাব্দে পারস্যরাজ শাহ শিল্পকলাকে ভীষণভাবে ঘৃণা করতে লাগলেন। তাঁর রোষবহ্নি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে আব্বাল সামাদ এবং মীর সামাদ নামে দুজন চিত্রকর এবং অন্যান্য শিল্পীরা ভারতে এসে দিল্লীর বাদশাহ হুমায়ুনের আশ্রয় লাভ করেন। এ ছাড়া চার শ্রেণীর নর্তকীরও আবির্ভাব হয়েছিল—লোলোনীস, ডোমনীস, হর্কিনীস ও হেন্‌সিনীস। সুতরাং এই দুই দেশের নৃত্যকলার মিশ্রণ হওয়া অতি স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী ছিল। এ ছাড়া আরও নানাজাতি এসে রাজত্ব করেছে। সুতরাং উত্তরভারতে এক নতুন মিশ্রিত সংস্কৃতির সূচনা হল। মোগল বাদশাহদের অত্যন্ত সঙ্গীত প্রিয়তার জন্যেও এই মিশ্রণ সম্ভব হয়েছিল। পারস্য কবিতার উদ্ধৃতি, সুন্দর গীত রচনা ও সঙ্গীত শ্রবণ বাদশাহদের বিশেষ প্রিয় ছিল। কথক নৃত্যেও এইরকম বহু ফার্সী ও উর্দু ভাষার প্রয়োগ আছে। হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান বিশেষ সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। বহু হিন্দু ও মুসলমান গুণী, জ্ঞানী ও শিল্পী এঁদের সভা অলঙ্কৃত করে থাকতেন। এঁদের রঙমহলে নৃত্যপটীয়সীদের বিশেষ সমাদর ছিল। বাদশাহের রঙ্‌-মহলের এইসব নৃত্যপটীয়সীদের অনেকেই বংশপরম্পরায় পরবর্তীকালের কথক নৃত্যের ধারক ও বাহক ছিলেন। বিভিন্ন দেশ থেকে এদের সংগ্রহ করা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে নানাদেশীয় এবং নানাধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁরা নিজ নিজ প্রথায় নৃত্য সঙ্গীত ইত্যাদি পরিবেশন করতেন। শ্রীবিনয় ঘোষ রচিত 'বাদশাহী আমল' গ্রন্থটিতে বার্নিয়েরের উদ্ধৃতিতে এ বিষয়ে আলোকপাত

করা হয়েছে—"তিনি তাঁর হারেমের বাইরের যে নর্তকীদের নিয়ে আসতেন নাচগানের জন্ত, তাদের কাঞ্চন বলত। কাঞ্চন বর্ণ রূপসী যুবতী মেয়ের দল। আমীর, ওমরাহ ও মনসবদারদের বিবাহোৎসবে এরা নাচগান করার জন্ত আমন্ত্রিত হত। নৃত্যগীত কলায় রীতিমত পারদর্শী। যেমন নাচিয়ে তেমনি গাইয়ে। তাল মাত্রাজ্ঞানও চমৎকার। কণ্ঠের মিষ্টতাও অতুলনীয়। এই সকল কাঞ্চনবালাদের মধ্যে হিন্দু নারীও থাকতেন। তাঁরা কি জাতীয় নৃত্য প্রদর্শন করতেন তার কোন উল্লেখ নেই। এইভাবে দেখা যায় সমগ্র উত্তর-ভারতে ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তন স্থরু হয়েছিল। এই মিশ্রণ শুধুই সঙ্গীতেই হয় নি—"In our dress, speech, etiquette, thought, literature, music, painting and architecture, we find the Mughal influence (Muslim rule in India.)

উত্তরভারতে বিশুদ্ধ হিন্দু সভ্যতা রূপান্তরিত হয়ে একটি নব সভ্যতার স্মৃষ্টি করল, যা কোন হিন্দু সভ্যতা বা ঐসলামিক সভ্যতা নয়, তা জাতি-ধর্ম-নিরপেক্ষ ভারতীয় সভ্যতা। মধ্যযুগের ভারতীয় স্থাপত্য, চিত্র ও সঙ্গীতকলা হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ে উদ্ভুত বলে একে ঐসলামিক সংস্কৃতি বলা চলে না। ঐসলামিক সংস্কৃতি বলতে তুর্কী, আরব প্রভৃতি বোঝায়, যা ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ভারত কোনদিন কাউকে ফিরিয়ে দেয় নি। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—

"হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন
শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হ'ল লীন।

কথক নৃত্যের স্মারকচিহ্ন—

এর আগে আলোচনা করেছি যে 'কথক নৃত্য' নামকরণ সাম্প্রতিক কালে হয়েছে। বহু পূর্বে এর কি নাম ছিল সঠিক জানা যায় না। তবে এই ধরণের নৃত্য যে প্রচলিত ছিল স্মারক হিসেবে আমরা তার উল্লেখ করতে পারি। প্রথমতঃ বার্নিয়েরর উক্তিতে এই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তিনি বলেছেন—যেমন নাচিয়ে তেমনি গাইয়ে। তাল ও মাত্রাজ্ঞানও চমৎকার। স্থতরাং এ কথা প্রমাণিত হচ্ছে যে এই নৃত্য তালাশ্রিত ছিল। মোগল আমলে অঙ্কিত চিত্রগুলিতে 'নাচওয়ালী' বলে অভিহিত নর্তকীর নৃত্য-ভঙ্গিমা পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে অঙ্কিত ও প্রাপ্ত কাঙড়া ও মোগল

মিনিয়েচারে এইরকম বহু ভঙ্গি পাওয়া যায়। তাতে কথকনৃত্যের বেশভূষা ও ভঙ্গী দেখতে পাওয়া যায়। এই সব চিত্রে তবলাবাদকদের কোমরে তবলা বেঁধে দাঁড়িয়ে নৃত্যের সঙ্গে তবলা বাজাতে দেখা যায়। সারেঙ্গীও কোমরে বেঁধে দাঁড়িয়ে বাজান হত। নৃত্যভঙ্গীমার যে সব চিত্র দেখা যায় সেগুলির সঙ্গে কথক নৃত্যের অনেক সাদৃশ্য আছে।

রাজস্থানে এক শ্রেণীর নর্তকীকে 'ভগতন' ও 'পাতুর' বলা হয়। কথিত আছে যে, পাতুরদের পূর্বপুরুষরা গতলোত রাজপুত ছিলেন। দিল্লীর বাদশাহ চিতোর অধিকার করলে এঁদের মধ্যে একটি শাখা 'পুডবাতে' অপর শাখা জয়সলমীরে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। দারিদ্র্যের কশাঘাতে মেয়েরা ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হন। 'ভগতনরাও' নর্তকী শ্রেণীভুক্ত। মাড়বারে এঁদের বাস। যোধপুরের মহারাজা বিজয়সিংহের সময় এঁদের উৎপত্তি হয়। কথিত আছে যে, 'রামাবত' সাধুদের কন্যারা চরিত্রহীনা হয়ে সাধুসমাজের দ্বারা পরিত্যক্ত হন। পরে এঁরা রূপোপজীবিনী হতে বাধ্য হন। এঁদের নৃত্যের সঙ্গে কথক নৃত্যের সাদৃশ্য কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে রাজস্থানে লোকনৃত্যের মধ্যে ভ্রমরীর প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়। "ঘুমর" রাজস্থানের বিশেষ প্রিয় লোকনৃত্য যার মধ্যে ঘূর্ণন একটি বিশেষ স্থান নিয়েছে। কথকনৃত্যেও ঘূর্ণন একটি বৈশিষ্ট্য। এছাড়া রাজস্থানে এক শ্রেণীর গায়ক আছেন, এঁদের মিরাশী বলা হয়।

কথকনৃত্যের নামকরণ—

কথক নৃত্যের নামকরণ বেশীদিন হয়নি। তবে এই নামকরণ নিয়ে বহু বিবাদ ও মারামারি হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, এলাহাবাদের অন্তর্গত হণ্ডিয়া তহশীল গ্রামের কথক ঠাকুররা এই নৃত্য উদ্ধার করেছিলেন বলে এর নাম 'কথক'। আবার কেউ কেউ বলেন যে এর নাম ছিল 'অরথা' নৃত্য। এই মতাবলম্বীরা বলেন, অরথানিবাসী বিষ্ণুপাল এই নৃত্যের আবিষ্কারক এবং তাঁর নামানুসারে এর নাম 'অরথা' নৃত্য হয়েছে। কিন্তু কথকঠাকুররা অনেক বিবাদের পর এর নাম রেখেছেন 'কথক'। কথিত আছে যে, ঈশ্বর-প্রসাদজী 'কথক নৃত্যের নাম রেখেছিলেন 'নটবরী' কথক নৃত্য। নটবরী নামের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পায় যে, তিনি কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। কথিত আছে যে, নটবর শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্ন দিয়েছিলেন বলেই তিনি এই নৃত্যের সংস্কার করেন এবং

নটবরী নাম রাখেন। নামকরণ নিয়ে দুই দলের মধ্যে প্রচণ্ড বিবাদ উপস্থিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে 'কথক নামকরণই স্থির হয়। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, আমরা কথক নৃত্য বলে এখন যার পরিচয় জানি, পূর্বে তার কি নাম ছিল বা কি রূপ ছিল তার স্পষ্ট কোন ধারণা পাওয়া যায় না।

কথক নৃত্যে ঐস্লামিক প্রভাব এবং দুটি বিরুদ্ধ সংস্কৃতির সমাবেশ—

দুটি ধর্মের প্রভাবের ফলে কথক নৃত্যে আবয়বিক ভঙ্গীতেও দুটি ধর্মীয় রীতি অনুসৃত হয়। কথক নৃত্যের প্রথমেই হিন্দুদের প্রবর্তিত প্রণামী টুকরা ও মুসলমান প্রবর্তিত সেলামী টুকরার প্রয়োগ দেখা যায়। বাদশাহ বা আমীর ওমরাহদের সামনে নৃত্য আরম্ভ করবার পূর্বে আজানুনত হয়ে সম্রাটকে অভি-বাদন করা হত। শিল্পীরা যে সব টুকরা দিয়ে এই নৃত্যের সূচনা করতেন তাকে সেলামী টুকরা বলা হয়। কিন্তু হিন্দু শিল্পীরা রাজামহারাজদের সামনে নৃত্যের সূচনা করতেন প্রণামী টুকরা দিয়ে। হিন্দু নাট্যশাস্ত্রানুযায়ী নাট্য আরম্ভের পূর্বে দেবতাদের স্তুতি, প্রণাম ও পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করবার রীতি আছে। এই প্রথা অনুযায়ী প্রণামী টুকরার ব্যবহার হয়ে থাকে। এই প্রণামী টুকরার দ্বারা রঙ্গদেবতা ও সমাগত দর্শকমণ্ডলীকে প্রণাম ও অভিবাদন করা হয়। এই নৃত্যে যেমন 'পনঘট', 'ছেড়ছাড়', 'গোবর্ধন ধারণ', 'কালিয়মর্দন', 'হোরী', কৃষ্ণ ও রাধা গত্ আছে, সেইরকম বহু উর্দু বা ফার্সী কথারও ব্যবহার আছে। ওয়াজিদ আলি শাহর 'সৌত অল মুবারক' গ্রন্থে বহু রকম গতের উল্লেখ আছে—পরী, সালামী, ফরিয়াদ, শুক্র, মেহবুব, নাজ, গমজা, সাইকা, দো দোস্তি, মউআদ্দন ইত্যাদি। 'মদল-উল-মুসিকিতে ২১টি গতের উল্লেখ আছে।

ওয়াজিদ আলীর সময় দুটি সংস্কৃতির মিলন আরও সুগম হয়ে উঠেছিল। তাঁর সময় হিন্দী নাট্যসাহিত্যে এবং রঙ্গমঞ্চে ইন্দরসভা নাটিকাটির যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এই নৃত্যগীতবহুল নাটকটি কেশরবাগ রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত হত। কথিত আছে যে, স্বয়ং বাদশাহ এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বাদশাহর সভাকবি 'অমানত' এর রচয়িতা ছিলেন। অনেকে এ কথা অস্বীকার করেন। ইন্দরসভাতে হিন্দু ও মুসলিম তথ্যের অপূর্ব সংমিশ্রন হয়েছিল। একদিকে ইন্দ্র, ইন্দ্রসভা প্রভৃতি রয়েছে অপরপক্ষে শাহজাদা, পরী, হুর প্রভৃতির কথাও

রয়েছে। গানের ভেতরও হিন্দু দেবতাদের কথা রয়েছে—'কাহা কো সমঝাত না কোই।' এরই ভেতর মুসলমান শাহজাদার উল্লেখও আছে—'কাঁহা হ্যায় শুঁইয়া শাহজাদা জানী প্যারা'। ভাষার ভেতরও লক্ষ্ণৌর উর্দু, অবধী, ব্রজভাষা প্রভৃতির প্রয়োগ আছে। এর বিষয়বস্তু কিছু ভারতীয় কিছু ফার্সী তথ্য থেকে নেওয়া হয়েছে। যাই হোক, ইন্দর সভায় বাদশাহ কোন-দিন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি। 'হমারী-নাট্য পরম্পরা, নামক গ্রন্থে এই তথ্যগুলি পাওয়া যায়।

অমানত ইন্দরসভা রচনার প্রেরণা পান 'রামলীলা' থেকে। প্রমাণস্বরূপ বলা যেতে পারে, তিনি এতে রহস শব্দটির প্রয়োগ করেছিলেন। রাসের অপ-ভ্রংশ হচ্ছে 'রহস। ওয়াজিদ আলি শাহও রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক নৃত্য গীত বহুল কতকগুলি নাটিকা রচনা করেন। এগুলিকে 'রহস' বলা হত।

ওয়াজিদ আলি শাহ মোগল সাম্রাজ্যের সায়াহ্নে ১৮৪৭ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারী ২৬ বৎসর বয়সে লক্ষ্ণৌর সিংহাসনে বসেন। এঁর পিতার নাম ছিল আমজাদ আলী। ইনি আমজাদ আলির দ্বিতীয় পুত্র। এঁর প্রথম পূর্বপুরুষ পারসিক ভাগ্যান্বেষী সাদাত খান অযোধ্যার সুবাদার নিযুক্ত হন। তাঁর শেষ উত্তরাধিকারী ওয়াজিদ আলি শাহ 'আবদুল মুজাফর নাসিরুদ্দিন সিকন্দর খা, বাদশাই অবুল-কাইজার-ই-জামান, সুলতান-ই-আলম ওয়াজিদ আলি শাহ বাদশা ইত্যাদি উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। একাধারে তিনি কবি, সঙ্গীত প্রেমী, ও নৃত্যশিল্পীও ছিলেন। ওয়াজিদ আলি শাহ অযোধ্যার একাদশতম ও শেষ নবাব। ওয়াজিদ আলি শাহ রাজ্যশাসন অপেক্ষা নৃত্য-গীত-কাব্য ও-বিলাসিতায় সময় অতিবাহিত করতে থাকেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তাঁকে রাজ্যচ্যুত করে বেলগাছিয়াতে নজরবন্দী করে রাখে। এরপর বাকী জীবন তিনি মেটিয়াবুরুজে অতিবাহিত করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি দেহরক্ষা করেন।

ওয়াজিদ আলি শাহ ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরী প্রভৃতি নানাধরণের গান রচনা করেন। তাঁর নৃত্যসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন ঠাকুরপ্রসাদ ও তাঁর পুত্ররা। তাঁর আমলেই লক্ষ্ণৌ ঘরানার কথক নৃত্য বিকশিত হয়ে ওঠে। ওয়াজিদ আলি শাহের পূর্বপুরুষ আসফউদ্দৌলা (১৭৭৫-১৭৯৫) ফৈজাবাদ থেকে

লক্ষ্ণৌতে রাজধানী সরিয়ে আনেন। তাঁর সময়ও অনেক নৃত্যশিল্পী নৃত্য দরবার আলোকিত করেছিলেন।

ওলাজিদ আলি শাহ্ যোগিয়া উৎসব সুরু করেন। গেরুয়া পরে তিনি যোগী সাজতেন এবং নর্তকীরা সাজত যোগিনী। তাঁর সখের প্রাসাদ 'কাইজার বাগ'-এর প্রাঙ্গণে খোলামেলা পরিবেশে তিনি নাটক পরিবেশন করেন। এই আসরে দুশো তবলাবাদক এবং দুশো নর্তকী উপস্থিত ছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তাঁর আসরে যদু ভট্ট, অঘোরনাথ চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্রনাথ বসু ইত্যাদি উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি কথক নৃত্যে ঐসলামিক সংস্কৃতি ও তার প্রভাব পরিপূর্ণ ভাবে ছিল।

উত্তর ভারতে সঙ্গীত লুপ্ত হবার কারণ—

মোগল সাম্রাজ্যের অন্তে সঙ্গীতের বিশেষ অনাদর হতে লাগল। কারণ রক্ষণশীল ইসলামধর্মী ঔরঙজেব সঙ্গীতের পরিপন্থী ছিলেন। তিনি রাজ্যে সঙ্গীত চর্চা নিষিদ্ধ করে দিলেন। এর ফলে অনেক সঙ্গীত শিল্পী সঙ্গীত চর্চা ছেড়ে দিলেন, কেউ কেউ লুকিয়ে সঙ্গীতচর্চা করতে লাগলেন। এই সময় সঙ্গীত এবং সঙ্গীত শিল্পীদের একটি কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল। কারণ রাজ্য থেকে জীবিকা নির্বাহের জন্য নির্ধারিত অর্থও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাধ্য হয়ে শিল্পীরা ধনী ব্যক্তিদের মনোরঞ্জন করতে লাগলেন। এই সব শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা স্ত্রীলোক তাঁরা 'বাঈজী' শ্রেণীভুক্ত হলেন। রাজস্থানের মিরাশীরা বাঈজীদের নৃত্য গীত শিক্ষা দিতেন। কথিত আছে যে, এই সম্প্রদায়ের পূর্ব পুরুষের নাম ছিল চন্দন। কিন্তু বাদশাহের আদেশে কয়েকজন হিন্দুর প্রাণ রক্ষার জন্য তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। এই 'বাঈজী' সম্প্রদায় নৃত্যগীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। উত্তর ভারতে সঙ্গীতের ধারাটিকে এই সব বাঈজী সম্প্রদায়, মীরাশী এবং অন্যান্য শিল্পী সম্প্রদায়রা রক্ষা করে এসেছেন।

লক্ষ্ণৌ ঘরানা :—

কথক নৃত্যকে পুনরুজ্জীবিত করেন এলাহাবাদের অন্তর্গত হণ্ডিয়া (হাঁড়িয়া) তহশীল নিবাসী ঈশ্বর প্রসাদজী। ইনি কথক শ্রেণীভুক্ত মিশ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর তিন পুত্র—অড়গুজী, খড়গুজী ও তুলারামজী পিতৃপ্রদত্ত শিক্ষায় বিশারদ হয়ে ওঠেন। কিন্তু ঈশ্বরপ্রসাদজীর মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হয়ে খড়গুজী নৃত্য ছেড়ে দেন এবং তুলারামজী বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। কিন্তু অড়গুজী

তাঁর তিন পুত্রকে নৃত্যে সুদক্ষ করে তোলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর তিন পুত্র প্রকাশজী, দয়ালজী ও হরিলালজী লক্ষ্ণৌ আসেন। প্রকাশজী নবাব আসিফুদ্দৌলার সভানর্তক নিযুক্ত হন। প্রকাশজীর তিন পুত্রের মধ্যে ঠাকুর প্রসাদজী ওয়াজিদ আলি শাহের সভানর্তক ও শিক্ষাগুরু নিযুক্ত হন। কালক্রমে ওয়াজিদ আলি শাহ কথক নৃত্যে বিশেষ অনুরাগী ও দক্ষ হয়ে ওঠেন। এই সময় লক্ষ্ণৌ ঘরানা একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিকে অনুসরণ করে বিশেষ পরিচিত হয়ে ওঠে। ঠাকুর প্রসাদজীর জ্যেষ্ঠ ভাই দুর্গাপ্রসাদজীর তিন পুত্র বৃন্দাদীন, কালকাপ্রসাদ ও ভৈঁরোপ্রসাদ লক্ষ্ণৌ ঘরানার শ্রী ও গৌরব বৃদ্ধি করেন। বিন্দাদীন ছিলেন ভাবজগতের শিল্পী। তাঁর নৃত্যের ভেতর দিয়ে রসের স্ফুরণ হয়েছিল। তিনি নৃত্যের (অভিনয়) দিকে বেশী দৃষ্টি দিয়েছিলেন। কালকা প্রসাদজী ছিলেন বিখ্যাত তবলাবাদক। সুতরাং তালের সূক্ষ্ম কারুকার্য তাঁর নখদর্পণে ছিল। বিন্দাদীন মহারাজ ভাব ও অভিনয়ের ওপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং কালকা প্রসাদ তাল ও ছন্দের ওপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এই কারণে লক্ষ্ণৌ ঘরানায় ভাব ও ছন্দের অপূর্ব মিলন হয়েছিল।

এক কথায় বলা যেতে পারে লক্ষ্ণৌ ঘরানা ভাবপ্রধান অথবা নৃত্যপ্রধান। এতে হস্তক, অভিনয় প্রভৃতির ওপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়। নৃত্যের বোলগুলি শ্রুতিমধুর ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। স্বর্গগত অচ্ছান মহারাজ ও ওস্তাদ বাচ্চে খাঁ এই নৃত্যের প্রসারের জন্যে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। এঁরা দুজনেই কালকা প্রসাদ ও বিন্দাদীন মহারাজের সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন। এঁদের পর শম্ভুমহারাজের ওপর কথক নৃত্যের ব্যাপক প্রচারের গুরুভার ন্যস্ত হয়। শম্ভুমহারাজ সুষ্ঠুভাবে সে কাজ সম্পন্ন করেন। এ ছাড়া বিরজু মহারাজ, সিতারা দেবী, রামনারায়ণ মিশ্র, লচ্ছু মহারাজ প্রভৃতি এই ঘরানার এক একজন দিকপাল।

জয়পুর ঘরানার পৃষ্ঠপোষকরা পৃষ্ঠপোষকতা করতেন রাজস্থানের রাজ্যগুলিকে। জয়পুর ঘরানার প্রবর্তক ছিলেন ভানুজী। এর অনেকগুলি শাখা আছে। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এক সময় জয়পুর ঘরানার বিস্তৃতি অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল। ভানুজী ছিলেন পরমবৈষ্ণব। কিংবদন্তী আছে যে, ইনি একজন সাধুর কাছে শিবতাণ্ডব শিক্ষা করেন ও তাঁর পুত্র মালুজীকে শিক্ষা দেন। মালুজীর দুই ছেলে লালুজী ও কানুজী জন্মগত অধিকারে এই শিক্ষা গ্রহণ

করেন। কানুজী লাস্যভাব শিক্ষা করবার জন্যে বৃন্দাবনে যান এবং কৃষ্ণভক্ত হন। কানুজীর উত্তর পুরুষরা পুরুষানুক্রমে এই নৃত্য শিক্ষা লাভ করতে থাকেন। কানুজীর দুই পুত্র গীধাজী ও শোজাজীও এই শিক্ষা লাভ করেন। গীধাজীর পাঁচ পুত্রের মধ্যে দুলহাজী লাস্য ও তাণ্ডব উভয় পদ্ধতিতেই বিশেষ পারদর্শী হয়ে জয়পুরে বাস করতে থাকেন। ইনিই জয়পুর ঘরানার মেরুদণ্ড। দুলহাজী জয়পুরে গিরিধারীজী বলে পরিচিত হন। গিরিধারীজীর দুই পুত্রের ভেতর হরিপ্রসাদ নিঃসন্তান ছিলেন। হনুমান প্রসাদজীর তিন পুত্র ছিল। মোহনলাল, চিরঞ্জীলাল ও নারায়ণ প্রসাদ। হনুমান প্রসাদজী নৃত্য বিশারদ হয়ে ওঠেন। হরিপ্রসাদ ও হনুমান প্রসাদের খুড়তুতো ভাইদের ভেতর চুনীলাল তাঁর পুত্রের নৃত্যে বিশেষ দক্ষ করে তোলেন। জয়লাল ও সুন্দরপ্রসাদ জয়পুর ঘরানার দুই বিখ্যাত দিক্‌পাল। পূর্বোক্ত হরিপ্রসাদ ও হনুমানপ্রসাদ জয়পুরে গুণীজনখানাতে সভানর্তক ছিলেন। হনুমান প্রসাদের নৃত্য লাস্যপ্রধান ছিল এবং হরিপ্রসাদের নৃত্য নৃত্ত প্রধান ছিল। শ্যামলাল, চুনীলাল, দুর্গাপ্রসাদ ও গোবর্ধনজী জয়পুর ঘরানার একটি শাখা বলে পরিচিত হন। এঁরা শঙ্করলাল নামে একজন গুণী বৃদ্ধের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। চুণীলালের সুযোগ্য পুত্রদ্বয় জয়লাল ও সুন্দর প্রসাদ এই ঘরানার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পাচার্য।

আর একটি ঘরানার কথা ইদানীং শোনা যায়। একে 'বেনারস' ঘরানা বলা হয়। জয়পুর ঘরানা পূর্বে শ্যামল দাস ঘরানা বলে বিশেষ পরিচিত ছিল। এই ঘরানা পরবর্তীকালে দুটি ঘরানায় বিভক্ত হয়। একটি জয়পুর এবং অপরটি বেনারসের জানকী প্রসাদ ঘরানা। জয়পুর ঘরানা জয়পুরে বিকাশ লাভ করে এবং জানকীপ্রসাদ ঘরানার বেনারসে স্থিতি হয়। জানকীপ্রসাদের তিন শিষ্যের ভেতর চুণীলাল রাজস্থানে বসবাস করতে আরম্ভ করেন এবং দুলহারাম ও গণেশীপ্রসাদ বেনারসে চলে যান। দুলহারামের তিন পুত্রের ভেতর বিহারীলাল ইন্দোরের সভানর্তক নিযুক্ত হন এবং বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। বিহারীলালের তিনপুত্র কিষণলাল, মোহনলাল ও সোহনলাল দেরাদুনে বসবাস করতে থাকেন। বিহারীলালের ভাই হীরালাল বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। জানকীপ্রসাদের ভাই গণেশীলালের তিন পুত্র হনুমান প্রসাদ, শিবলাল ও গোপালদাস খ্যাতি লাভ করেন। শিবলালের তিনপুত্র সুখদেব, দুর্গাপ্রসাদ এবং কুন্দনলাল কথক নৃত্যের ধারক ও বাহক। জয়পুর

ঘরানার প্রথম মহিলা শিল্পী ছিলেন আশা ওঝা। এ ছাড়া ৺জয় কুমারী, রোশন কুমারী, ৺রামগোপাল প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য।

লক্ষ্ণৌ ও জয়পুর ঘরানার পার্থক্য—

লক্ষ্ণৌ ও জয়পুর ঘরানার সীমারেখাটি যদিও লুপ্ত হতে বসেছে তবুও এই দুটি ঘরানার ভেতর একটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। লক্ষ্ণৌ ঘরানাকে নৃত্যের ঘরানা বলা যেতে পারে। এই ঘরানা অভিনয় প্রধান বলে এই ঘরানার লাস্যের আধিক্য আছে। লক্ষ্ণৌ ঘরানার বোলগুলি ছোট ছোট এবং শ্রুতিমধুর। ঠুম্‌রী গানের সঙ্গে ভাবের বিকাশ একমাত্র লক্ষ্ণৌ ঘরানাতেই বোধ হয় দেখা যায়। অবশ্য জয়পুর ঘরানার অনেক শিল্পী লক্ষ্ণৌ ঘরানার এই ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেন। অপরপক্ষে জয়পুর ঘরানাকে 'নৃত্ত' প্রধান বলা যেতে পারে। এই ঘরানায় লাস্য নেই বললেই চলে। তাললয় প্রধান এই নৃত্য শৈলী তাণ্ডবের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য আঙ্গিকে ও পদকর্মে বলিষ্ঠতা প্রকাশ পায়। অভিনয় অর্থাৎ ঠুংরী গানের সঙ্গে ভাব প্রদর্শন ইত্যাদি নেই। যে সব কবিতাঙ্গী বোল আছে সেগুলিতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার পরিবর্তে শিব তাণ্ডব বা কালিকাপুরাণ প্রভৃতি ভাব বেশী প্রকাশ পায়। কথক নৃত্যের বৈশিষ্ট্য ভ্রমরীর প্রয়োগ উভয় ঘরানাতেই দেখা যায়। তবে পুর্বে জয়পুর ঘরানায় ছেদহীন ভ্রমরী বিস্ময়ের সঞ্চার করত। এখন উভয় ঘরানাতেই ভ্রমরী একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। ঘরানার বিভেদ ক্রমশই বিলীন হচ্ছে। লক্ষ্ণৌ ঘরানাতেও ইদানীং তাল-লয়-ছন্দের সঙ্গে ভাবের অপূর্ব সমাবেশ হয়েছে, এবং জয়পুর ঘরানাতেও ভাবের সমাবেশ ঘটেছে। সুতরাং যে ঘরানায় যা অভাব ছিল তা পূরণ হয়ে উঠছে। আমার মনে হয় এটি শুভ লক্ষণ। আধুনিক যুগে কথক নৃত্যের কর্ণধার বিরজু মহারাজ এই শুভ কাজের হোতা। বেনারস ঘরানায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন গোপীকিষেণ।

কথক নৃত্যে বংশপরম্পরায় ঘরানার বিবাদ চলে আসছে। কখনও কখনও এই বিবাদ প্রবল আকার ধারণ করেছে। বংশগত সম্পত্তির মত এই বিবাদের সূত্র সযত্নে রক্ষা করে এসেছেন শিল্পীদের উত্তর পুরুষরা। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এই বিবাদের মূলে যে কারণগুলি পরোক্ষ ভাবে নিহিত রয়েছে তা শিল্পের প্রচারের বিশেষ পরিপন্থী। এ বিষয়ে একটু আলোকপাত করবার চেষ্টা করছি। সম্ভবতঃ বিবাদের প্রথম সূত্রপাত হয় ধর্ম নিয়ে। লক্ষ্ণৌ

ঘরানার প্রবর্তক ইশ্বর প্রসাদজী ছিলেন বৈষ্ণব। কিন্তু তাঁর মাননীয় পৃষ্ঠ পোষক ছিলেন নবাব। জয়পুর ঘরানার প্রবর্তক ভানুজী ছিলেন শৈব এবং তাঁর মাননীয় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হিন্দু রাজা। বৈষ্ণব ও শৈবদের মধ্যে কোন কালেই সম্প্রীতি ছিল না। মনে হয় বিবাদের এই ছিল প্রথম সুত্রপাত। লক্ষ্ণৌ ছিল মুসলমান শাসিত এবং জয়পুর ছিল হিন্দু শাসিত। শিল্পক্ষেত্রে দুইরাজ্যের গৌরব ও মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত। সুতরাং দুইরাজ্যের বেতনভোগী শিল্পীদের মধ্যে বিবাদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। পরবর্তীকালে রাজ্যের গৌরব লক্ষ্মী অন্তর্হিত হলেও বিবাদের শেষ হয় নি। বংশগত সূত্রে তা প্রতিভার লড়াইয়ে পরিণত হয়। বিংশ শতাব্দীর আট দশকেও এই লড়াইয়ের সমাপ্তি ঘটে নি। নিতান্তই গুরুর নির্দেশ বলে এই লড়াই এখনও চলছে। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, এই বিবাদের এখন কোন প্রয়োজন নেই। কারণ যুগ পরিবর্তন হয়েছে। এই যুগ হচ্ছে অগ্রগতির যুগ। নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা নৃত্যের ব্যাপ্তি অব্যাহত রাখতে হবে। কিন্তু এক একটি ঘরানার রক্ষণশীল মনোভাবের জন্যে এর পরিধি ক্রমশঃই ছোট হয়ে আসছে। এই অযৌক্তিক রক্ষণশীলতা ত্যাগ না করলে জ্ঞানের ভাঁড়ার ক্রমশই শূন্য হয়ে পড়বে। এই নৃত্য পথভ্রষ্ট হতে পারে এই আশঙ্কায় অনেকে এর সংস্কার করতেও চান না। এই বিষয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সাহসী হয়েছিলেন বিশ্ব বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী মেনকা। তিনি অতি দৃঢ়তার সঙ্গে নৃত্যাভিনয়ে কথকের প্রয়োগ করেন। 'মালবিকাগ্নিমিত্রম' প্রভৃতি সংস্কৃত নাটককে কথকের মাধ্যমে প্রকাশ করে এর সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আলোকপাত করেন মেনকা দেবী। যাই হোক, দুটি ঘরানাই আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। জয়পুর ঘরানা সূর্যরশ্মির মত প্রখর, কিন্তু লক্ষ্ণৌ ঘরানায় এই রকম তীব্র চমক না থাকলেও ভাবের সৌন্দর্যে এই ঘরানা চন্দ্রকিরণের মতনই স্নিগ্ধ পরিবেশের সৃষ্টি করে। তাই বলে দুটি ঘরানাতেই-দিন রাত্রির মত প্রভেদ নেই। এর মধ্যে যে সূক্ষ্ম ভেদ রয়েছে তা সাধারণের কাছে বিশেষ বোধগম্য হয় না। ঘরানার বিবাদ পরিত্যাগ করে একমাত্র 'কথক' বলে পরিচিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

হস্তকঃ—কথক নৃত্যে শাস্ত্রে বর্ণিত হস্ত ভেদের বিধিবদ্ধ প্রয়োগ নেই। হস্তভেদের বিভিন্ন নাম ও তার প্রয়োগ সম্বন্ধে নাট্যশাস্ত্রে যে রকম বর্ণনা আছে কথক নৃত্যে সেই নিয়মানুযায়ী হস্তভেদের প্রয়োগ করা হয় না। হস্তক বলতে

এক কথায় বলা যেতে পারে, সমস্ত হাতের প্রয়োগ রীতি। নৃত্যের মাধ্যমে যে ভাবটি প্রকাশ করা হয় তারই নামানুসারে হস্তকের নামকরণ করা হয়। যেমন 'বীণাবাদিনী' বোঝাতে বীণা বাজাবার ভঙ্গিটির মতন হাত করতে হবে। কিন্তু 'বীণাবাদিনী' বোঝাতে শাস্ত্রানুসারে যে স্থচী এবং অলপদ্ম হাতের মিশ্র মুদ্রার প্রয়োগ করতে হয়, এই কথাটি বলা হয় না বলেই অজানা রয়ে গিয়েছে। হাতের দ্বারা লৌকিক বস্তুর অনুকরণ করা হয়। সেইজন্য একে আংশিকভাবে লোকধর্মী বলা যেতে পারে। 'স্থাস' হস্তক বা 'মূল' হস্তক কথক নৃত্যের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে। একটি হাত সামনে সমান্তরাল ভাবে স্থাপন করতে হয় এবং আর একটি হাত মাথার ওপরে স্থাপন করতে হয়। একে 'স্থাস' হস্তক বলা হয়। ঠাট অথবা সমে দাঁড়াবার সময় এই হস্তক করা হয়।

কথক নৃত্যের কয়েকটি অংশ আছে—ঠাট, আমদ, তোড়াটুকরা, পঢ়ন্ত, গৎভাব ও লয়কারী।

ঠাট—কথক নৃত্যের প্রথমেই ঠাটের প্রয়োগ হয়। তবলার ঠেকার সঙ্গে চোখ, ভ্রূ, মণিবন্ধ প্রভৃতির মৃদু চালনাকে 'ঠাট' বলা হয়। যেমন ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতে ঠাটের দ্বারা রাগের পরিচয় দেওয়া হয়, সেইরকম 'ঠাট' হচ্ছে কথক নৃত্যের পূর্ব পরিচিতি। এর দ্বারা লয়কে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং কথক নৃত্যের সূচনা করা হয়।

কসক মসক—এই শব্দ দুটি কথক নৃত্যে প্রায় শোনা যায়। কিন্তু এর সঠিক ব্যাখ্যা লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা খুবই শক্ত ব্যাপার। এটি হচ্ছে লাস্য পর্যায়ভুক্ত। ঠাট করবার সময় এর প্রয়োগ হয়। লয়কে প্রতিষ্ঠিত করবার সময় কোন একটি বিশেষ বোলের শব্দের বিস্তৃতি, কম্পন অথবা রেশটিকে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় শুধুমাত্র দেহের উপরার্ধের ভঙ্গি ও গতির দ্বারা প্রকাশ করলে তাকে 'কসক মসক' বলা হয়। অনেকে ঠাটের সময় অথবা লাস্যাঙ্গের কোন ভাব প্রদর্শনের সময় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের প্রয়োগকে 'কসক-মসক' বলেন।

আমদ—'আমদ' শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'প্রবেশ'। এই শব্দটি উর্দু থেকে এসেছে এবং কথক নৃত্যে এর প্রয়োগের অর্থটিও খুব সুস্পষ্ট নয়। সাধারণতঃ প্রণামী অথবা সেলামী টুকরার পর যে নৃত্যাঙ্গী টুকরাটি প্রদর্শন করা হয়

তাকে কারও মতে কথক নৃত্যের প্রথম করনীয় বা আমদ বলা হয়। প্রথম করনীয়ের ভেতর দাঁড়াবার নিয়ম, ঠাট প্রভৃতিকে গণ্য করা হয়। আবার কারও মতে কথক নৃত্যে প্রথম যে টুকরাটি করা হয় তাকে 'আমদ' বলা হয়। এ নিয়ে যথেষ্ট মত ভেদ আছে।

তোড়া—কতকগুলি ছন্দযুক্ত শব্দাক্ষরকে তবলার ঠেকার তিন বা ততোধিক আবর্তনের ভেতর প্রয়োগ করলে 'তোড়া' বলা হয়। তোড়া বিভিন্ন প্রকারের লয়, ছন্দ ও তেহাই যুক্ত হতে পারে। তোড়া বিভিন্ন ধরণের হতে পারে :—পরণ, চক্রদার, কামালী, ফরমায়েসী ইত্যাদি।

টুকরা—ছোট নাচের বোলগুলিকে 'টুকরা' বলা হয়।

চক্রদার তোড়া—তোড়াটিকে তিনবার আবৃত্তি করতে হবে। তোড়াটি 'সম' থেকে সুরু হবে এবং এক একবার এক একটি মাত্রা অথবা তালে শেষ হয়ে তৃতীয়বার সমে এসে পড়বে। 'চক্রদার' শব্দটি হিন্দী শব্দ। বাংলায় 'চক্রধার' বলা হয়ে থাকে। কারণ তোড়াটি চক্রের মত দুই তিন আবর্তন ঘুরে এসে সমে পড়ে। চক্রের আধার হচ্ছে—তবলার ঠেকা। সুতরাং বাংলায় একে চক্রধার বলা হয়ে থাকে।

পঢ়ন্ত—কথক নৃত্যে কোন বোল নাচবার আগে হাতে তাল ও লয় দেখিয়ে বলতে হয়। একে 'পঢ়ন্ত' বলে।

প্রিমেলু বা পরমেলু—বিভিন্ন আনদ্ধ যন্ত্র এবং নাচের বোলের সংমিশ্রণকে প্রিমেলু বলা হয়।

নটবরী-বোল—যে সকল বোল তা, থেই, দিগদিগ ইত্যাদি শব্দাক্ষরের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলিকে নটবরী বোল বলে। এইগুলিকে নৃত্যাঙ্গী বোলও বলা হয়।

কবিতাঙ্গী—কোন কবিতা যখন তাল লয়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তখন তাকে 'কবিতাঙ্গী' বলা হয়।

তৎকার—কথক নৃত্যের প্রারম্ভিক পদবিক্ষেপকে তৎকার বলা হয়। তৎকারের ওপর কথক নৃত্য প্রতিষ্ঠিত।

ঠেকা—তবলার কতকগুলি অক্ষরকে সুসামঞ্জস্য ভাবে নির্দিষ্ট মাত্রানুসারে বিভাগ সহকারে সাজিয়ে কোন তালে নিবদ্ধ করে বাজানোকে 'ঠেকা' বলা হয়।

আবর্তন—যে কোন তালের 'সম' অথবা প্রথম মাত্রাথেকে সুরু করে

পরবর্তী সোম বা সেই তালের শেষ মাত্রা পর্যন্ত বাজান হলে একটি আবর্তন হবে। যতবার ওইভাবে বাজান হবে তত আবর্তন হবে।

পক্ষীপরণ—পাখীর ডাকের অনুকরণে যে বোল রচিত হয়েছে তাকে পক্ষীপরণ বলা হয়, যেমন টেহুকুকু, তাতাকুকু ইত্যাদি।

গত্—গত্ শব্দটি গতির অপভ্রংশ। গত্-এ কোন বিশেষ ভাবের প্রকাশক একটি বিশেষ ভঙ্গিকে তাল-লয় সহকারে গতির সাহায্যে প্রকাশ করলে 'গত্' বলা হয়।

নিকাস্—তোড়া-কুটরা অথবা গত্ কিংবা গত-ভাও করবার পূর্ব-প্রস্তুতিকে অর্থাৎ ঠেকার ওপর বিভিন্ন গতিকে 'নিকাস' বলা হয়।

গত্ভাব—যখন কোন আখ্যায়িকার অংশবিশেষকে অভিনয়ের দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তখন তাকে 'গৎভাব' বলা হয়।

শ্লোক অথবা স্তুতি—এতে সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ থাকে। এর দ্বারা দেবতার প্রশস্তি অথবা স্তুতি করা হয়।

তিহাই—তবলা অথবা নাচের ছোট ছোট বোলের ক্ষুদ্রাংশ একই ভাবে এক আবর্তনের মধ্যে তিনবার আবৃত্তি করলে তিহাই হয়। তিহাইয়ের একটি নিজস্ব ঢঙ্ আছে।

অদা—'অদার' অর্থ হচ্ছে নৃত্যের কোন বিষয় বস্তুকে দর্শকের সম্মুখে প্রকাশ করা অথবা উপস্থাপিত (পেশ) করা। কথক নৃত্যে শৃঙ্গার প্রধান গীত অথবা ঠুম্‌রীর ভাবকে বিভিন্ন হস্তকের দ্বারা প্রকাশ করাকেও 'অদা' বলা হয়।

লয়কারী—কথক নৃত্যে পায়ের কাজের দ্বারা লয়ের বিভিন্ন গতি প্রদর্শন করা হয়। একে 'লয়কারী' বলে।

ঘুমরিয়া বা ফিরকনী—যে কোনদিকে চক্রাকারে ঘোরাকে ঘুমরিয়া বলা হয়।

পাল্টা—সাধারণতঃ বোলের ক্রম পরিবর্তনকে পাল্টা বলা হয়; অথবা পায়ে বাটের কাজ প্রদর্শনের সময় একটি বাটের বোল পরিবর্তন করে আর একটি যখন করা হয় তখন এই পরিবর্তনকেও 'পাল্টা' বলা হয়। কিন্তু কথক নৃত্যে 'বোল অথবা 'গত্' করবার সময় যে বিরতিটুকু থাকে, সেই সময়টুকু দুদিকে ঘুরে পরবর্তী ক্রম সুরু করতে হয়। একে পাল্টা বলা হয়।

প্রণামী টুকরা—নৃত্যের শুরুতেই নৃত্যশিল্পী একটি নাচের টুকরার

দ্বারা ইষ্টদেবতা ও সমাগত দর্শকমণ্ডলীকে প্রণাম, শ্রদ্ধা ও অভিবাদন জানান। পূর্বে হিন্দুরা প্রণামের দ্বারা ও মুসলমানরা সেলামের দ্বারা এই ক্রিয়া সম্পন্ন করতেন। এখনহিন্দু মুসলমান সকলেই প্রণামী ও সেলামী টুকরা করেন।

পূর্বকালে কথক নৃত্যকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে—'গত্-তোড়া' ও 'গত-ভাব'। প্রথম অংশটিতে নৃত্ত (তোড়াটুকরা) প্রদর্শিত হয় ও দ্বিতীয় অংশটিতে 'নৃত্য' বা অভিনয় প্রদর্শিত হয়।

ঠুংরী গানের সঙ্গে যে অভিনয় প্রদর্শিত হয় তাকে হিন্দী ভাষায় 'ভাও বাৎলানো' বলা হয়। কথক নৃত্যে এই ভাবকে আবার বিভিন্ন ভাগে ভাগ ভাগ করা হয়েছে—(১) নয়নভাব (২) বোলভাব (৩) অর্থভাব (৪) সভাভাব (৫) নৃত্য ভাব (৬) গত্-অর্থভাব (৭) অঙ্গভাব।

নয়নভাব—গীতের ভাবকে ভ্রূ ও নয়নের দ্বারা প্রকাশ করাকে 'নয়নভাব' বলে।

বোলভাব—ঠুংরী গানে যতগুলি শব্দ আছে, ততটুকু ভাবের প্রকাশকে বোলভাব বলে।

অর্থভাব—গীতের বিষয় অনুসারে যখন ভাব প্রকাশ করা হয় এবং নৃত্য শিল্পী যখন বিষয়বস্তুর স্বরূপ হন, তখন তাকে অর্থভাব বলা হয়।

সভাভাব—নৃত্যশিল্পী দর্শকদের সামনে ভাব প্রকাশ করলে দর্শকরা যদি তদ্‌গতভাবে বিভাবিত হন, তাহলে 'সভাভাব' হয়।

নৃত্যভাব--নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাব প্রকাশকে 'নৃত্যভাব' বলা হয়।

গত্ অর্থভাব—নৃত্য-গীত-অভিনয় একই সঙ্গে করা হলে তাকে গত্ অর্থভাব বলা হয়।

অঙ্গভাব—গীতের অর্থকে অঙ্গচেষ্টার দ্বারা প্রকাশ করলে তাকে অঙ্গভাব বলা হয়।

সাতটি লক্ষণ:

এ ছাড়া কথক নৃত্যের সাতটি লক্ষণ বা অবয়বের কথা বলা হয়েছে, যথা—লক্ষণ নৃত্য বা ঠাট, নৃত্যাঙ্গ, জাতিশূন্য, ভাবরঙ্গ, ইষ্টপদ, গতিভাব ও তরানা।

লক্ষণ নৃত্য—ঠাটের অংশকে 'লক্ষণ নৃত্য' বলা হয়। এর দ্বারা কথক নৃত্যের লক্ষণটি পরিস্ফুট করা হয়।

নৃত্যাঙ্গ—এতে নৃত্যের নানারকম রূপ প্রদর্শন করা হয়। এতে লয়কারী জাতি ও তৎকার প্রভৃতির সমাবেশও থাকে।

জাতিশূন্য—লয়কারীর সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শনের বিভিন্ন ধরণকে জাতিশূন্য বলা হয়।

ভাবরঙ্গ—এতে নায়ক-নায়িকার ভেদকে সাহিত্য পরণ, ভাবপরণ ও স্বরজাতির দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

ইষ্টপদ—এতে কবিতার দ্বারা ইষ্টদেবকে স্তুতি করা হয়।

গতিভাব—এতে সাধারণতঃ ঠুম্‌রী গানের অর্থ প্রকাশ করা হয়।

তরানা—এতে স্বর সংযোগের সঙ্গে সঙ্গীতপরণ ও সাহিত্যপরণের সংযোগ হয়।

এছাড়া কথক নৃত্যে সপ্ত পদার্থ বা ক্রমের কথা বলা হয়েছে—ঠাট, সেলামী, আমদ, নৃত্যাঙ্গ, গত্‌ভাও, তৎকার, হেলা। 'হেলা ছাড়া সবগুলিই পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

হেলা—শৃঙ্গার রসে ব্যবহৃত হয়।

কোন জাতীয় নৃত্যের সঙ্গে মিশ্রণ সম্ভবপর হয়েছিল—

এখন বিচার্য বিষয় হল, কোন জাতীয় ভারতীয় নৃত্যের সঙ্গে বহিরাগত নৃত্যের মিশ্রণ সম্ভবপর হয়েছিল? মনে হয় মার্গ নৃত্যের সঙ্গে এই মিশ্রণ সম্ভবপর হয় নি। কারণ মার্গ নৃত্য মন্দির কেন্দ্রিক নৃত্য ছিল এবং আয়ত্ত করাও কষ্টসাধ্য ছিল। শুধু তাই নয়, মার্গ নৃত্যে চারটি অভিনয়ের সমান প্রাধান্য ছিল। মার্গনৃত্যে শাস্ত্রীয় নৃত্যের পূর্ণ বিকাশও থাকা চাই। রূপসজ্জা, অঙ্গহার, করণ, হস্তভেদ প্রভৃতির যে সকল বিধান শাস্ত্রে আছে, তা যথাযথভাবে মার্গ নৃত্যে অনুসরণ করে চলতে হত। এর সঙ্গে কথক নৃত্যের বিশেষ কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। তবে মনে হয়, বহিরাগত নৃত্যের সঙ্গে দেশী নৃত্যের সংমিশ্রণ হয়েছিল। দেশী নৃত্য বলতে অঙ্গহারবর্জিত তাললয়সমন্বিত 'নৃত্ত' বোঝায়। কথক নৃত্যেও অঙ্গহারের থেকে তাললয়ের ওপর বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত সঙ্গীত রত্নাকরে 'দেশী' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। দেশী সঙ্গীত বা নৃত্যের কোন সংজ্ঞা নেই। তবে দেশী স্থানক ও দেশী চারীর উল্লেখ আছে এবং গৌণ্ডলিবিধি ও পেরণী পদ্ধতির উল্লেখ আছে যা পরবর্তীকালে 'দেশী' নৃত্যে স্থান পেয়েছে। সঙ্গীত দর্পণ ও সঙ্গীত নির্ণয়ে দেশী

নৃত্যের অন্তর্গত শব্দনৃত্যের ও জক্কড়ী নৃত্যের উল্লেখ আছে। মনে হয় এই জাতীয় নৃত্যের সঙ্গে মিশ্রণসম্ভবপর হয়েছে। শব্দ নৃত্যে 'তৎকার' শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। কথক নৃত্যেও তৎকার শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায় এবং এই শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শব্দনৃত্যে মুখে শব্দাক্ষর উচ্চারণ করে এক পা'কে সামনে অঞ্চিত রেখে আয়তহস্তে তৎকারে সমে আসবার পদ্ধতির সঙ্গে কথক নৃত্যের সাদৃশ্য দেখা যায়। শব্দ নৃত্যে সূচী হস্ত বিশেষ স্থান জুড়ে আছে, কিন্তু কথক নৃত্যে সূচী হস্তের কোন প্রাধান্য নেই, এমন কি প্রয়োগও দেখা যায় না। শব্দ নৃত্যে শিখর হস্তে হাত নাভি ও বুকের পাশে রেখে ভ্রমরী করবার পদ্ধতি আছে। কথক নৃত্যেও ভ্রমরীর বহুল প্রয়োগ আছে, যদিও ঠিক এই পদ্ধতিতে করা হয় না। এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, শব্দনৃত্যের কতকাংশের সঙ্গে এর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। শব্দনৃত্যে তালের প্রাধান্য ছিল এবং গীতের প্রথম অক্ষর :ষড়জ ও 'মধ্যমে 'তা', শব্দের দ্বারা সুরু হত। (নর্তননির্ণয়)

সঙ্গীত দর্পণে বলা হয়েছে যে, শব্দনৃত্যে করণ, নৃত্তহস্ত, স্থানক ব্যবহৃত হয়। শব্দনৃত্য দু রকমের—অক্ষরপ্রধান ও স্বরপ্রধান। এই নৃত্যে দুটি ভাগ—শুদ্ধ নৃত্য ও সালগসূড়। সালগসূড়ের সাতটি অংশ—ধ্রুব, মঠ, রূপক, ঝম্পতাল, ত্রীয়, অষ্টতালী ও একতালী। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে শব্দনৃত্যের পরিধি বৃহৎ ছিল। একথাও স্পষ্ট যে উপরোক্ত কয়েকটি শব্দের সঙ্গে কথকনৃত্যের তালের সাদৃশ্য আছে, যেমন রূপক, এক তাল ঝম্পা ইত্যাদি।

জক্কড়ী নৃত্যের সঙ্গেও কথক নৃত্যের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। জক্কড়ী নৃত্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, যবনভাষাযুক্ত গীত হবে এবং ধৃতাঞ্চল হয়ে নৃত্য করতে হবে। এতে তিনটি লয় থাকে। কথক নৃত্যেও যবন ভাষার বহুল প্রয়োগ দেখা যায়; যেমন আমদ, পেশ, অদা ইত্যাদি। গজল ও ঠুমরী গানের সঙ্গে কথক নৃত্যের 'ভাব' (অভিনয়) প্রদর্শিত হয়। এই অংশে উর্দু ও ফার্সী ভাষার প্রয়োগ থাকে। ধৃতাঞ্চল হয়ে নৃত্য করবার প্রথা নেই বটে তবে তার ছায়াপাত আছে। মনে হয় পূর্বে এই ধরণের প্রথা ছিল। 'ঘুংঘট' গত্‌টি কথক নৃত্যের অভিনয়ের অংশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই অংশে বিভিন্নভাবে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকবার পদ্ধতি প্রদর্শিত হয়। শুধু তাই নয়, 'জমনকা' ঠুংরী গানে ভাবপ্রদর্শনের একটি বিশেষ অঙ্গ। এই অংশে সূক্ষ্ম রেশমী ওড়নাতে

মুখ আবৃত করে বসতে হয়। একে 'জমনকা' বলা হয়। সুতরাং ধ্রুতাঙ্কলের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। 'নর্তন নির্ণয়ে' বলা হয়েছে 'ধ্রুব' ও 'সম্য' সঙ্গীত সহযোগিতা করে। এছাড়া শুধুমাত্র কতকগুলি বিশেষ ভঙ্গীর প্রয়োগ থাকে। 'সঙ্গীত দর্পণে' বলা হয়েছে যে এর সঙ্গে 'গজরা' নামে একরকম বাদ্যযন্ত্র বাজান হ'ত। যবন ভাষার বহুল প্রয়োগ, ঐসলামিক্ বেশভূষা, সেলামী টুকরা, বাদশাহদের এই নৃত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ, গত্ প্রভৃতি ভাবের ভেতর কোন কোন ক্ষেত্রে যবনোচিত ভাবের প্রকাশ ইত্যাদিতে এই ধারণাই ঘনীভূত হয় যে, কথক নৃত্য অন্য নৃত্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছিল। 'জকড়ী' নৃত্যকে পারস্যের নৃত্য বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এই নৃত্যের সঙ্গে শব্দনৃত্যের মিশ্রণ খুবই সম্ভবপর বলে মনে হয়। অপর পক্ষে জকড়ী নৃত্যও যে যবন ও ভারতীয় নৃত্যের মিশ্রণ নয়, এ কথাও সঠিকভাবে বলা যায় না। এই জকড়ী নৃত্যই যে কালক্রমে কথক নৃত্যে রূপান্তরিত হয়নি, তাই বা কে বলবে?

ওপরে উক্ত যে দুটি গ্রন্থের থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে এই দুটি গ্রন্থই দুই ভারতীয় সম্রাটের আদেশে রচিত হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে সম্রাট আকবরকে সন্তুষ্ট করতে পুণ্ডরীক বিঠল 'নর্তন নির্ণয়' গ্রন্থটি রচনা করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে দামোদর পণ্ডিত 'সঙ্গীতদর্পণ' বইটি লিখে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দ্বারা পুরস্কৃত হন। এই বইদুটিতে সেই সময়কার প্রচলিত সঙ্গীত, তাল ও নৃত্যপদ্ধতি সম্বন্ধে যে ভাবে আলোচনা করা হয়েছে, দেশী নৃত্যের যে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা পূর্ববর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রগুলিতে পাই না। এই দুটি গ্রন্থেই দেশী নৃত্যের প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায় এবং মনে হয় এই সময় থেকেই দেশীনৃত্যগুলি পরিপূর্ণ রূপ পায়। সেইজন্যে এই বই দুইটি খুবই মূল্যবান।

ভরত নাট্যম্

"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী।"

রবীন্দ্রনাথ

ভরতনাট্যম

ভারতের দক্ষিণাংশ তিনদিকে সুনীল বারিধি দ্বারা বেষ্টিত। বাইরের শত্রু এই বিশাল সমুদ্র অতিক্রম করে দক্ষিণ ভারতকে আক্রমণ করতে বিশেষ সমর্থ হয়নি। আক্রমণের প্রথম ও প্রচণ্ডতম আক্রমণ উত্তর ভারতকেই সহ্য করতে হয়েছে। যদিও এই আঘাত থেকে দক্ষিণ ভারত একেবারে অব্যাহতি পায়নি, তবুও এই প্রান্তটি নিজ সংস্কৃতিকে অনেক পরিমাণে অবিকৃত রাখতে সমর্থ হয়েছে। এইজন্য দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে উত্তর ভারতের ভাষাগত, কৃষ্টিগত ও রুচিগত বৈষম্য রয়েছে। প্রাচীনকালে দক্ষিণ ভারত দ্রাবিড় দেশ বলে পরিচিত ছিল। ইতিহাসে দ্রাবিড় সভ্যতাকে প্রাগ্‌ আর্যসভ্যতা বলে অনুমান করা হয়। আর্য সভ্যতা ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বে অনার্য সভ্যতা প্রায় সারা ভারতবর্ষেই পরিব্যাপ্ত ছিল। আর্যাবর্ত আর্যদের করায়ত্ত হলে দ্রাবিড়রা দক্ষিণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই দুই সভ্যতার সংঘাত লেগেই ছিল। যতদিন পর্যন্ত এই দুই সভ্যতার পারস্পরিক মিলন না হয়েছিল, ততদিন পর্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বহু যুগ ধরে সহ অবস্থানের ফলে এই দুই সংস্কৃতির মিলন সম্ভবপর হয়েছিল বটে, কিন্তু একটি অদৃশ্য সীমারেখা ভারতের দুই প্রান্তকে বিভক্ত করেছিল। এর ফলে উভয়ের আচার-ব্যবহার, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে একটি বিষম ভাব দেখা যায়।

যদিও সাতবাহন রাজত্বকালের সামান্য লিপিবদ্ধ ইতিহাস পাওয়া যায় তবুও ঐতিহাসিকদের মতে সঙ্গমযুগের নির্ভুল ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। তাঁরা যে সকল সাংস্কৃতিক তথ্যের উল্লেখ করেছেন, তার ওপর নির্ভর করে দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করা যেতে পারে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সাতবাহন রাজাদের কীর্তিকলাপ ও জনসাধারণের ব্যবহারিক জীবন থেকে সঙ্গীত প্রিয়তার কথা জানা যায়। শুধু তাই নয়, একটু ধৈর্য ধরে অনুধাবন করলেই দাক্ষিণাত্যে সঙ্গীত ও নৃত্যের ধারা কিভাবে অব্যাহত রয়েছে তাও অনুমান করা যায়।

সঙ্গম যুগে নৃত্যের উপাদান—সাতবাহন রাজত্বকালে সঙ্গম যুগের সূচনা হয়। সঙ্গম যুগে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে।

তামিলনাদে প্রথম শতাব্দীতে কাবেরী পুমত্তনমের পরাক্রমশালী চোলরাজা কারিকালা ও মাতুরার পাণ্ড্যরাজ সঙ্গীত কলাকে বিশেষ উৎসাহিত করেন। পরবর্তীকালে শিলপ্পদিকরণের নায়ক নায়িকা কোভলন, কোন্নাকী ও মাধবীর জীবনের ঘটনাবলী এই শতাব্দীতেই ঘটে। দ্বিতীয় শতাব্দীতে 'চেরন, সেঙ্গুত্তভন্' নামে চেররাজ উত্তর ভারত জয় করেন এবং হিমালয় থেকে একটি পাথর এনে তাতে কোভলনের সতীসাধ্বী পত্নী কোন্নাকীর মূর্তি খোদিত করেন। চেরন্ সেঙ্গুত্তভনের ভাই ইলাঙ্গো আডিগল তামিলনাদের বিরাট কাব্যগ্রন্থ শিলপ্পদিকরণ রচনা করেন। তাঁর বন্ধু 'মিথলাই সথনর' মাধবীর কন্যাকে নিয়ে 'মেনিমেখলী' রচনা করেন। এই দুটি গ্রন্থেই নৃত্য ও গীত সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এই দুটি কাব্যের জন্য সঙ্গম যুগ অমর হয়ে আছে।

শিলপ্পদিকরণের মধ্যমণি ছিলেন চোলরাজ কারিকালা। ১৯০ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজা হন। পণ্ডিত নসিনরক্কিনিয়ারের মতে কারিকালা একজন ভেলির কন্যাকে বিয়ে করেন। তিরুমঙ্গাই আলোয়ার বলেন, কারিকালার 'আডিমণ্ডি' বলে এক কন্যা ছিলেন। তাঁর স্বামী ছিলেন চেরবংশীয় রাজকুমার, তাঁর নাম ছিল 'অট্টনঅট্টি'। প্রাচীন গাথায় আডিমণ্ডি ও অট্টনঅট্টির কথা পাওয়া যায়। গাথানুসারে এঁরা ছিলেন পেশাদারী নর্তক নর্তকী।

সঙ্গমযুগে একদল ভ্রাম্যমান পেশাদারী নর্তক-নর্তকীর ও বাদকদলের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর বাদকদলকে 'পনর', বলা হত। এদের বাদ্যযন্ত্রগুলি অদ্ভুত ধরণের হলেও এগুলি থেকে সুন্দর ও সুমিষ্ট স্বর বার হত। বাদ্যযন্ত্রের ভেতর মৃদঙ্গ ও বাঁশীজাতীয় বাদ্যযন্ত্রও ছিল। এই বাদকদলের ভেতর নর্তন নর্তকীও থাকত। এদের 'ভিরালি' বলা হত। অনুমান করা হয়, এরা আদিম উপজাতিদের বংশধর ছিল। এরা যে সকল নৃত্যগীত পরিবেশন করত তার সঙ্গে শাস্ত্রে উল্লিখিত দেশী নৃত্যের গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যদিও এদের পরিবেশিত সঙ্গীতের মধ্যে লোকগীত ও লোকনৃত্য প্রধান ছিল, তবুও মার্গনৃত্যের প্রভাবও অব্যাহত ছিল বলে মনে হয়। পরবর্তীকালে আর্যদের ভেতর প্রচলিত মার্গনৃত্য এই সকল অনার্য নৃত্যের দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। সেইজন্য সেকালে প্রচলিত মার্গ নৃত্যের সঙ্গে এই সকল নৃত্যের হয় তো সাদৃশ্য ছিল। ভিরালিদের নাচের ভেতরেও হয় তো দেশী ও মার্গ নৃত্যের সমন্বয় ঘটেছিল। পেশাদারী দলগুলি রাত্রিবেলা উন্মুক্ত প্রান্তরে নৃত্যগীতের

আয়োজন করত। একটি প্রদীপদানিতে স্থাপিত বৃহৎ প্রদীপের সাহায্যে রঙ্গভূমিকে আলোকিত করা হত। দক্ষিণ ভারতে এখনও গ্রামের মন্দিরে অথবা উন্মুক্ত প্রান্তরে নৃত্যনাট্য প্রভৃতি করবার সময় প্রদীপ জ্বালাবার প্রথা আছে। মৃদঙ্গ, বাঁশী এবং নানা প্রকার অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করা হত। গায়িকাদের বলা হত 'পদিনী'। গানের সঙ্গে নর্তক-নর্তকীরা হাতের ইশারায় ভাব প্রকাশ করত। এখনও এই রীতি অনুসরণ করতে দেখা যায়। এরা একসঙ্গে যে নৃত্য করত তাকে 'তুলাঙ্গই' ও 'আলিয়স্' (হল্লীস্) বলা হত। এরা অত্যন্ত গরীব ছিল। প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে 'হল্লীস' বা 'হল্লীসক' নৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। মনে হয় এই নৃত্য অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। এই সব নর্তকনর্তকীর দল নৃত্যে যে অঙ্গহার ব্যবহার করত প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে বর্নিত অঙ্গহারের সঙ্গে তার একটি সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় যে, পরবর্তী যুগে দক্ষিণাত্যে যে সকল লোকপ্রিয় নৃত্যনাট্য প্রচলিত ছিল তার বীজ নিহিত ছিল এই সকল প্রাচীন নৃত্যে। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে মৃদঙ্গ ও বাঁশী জাতীয় বাদ্যযন্ত্রও ছিল। বাদকদলের ভেতর নর্তকীও থাকত।

ইতিহাস :—

ভরতনাট্যম নৃত্যের ধারক ও বাহক বলতে দেবদাসী ও নট্টভনরদেরই বোঝায়। এই প্রথা দক্ষিণভারতে প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি প্রচলিত ছিল। দেখা যায় যে, দেবদাসী ও নট্টভনরদের নৃত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক ভরতনাট্যমের একটি গভীর সাদৃশ্য আছে। তাছাড়া এই নৃত্যের ও দাসীঅট্টমের পরম্পরা লক্ষ্য করে এই বিশ্বাস আরও ঘনীভূত হয়েছে। এই নৃত্যকলাকে সঞ্জীবিত রাখতে দক্ষিণের রাজাদের দান কম নয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় খৃষ্টাব্দে ভক্তিবাদের সূচনা হয়। প্রায় পঞ্চম খৃষ্টাব্দে ভক্তিবাদের প্রবল বন্যা আসে। এই সময় ভক্তিমূলক বহু নৃত্যনাট্য এবং গীতিনাট্য রচিত হয়েছিল। মন্দিরে মন্দিরে দেবদাসীদের নৃত্যের প্রচলনও অব্যাহত ছিল। এই মন্দির নৃত্য একমাত্র দেবদাসীদের জন্যই ধার্য ছিল। নট্টভনর অথবা সঙ্গীতাচার্য এই সব দেবদাসীদের শিক্ষাগুরু ছিলেন। এই সব দেবদাসী ও নট্টভনরা বহুযুগ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক দীপবর্তিকা বহন করে সাংস্কৃতিক পথকে আলোকিত করে রেখেছিলেন। এঁদের দীপবর্তিকার আলোকে

শক্তিসঞ্চার করেছিলেন কলারসিক রাজারা। কাঞ্চীপুরমের পল্লবদের (৭ম—৮ম খৃষ্টাব্দ) সঙ্গীতপ্রিয়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পল্লবদের ভেতর নরসিংহ বর্মা সঙ্গীতকলাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। পল্লবচোলরাজ পরকেশরী বর্মা চিদাম্বরমে স্বর্ণনির্মিত নটনসভা নির্মাণ করেন। ১০০৩-খৃষ্টাব্দ থেকে ১০০৭-খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজরাজা ও তাঁর পুত্র রাজেন্দ্র সঙ্গীতকলার উন্নতির জন্যে বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত কোলথুঙ্গা (১ম ও ২য়); রাজরাজন (২য়) ও কোলথুঙ্গার (৩য়) রাজত্বের সময় সঙ্গীতের গতি অব্যাহত ছিল। এই সময় চাক্কিয়াররা তামিল, সংস্কৃত ও অলঙ্কার শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হয়ে ভারতের দক্ষিণ পশ্চিমদেশে সঙ্গীতের আরাধনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। এই সময় উত্তর ভারতে বিদেশী বহিরাগতদের আগমনে বিবাদ ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হলে সঙ্গীতশাস্ত্রকার শার্ঙ্গদেব দৌলতাবাদের রাজা সিঙ্গারাদেবের আশ্রয় লাভ করেন। ইনি 'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থ রচনা করে সঙ্গীতের জগতকে বিশেষভাবে পুষ্ট করেন।

কাকতীয় রাজ্য পতনের পর গঙ্গবংশীয় প্রথম ভানুদেব এই রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করেন। ১২৬২-১২৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করবার পর ভানুদেব মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর নাবালক পুত্রের অভিভাবকরূপে পরমবৈষ্ণব নরহরি তীর্থ 'শ্রীকাকুলামে' আসবার সময় কয়েকজন দেবদাসীকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। এই সব দেবদাসীরা সুললিত কণ্ঠে জয়দেবের গীতগোবিন্দ গাইতেন এবং নৃত্য করতেন। এইভাবে দাক্ষিণাত্যেও জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রচলন হয় এবং গীতগোবিন্দের অভিনয়ের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আঞ্চলিক দেবদাসী ও নর্তকীরাও এই সব গীত শিক্ষা করেন। গীতগোবিন্দের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে অনেক ভাগবতার ও কবিরা কৃষ্ণবিষয়ক গীত ও নৃত্যনাট্য রচনা করতে লাগলেন।

চতুর্দশ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর রাজ্যের সূত্রপাত হয়। রাজা কৃষ্ণদেবের রাজত্বের সময় আবার সঙ্গীতকলা চারদিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। এই সময় রাজারা মন্দিরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দেবদাসীদের নৃত্য ছিল মন্দির কেন্দ্রিক। এই নৃত্যের একমাত্র শ্রেষ্ঠ দর্শক ছিলেন মন্দিরের দেবতা। রাজা ও তাঁর অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিরা এই প্রসাদ লাভ করতে পারতেন। অর্থাৎ তাঁরাও এই নৃত্য দর্শনের সৌভাগ্য লাভে ধন্য হতেন।

প্রচারধর্মী ছিল না বলেই জনসাধারণের সঙ্গে এই নৃত্যকলার কোন পরিচয় ছিল না। কালক্রমে দেবদাসীপ্রথা বিপথগামী ও বিপন্ন হলে নট্টুভনররা জীবিকার্জনের জন্তে মন্দিরের বাইরেও নৃত্যশিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। অপরপক্ষে দেবদাসীরা মন্দিরের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে পরিণত হলেন এবং জনগণের ঘৃণা ও অবজ্ঞার কেন্দ্রস্থল হলেন। এই সময় ভক্তিবাদের প্রাবল্যে ভক্তিমূলক নাটক রচনা হতে লাগল এবং সেগুলি ধর্ম-প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে লাগল। এই সকল নৃত্যনাট্য ও সঙ্গীত রচয়িতা ব্রাহ্মণ ভাগবতাররা ধর্ম ও ঈশ্বরবাদে একনিষ্ঠ প্রেম ও ভক্তি, শিল্পকলার প্রতি নিষ্ঠা, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও চাতুর্যের দ্বারা জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করতে লাগলেন। এতে নৃত্যকলার সঙ্গে জনসাধারণের একটি গভীর সংযোগ স্থাপিত হ'ল। নৃত্যনাট্যগুলিও জনপ্রিয় হয়ে উঠল। ভাগবতাররা তাঁদের রচনায় দেশী ও মার্গসঙ্গীতের অপূর্ব সমাবেশ করতে লাগলেন। যদিও সঙ্গীত ও অন্যান্ত বিষয়ে পবিত্রতা রক্ষায় এঁরা তৎপর ছিলেন তবুও দেবদাসীদের শিল্পকলার ঐতিহ্যকে যে অগ্রাহ্য করেন নি, তা অনুমান করা যায়। এই সকল কারণে ভরতনাট্যম বলতে শুধুই দাসী অট্টম নয়। পরিধি আরও বিস্তৃত। এর ভেতর 'কুচিপূড়ী'. 'ভাগবতমেলা নাটক', 'কুরুভঞ্জী' প্রভৃতি নৃত্যনাট্যকেও গণ্য করা হয়।

অবশ্য 'দাসী অট্টম' অন্যান্ত নামেও অভিহিত হয়ে থাকে, যথা—চিন্নমেলম্, সাদীর নৃত্য, তাঞ্জোর নৃত্য ইত্যাদি।

বিজয়নগর রাজ্যের পতনের পর অনেক নৃত্যশিল্পী, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ তাঞ্জোর রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঞ্জোররাজ অচ্যুথাপ্পা নায়ক সাদরে এঁদের আশ্রয় দেন (১৫৭২ খৃষ্টাব্দে)। এঁর উত্তর পুরুষ রঘুনাথ নায়ক এবং বিজয়রাঘভুলু নায়কের রাজত্বকালে (১৬১৪-১৬৭৩ খৃঃ) অন্ধ্রদেশীয় সাধু তীর্থনারায়ণ যোগী ও ক্ষেত্রায়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তীর্থনারায়ণকে 'ভাগবতমেলা নাটকের' শ্রষ্টা বলা হয়।

নায়কদের হাত থেকে রাজশক্তি মহারাষ্ট্রীয় রাজাদের হাতে চলে যায়। তাঞ্জোরের মহারাষ্ট্রীয় রাজা তুলযাজী সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তুলযাজী তিরিভেলী থেকে একজন দক্ষ ভরতনাট্যম নৃত্যশিল্পীকে রাজসভায় আনেন। এঁর নাম ছিল মহাদেব আন্নাভি।

আরাভি তাঞ্জোর রাজসভায় আসবার সময় তাঁর দুজন শিষ্যাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। এঁরা বনজাক্ষী ও মুথুমন্নর নামে পরিচিত। প্রতাপসিংহ ও তুলযাজীর রাজত্বকালেই ভেঙ্কটরাম শাস্ত্রীর আবির্ভাব হয়। মহাদেব আরাভি 'ভরতনাট বিধান' নামে বিশেষ ভাবে সম্মানিত হন। রচয়িতা ও শিক্ষাগুরু হিসেবে ইনি বিশেষভাবে খ্যাতিলাভ করেন। তাঞ্জোরের বিখ্যাত চার ভাই চিন্নাইয়া, পুন্নাইয়া, ভেডিভেলু ও শিবানন্দম ভরতনাট্যম নৃত্যের নবরূপ দেন। এঁদের পিতা সুব্বারাও তাঞ্জোরাধিপতির দাক্ষিণ্য লাভ করেন।

১৭৪৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সারফোজী ও ১৮২৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিবাজীর রাজত্বকালে সঙ্গীতের বিশেষ উন্নতি হয়। কথিত আছে যে, এঁদের রাজত্বকালে প্রায় একশ বছর পূর্বে চিন্নাইয়া, পুন্নাইয়া, বেডিভেলু ও শিবানন্দম্ আধুনিক ভরতনাট্যম্ নৃত্যের সংস্কার করেন। ত্রিবাঙ্কুররাজ স্বাতী তিরুমল একজন সঙ্গীতজ্ঞ ও গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি বেডিভেলুকে তাঁর রাজসভায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। এই সময় কুরুভঞ্জী নৃত্যনাট্যের ওপর ভিত্তি করে 'সারফোজী কুরুভঞ্জী' রচিত হয়। তাঞ্জোররাজ চিন্নাইয়ার নৃত্য দেখে অতিশয় মুগ্ধ হন এবং পুরুষদের এই নৃত্যে পারদর্শী করবার জন্য বিশেষ উৎসাহ দেন। চিন্নাইয়া, পুন্নাইয়া, শিবানন্দম্ ও ভেডিভেলু যারা ভরতনাট্যম নৃত্যের সংস্কার হবার পূর্বে এর রূপ ছিল একটু অন্যরকম। তাতে নৃত্তের অংশ খুবই কম ছিল। নৃত্যে কৌস্তভম্ অথবা 'কবিত্বম' প্রদর্শিত হত। এই ভ্রাতৃচতুষ্টয় নৃত্যের সঙ্গে সমান অংশে নৃত্তের যোগ করলেন। এর ফলে এই নৃত্য আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

এঁরা কর্ণাটক সঙ্গীতে বেহালার প্রবর্তন করেন এবং এঁদের সময় তিল্লানা নৃত্ত সংযোজিত হয়। এঁদের নৃত্য পদ্ধতি পরবর্তীকালে পাণ্ডানাল্লুর পদ্ধতি বলে পরিচিত হয়। বিখ্যাত নৃত্যগুরু মিনাক্ষী পিল্লাই পুন্নাইয়ার দৌহিত্রের পুত্র।

দক্ষিণভারতের মাদ্রাজ অঞ্চলে নৃত্য যে বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল তার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকটি বিশেষ পুজোয় নৃত্য অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। অতি প্রাচীন মুরুগণ পুজোতে নৃত্য করা হত। পরবর্তীকালে

শিকারীদের কোরাভাইয়ের পুজো, গোপালিকাদের কৃষ্ণপুজো প্রভৃতির ভেতর নৃত্যগীতের আয়োজন করা হত। এই সকল পুজোতে অনুষ্ঠিত নৃত্যগুলি সাধারণতঃ সমবেতভাবে করা হত। এছাড়া আল্লিয়স, (কংসের হাতী কুবলয়পদ বধ), কুদম্ (কৃষ্ণের ছদ্মবেশে বাণরাজের নগরে গিয়ে নৃত্য), পাবৈ (বিষ্ণুর মোহিনীরূপ ধারণ করে অসুরদের হৃদয় হরণ), কডয়ম্ (বাণরাজ্যে ইন্দ্রানীর নৃত্য), ইত্যাদি একক নৃত্যও প্রচলিত ছিল। এগুলিকে কুথ্ বলা হয়। শিলপ্পদিকরণ ও অন্যান্য তামিল গ্রন্থে এদের কুথুই বলা হয়েছে। এই কুথ্ দুভাগে বিভক্ত ছিল—আহ কুথ্ ও 'পুরা' কুথ্। আহ কুথুতে প্রেমের উপাখ্যান ও 'পুরা' কুথুতে যুদ্ধের উপাখ্যান স্থান পেত। কথিত আছে যে এগারো রকম কুথুর প্রচলন ছিল।

নৃত্যনাট্য—ভক্তিযুগে যে সব নৃত্যনাট্য রচিত হয়েছিল তার ভেতর ব্রাহ্মণমেলা, শিবলীলা, নট্টুভমেলা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সব নৃত্যনাট্য পরবর্তীকালে ভিন্ন ভিন্ন নাম নিয়েছে। প্রতিভাশালী কবি অথবা নাট্যকাররা এতে বহু সংযোগ বিয়োগ করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে 'ভাগবতমেলা' 'কুচিপুড়ী,' 'যক্ষগণ' প্রভৃতি নৃত্যনাট্যগুলি প্রাচীন নৃত্যনাট্যগুলির পরিণত অবস্থা। এই সকল নৃত্যনাট্যগুলির প্রবর্তকরা ভ্রাম্যমান পণ্ডিত ছিলেন। তাঁরা একাধারে কবি, নৃত্যজ্ঞ ও নাট্যশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। এঁরা রাজা-মহারাজদের দাক্ষিণ্যলাভ করে গ্রামে স্থিতি লাভ করেন। এঁদের অক্লান্ত চেষ্টায় নৃত্যনাট্যগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এইজন্যে ষোড়শ শতাব্দীর নৃত্যের ইতিহাস বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই যুগে আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য উভয় দেশেই সব রকম শিল্পকলাতে প্রাণসঞ্চার হয়েছিল। দক্ষিণে ভাগবতাররা কলাদেবীর আরাধনা করে প্রাচীনকলাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলেন। যাঁরা কথকতা করতেন অথবা জনসাধারণের সম্মুখে জীবিকা হিসেবে ভাগবতের গান করতেন তাঁদের তামিলনাদে 'ভাগবতার' এবং অন্ধ্রপ্রদেশে 'ভাগবতালু' বলা হত। 'কথকতাকে 'কালক্ষেপম' বলা হত। এই সময় সঙ্গীতের দুটি ধারা পাশাপাশি চলতে থাকে একটি নৃত্যনাট্য, কথকতা ইত্যাদি যার সঙ্গে জনসাধারণের একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। অপরটি মন্দিরের দেবদাসী নৃত্য। দেবদাসীদের নৃত্য-কলার সঙ্গে ভাগবতারদের নৃত্যকলার একটি পার্থক্য ছিল। ভাগবতাররা একটি গোষ্ঠী তৈরী করেছিলেন যার উদ্দেশ্য ছিল বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার। সেইজন্য

সমস্ত মালিন্য থেকে এই নৃত্যকলাকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁরা দেবদাসীদের সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকলেন বটে, কিন্তু শিল্পকলায় তাঁদের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেন নি। এমন কি নট্টুভনররাও এতে অংশ গ্রহণ করতে পারতেন না। কারণ তাঁরা ব্রাহ্মণ ছিলেন না।

কুচিপুড়ী—কৃষ্ণা নদীর তীরে কুচ্চেলপুরম গ্রাম থেকে এই নৃত্যের উদ্ভব হয় বলে এর নাম কুচিপুড়ী। কুচ্চেলপুরম্ গ্রাম পরবর্তীকালে 'কুচিপুড়ী' বলে অভিহিত হয়। আসলে অন্ধ্রে কুচিপুড়ীর উদ্ভব। কনকলিঙ্গেশ্বর রাও 'কুচিপুড়ী নামকরণের একটি সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। সিদ্ধেন্দ্রযোগী 'ভামকালপম' রচনা করে তার রূপায়ণের জন্যে একদল ব্রাহ্মণ বালক মনোনীত করেন এবং স্ত্রী-লোকদের জন্যে তা নিষিদ্ধ করেন। এই ভ্রাম্যমান ব্রাহ্মণ বালকদের বলা হত 'কুচিলু'। 'কুচিলু' কুশীলবের অপভ্রংশ। এই সব ব্রাহ্মণ বালকরা যে গ্রামে বসতি স্থাপন করেন তা 'কুচেলাপুরী' বলে খ্যাত। সুতরাং বলা যেতে পারে যে কুচেলাপুরমের নামকরণও কুচিলু থেকে হয়েছে। আরও পরবর্তীকালে 'কুচিপুড়ী' নাম হয়েছে। সিদ্ধেন্দ্র যোগীর সব থেকে শ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে 'ভামকালপম'। কৃষ্ণের স্তুতিমূলক কতকগুলি গানের গুচ্ছকে 'ভামকালপম' বলা হয়েছে। 'ভামকালপমে' তিনি কৃষ্ণকে লোকভর্তা এবং নিজেকে সত্য ভামা কল্পনা করে সত্যভামার প্রেমের আস্বাদন করেছেন। নৃত্যকুশলা শ্রেষ্ঠা দেবদাসীরা এই অনুপম্ ভামকালপম্ শিখতে চাইলে সিদ্ধেন্দ্রযোগী তা অনুমোদন করেন নি। তিনি স্ত্রীচরিত্র রূপায়ণেও পুরুষদের প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এতে কোন ব্যভিচারিতা প্রবেশ করতে পারে বলে এতে স্ত্রীলোকদের অভিনয় তিনি নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি কয়েকজন ব্রাহ্মণ বালককে ভামকালপম্ শিক্ষা দিয়ে জনসমক্ষে তা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণরা নর্তক হতে চাইলেন না। সিদ্ধেন্দ্র যোগী তাঁদের নৃত্যের মহিমা ব্যক্ত করে বললেন যে, এর দ্বারা মোক্ষলাভ করা যায়। নৃত্যে গুরুত্ব আরোপ করবার জন্যে তিনি বললেন, প্রত্যেক অভিনেতাকে বেদ, শাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র ও সঙ্গীত শিক্ষা করতে হবে এবং তিনবার সন্ধ্যা বন্দনা করতে হবে। এতে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণরা বিরুদ্ধাচারণ করলে সিদ্ধেন্দ্র যোগী নর্তকদের নিয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসতি স্থাপন করেন। এই জায়গাটি কুচ্চেলপুরম্ বলে খ্যাত হয়। নৃত্যনাট্যগুলি বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠলে বিজয়নগরের মহারাজ বীর নরসিংহ দেবরায়

১৫০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর রাজদরবারে এই সব শিল্পীদের নিমন্ত্রণ করেন এবং তাঁদের নৃত্যকলায় বিশেষ সন্তুষ্ট হন। এখনও পর্যন্ত দেখা যায়, ব্রাহ্মণদের ভেতর এক শ্রেণী বংশগত অধিকার সূত্রে এই কলার চর্চা করেন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করেন ও রাজামহারাজদের দ্বারা প্রদত্ত তালুকের বিষয়সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগ করেন।

কুচীপুড়ী নৃত্যনাট্যের ভেতর 'পারিজাত হরণ' বা 'ভামকালপম' বিশেষভাবে খ্যাত। সাধারণতঃ তিনরাত্রি ধরে এই সব নৃত্যনাট্যের আয়োজন হত। এর একটি ধর্মগত কারণও আছে। পদ্মপুরাণে আছে যে, নবরাত্রি জাগরণ করে বিষ্ণুর সামনে হৃষ্টচিত্তে করতাল বাদ্য, নৃত্য-গীতাদি পরিবেশন, কৃষ্ণ চরিত্র পাঠ, শাস্ত্রালোচনা, তিল, প্রদীপ প্রজ্বলন, প্রসন্ন ভাব, ভক্তিভাবের উন্মেষ প্রভৃতির দ্বারা আরাধনা করতে হয়। রাত্রিজাগরণের এই রকম বারোটি বিধি আছে। সেইজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভক্তিমূলক নাটকগুলি রাত্তিরেই অনুষ্ঠিত হত। এক রাত্তিরে এই নৃত্যনাট্যগুলি শেষ হত না। সেইজন্যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নাটকগুলি কয়েক রাত্রি ধরে অনুষ্ঠিত হত।

কুচিপুড়ী নৃত্যনাট্যে অভিনেতারা স্বয়ং গান করেন এবং তার সঙ্গে নৃত্য করেন। কুচিপুড়ী নৃত্য নাট্যকে নাট্যধর্মী বলা যেতে পারে। কারণ এতে পুরুষরাই নারীচরিত্র অভিনয় করেন। নৃত্যনাট্য আরম্ভ হবার পুর্বে চারটি বেদ থেকে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়। এর পর নর্তক পুণ্যাহ বারিসিঞ্চণে রঙ্গমঞ্চকে পবিত্র করেন। রঙ্গ দেবতার সম্মুখে ৫৮ টি প্রদীপ প্রজ্বলিত করা হয় এবং ধুপ দেওয়া হয়। এর পর দর্শকদের শুভকামনা করে ফুল দেওয়া হয় এবং রঙ্গমঞ্চে ইন্দ্রের বিঘ্ননাশক জর্জর স্থাপন করা হয়। জর্জর স্থাপনের পর গণেশ প্রবেশ করে শিল্পীদের আশীর্বাদ করেন। আশীর্বাদের পর 'অম্বা' অথবা গুরু প্রার্থনা করে নান্দীস্তোত্র পাঠ করা হয়। এর পর সূত্রধার 'কুটিলক' দণ্ড ধারণ করে গুরু প্রার্থনা করেন এবং দর্শকদের অভিবাদন করে বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দান করেন। তারপর নৃত্যাভিনয় সুরু হয়। 'ভাগবত মেলা নাটকের' মত এতেও 'কোণাঙ্গী প্রবেশ', 'পাত্র প্রবেশ', 'দারু' প্রভৃতি আছে।

'ভাগবত মেলা নাটক'—কুচিপুড়ী নৃত্যের সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলে আসছে। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে অচ্চুথাপ্পা নায়ক 'অচ্চুথাপুরম' গ্রামটি ১৫০ জন ব্রাহ্মণকে অনুদান হিসেবে দেন। এই গ্রামটি পরবর্তীকালে

অন্নদাপুরম' এবং তারও পরে 'মেলাটুর' নামে পরিচিত হয়। ভেঙ্কটরাম শাস্ত্রীর সময় মেলাটুর গ্রামের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর পাশাপাশি গ্রামগুলিও এই ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হয়ে নৃত্যকলার চর্চা আরম্ভ করে। 'শূলমঙ্গলম,' 'উথুকত্তু,' 'শৈলমঙ্গলম' এবং তেপেরুমনল্লুরে' এই নৃত্যনাট্যের চর্চা সুরু হয়। কিন্তু ধীরেধীরে ভাগবতারদের মৃত্যুতে প্রায় সকল গ্রাম থেকেই এই নৃত্যকলা লুপ্ত হয়ে যায়। কেবলমাত্র মেলাটুর গ্রামে এর অস্তিত্ব থাকে। এই মেলাটুর গ্রামেই ভেঙ্কটরাম শাস্ত্রী জন্মগ্রহণ করেন। তবে তীর্থনারায়ণ যোগীকে ভাগবতমেলা নাটকের স্রষ্টা বলা হয়। এর পূর্বেও যে নৃত্যনাট্যের প্রচলন ছিল তা অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দীর শিলালিপি থেকে জানা যায়। 'ভাগবত মেলা নাটকের "প্রহ্লাদ চরিত্র" নাটকটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এতে 'কোনাঙ্গী বা ভাঁড় প্রবেশ করে হাস্যরসের অবতারণা করে সকলকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করে। বাদ্যবৃন্দের সঙ্গে দেবতার আরাধনার পর সর্ব বিঘ্ননাশকারী গণেশের নৃত্য হয়। গণেশ নৃত্যের পর 'পাত্র প্রবেশম' এযে গীত ও নৃত্য হয় তাকে 'দারু' বলা হয়। এরপর নৃত্যনাট্য আরম্ভ হয়। এতেও শব্দম্, পদবর্ণম, তিল্লানা প্রভৃতি থাকে।

কুরুভঞ্জী—তামিলনাদে আর একরকম নৃত্যনাট্যের প্রচলন ছিল। একে 'কুরুভঞ্জী' বলা হত। এই নৃত্যে পুরুষরা অংশ গ্রহণ করেন না। কেবলমাত্র ছয়জন থেকে আটজন নর্তকী এতে অংশ গ্রহণ করেন। একটি বিরহকাতরা প্রেমিকার কাহিনী অবলম্বনে এই নৃত্যনাট্য রচিত। এতে নায়ক, কোন রাজা অথবা অদৃশ্য দেবতা। একটি যাযাবর নারী প্রেমিকার হস্তরেখা বিচার করে নায়িকার কল্পিত প্রেমিকের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করে। এই নৃত্যনাট্যে যাযাবর নারীচরিত্রটি বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। কথিত আছে যে, প্রাচীনকালে বিশ বা কুড়ি রকমের কুরুভঞ্জীর প্রচলন ছিল। তার ভেতর অষ্টাদশ শতাব্দীতে তিরুকুডা রাজাপ্পা কবিরাজের দ্বারা রচিত 'কুত্রলা কুরুভঞ্জী,' 'সারফোজী কুরুভঞ্জী' 'ধীরলি কুরুভঞ্জী' বিশেষভাবে খ্যাত। কুরুভঞ্জী ও সাদীর নৃত্যে অব্রাহ্মণ শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেন। এর পরিচালক, শিক্ষাগুরু, এবং অন্যান্য সকলেই অব্রাহ্মণ হন। অপরপক্ষে 'ভাগবত মেলা' ও 'কুচিপুড়ী' নাটকে অব্রাহ্মণরা অংশ গ্রহন করতে পারেন না। সুতরাং বিকল্প হিসেবে যে দেব-দাসীরা কুরুভঞ্জী নৃত্যনাট্যে অংশ গ্রহণ করতেন তা স্পষ্ট বোঝা যায়। বেডি

ভেলুর সময় 'কুত্রলা' কুরুভঞ্জীর উৎপত্তি হয়। 'কুত্রলা' কুরুভঞ্জীর ওপর ভিত্তি করে 'সারফোজী' কুরুভঞ্জী রচিত হয়।

আডাভু—ভারতনাট্যম্ শিখতে হলে প্রথমেই আডাভুর অভ্যেস করতে হয়। এতে নৃত্তহস্ত, পাদভেদ, স্থানক, চারী, রেখা ও সৌষ্ঠবের সমন্বয় হয়ে থাকে। এগুলি পরিপূর্ণ ভাবে আয়ত্তে এলে নৃত্যের পরবর্তী অংশগুলি শিখতে হয়। একে ভরতনাট্যম্ নৃত্যের ভিত্তিপ্রস্তর বলা যেতে পারে। এগুলি কতকগুলি অংশে বিভক্ত। এই অংশ বা পর্যায়গুলি কতকগুলি নৃত্তহস্ত, পাদভেদ, স্থানক,চারী, রেখার গুচ্ছ নিয়ে সৃষ্টি।—সাধারণতঃ বলা হয় যে এই রকম পর্যায় বা গুচ্ছের সমষ্টি পনেরো রকমের'। (১) সমস্ত পদতল ভূমিতে স্থাপন করে নৃত্য করাকে 'তাত্তু' বলা হয়। (২) পা এগিয়ে গোড়ালির দ্বারা আঘাত করাকে 'নাট্টু' বলা হয়। (৩) প্রথমে পায়ের পাঞ্জা ভূমিতে রেখে তারপর গোড়ালি দিয়ে আঘাত করাকে 'মেত্তু' বলে। (৪) একটি পায়ের পেছনে আর একটি পা পাঞ্জার ওপর রাখলে 'কাত্তু' বলা হয়। (৫) পাঞ্জার ওপর লাফিয়ে গোড়ালির দ্বারা আঘাত করাকে 'কুদিত্তিমেত্তু' বলে। (৬) 'মুদি' বা 'মুকয়'—নৃত্যের শেষে তেহাইয়ের মত ব্যবহৃত হয়। (৭) পই আডাভু—হালকা ভাবে সামনে লাফিয়ে আবার স্বস্থানে গেলে 'পই আডাভু বলে। (৮) হাঁটু ভূমিতে স্পর্শ করে বসলে 'মাণ্ডি' হয়। (৯) ছক কাটা ছন্দের গুচ্ছকে 'আরুদি' বলা হয়। বর্ণম্ অথবা তিল্লানায় ব্যবহৃত হয়। (১০) আডাভুতে দেহকে সামনের দিকে ঝোঁকালে 'মায়' বলা হয়। হেঁটে চলার ভঙ্গিকে 'নাডে' বলা হয়। (১১) একটি পা পেছনে ঠেলে বা পিছলিয়ে অর্ধেক বসার ভঙ্গিতে দাঁড়ালে 'সরকল' বা 'জক' বলা হয়। এই এগারোটি ছাড়া আরও কতকগুলি আডাভুর কথা বলা হয়েছে, যেমন যতি, তাণ্ডব, রঙ্গক্রমণ, একপদ তাণ্ডব, ইত্যাদি।

এখানে আডাভুয়ে শোল্কট্টুশের কতকগুলি নমুনা দেওয়া হল।

—তেই উম্ দৎ তা।

—তেই কৎ তেই ই।

—তাদি গিনা তোম্—

—আদিতালের ১ম মাত্রা থেকে পঞ্চম

মাত্রার মধ্যে শেষ করতে হয়।

—তেই তেইউম ইত্যাদি।

ভ্রমরী আড়াভুতে ঘুরতে হয়। উৎপ্লবন হচ্ছে লাফানোর ভঙ্গি। রঙ্গক্রমণের অর্থ হচ্ছে মঞ্চের বিভিন্নদিকে পরিক্রমণ করা। 'একপদ' বলতে ডানদিকে ও বামদিকে পর্যায়ক্রমে ঘোরা। তাণ্ডবকে উদ্ধত নৃত্য বলা হয়।

ভরতনাট্যম নৃত্যকে ছয়টি অংশে ভাগ করা হয়েছে—

(১) আলারিপু (২) যতিস্বরম (৩) শব্দম (৪) তিল্লানা (৫) বর্ণম (৬) পদম।

আলারিপু—সবথেকে সরল ও সংক্ষিপ্ত অংশ। এই অংশে রঙ্গদেবতাকে প্রণাম ও সমাগত দর্শকমণ্ডলীকে অভিবাদন জানানো হয়। এতে পুষ্পের কলির মত গ্রীবারেচক, হস্তরেচক, বর্তনা ও আড়াভুর দ্বারা দেহকে বিকশিত করে তোলা হয়। অর্থাৎ পুষ্পকলি ধীরে ধীরে যেমন নিজেকে বিকশিত করে শিল্পীও সেইরকম অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভিন্ন ক্রিয়ার দ্বারা নৃত্যকে বিকশিত করেন। একে 'নৃত্যারম্ভ' বা 'পূর্বপ্রস্তুতি' বলা যেতে পারে। এতে লয় ও ছন্দকে প্রতিষ্ঠিত করতে সোল্লকট্টুশের ব্যবহার হয়।

যতিস্বরম—এই অংশটি সম্পূর্ণ নৃত্তপর্যায়ভুক্ত ও জটিলতর। এতে যতি ও রাগের সমন্বয় হয়। কোন বিশেষ তালের ছন্দের সঙ্গে স্বরগ্রামগুলিকে গ্রথিত করা হয় এবং তার সঙ্গে যতরকম সম্ভব অঙ্গহারের সমন্বয় করা হয়। এই অঙ্গহারগুলি কোন ভাবের দ্যোতক নয় অথবা এতে কোন অভিনয় থাকে না। যতির সঙ্গে স্বরগ্রামের গ্রন্থন হয় বলে একে 'যতিস্বরম' বলা হয়।

শব্দম—নৃত্যাভিনয়ের প্রথম রসাস্বাদন হয় শব্দমে। সুন্দর সুন্দর পদম বা গানের সাহায্যে অভিনয় প্রদর্শন করা হয়। এতে দেবতা অথবা রাজার স্তুতি করে যশোগান করা হয়। সঞ্চারীভাবের সাহায্যে একই অর্থকে বিভিন্ন-ভাবে প্রদর্শন করা হয়।

বর্ণম—এই অংশটি ভরতনাট্যমের সব থেকে জটিল ও দীর্ঘতম অংশ। এর ভেতর নৃত্য ও নৃত্ত সমানভাবে কাজ করে। গানের প্রতিটি পংক্তি সুন্দর তাললয়ে বিভিন্ন মুদ্রা ও অভিনয়ের সাহায্যে গীত হয়। মধ্যে মধ্যে স্বরগ্রামের সঙ্গে যতি অথবা তিরমান্নমও করা হয়। এতে নৃত্যের রীতি সম্পূর্ণভাবে মেনে চলতে হয়; অর্থাৎ পায়ের দ্বারা কঠিন তালপ্রবন্ধ, হাতের দ্বারা সঙ্গীতের অর্থ ও মুখমণ্ডলের দ্বারা অভিনয় করা হয়ে থাকে। এতে শিল্পীর চাতুর্য, প্রতিভা এবং শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

বর্ণের ভেতর কতকগুলি ভেদ আছে ; যেমন পদবর্ণম, তানবর্ণম, চোক বর্ণম ইত্যাদি। পদবর্ণমে সাহিত্যের সঙ্গে তিরমমমের সংযোগ হয়েছে। তানবর্ণম দ্রুত ছন্দে করা হয়। এতে তিরমমম ও সমগম্ থাকলেও সাহিত্যের প্রাধান্ত নেই। চোকবর্ণম অতি ধীর লয়ে করা হয়।

তিল্লানা—এই নৃত্য নৃত্ত পর্যায়ভুক্ত। 'তারানা' গানের সঙ্গে এই নৃত্য করা হয়ে থাকে। এতে গানের সঙ্গে ছন্দের বৈচিত্র্য একটি অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি করে। এর অন্তে 'গণেশ বন্দনা' থাকে। যতি ও বড় বড় তিরমায়মের সঙ্গে বিভিন্ন করণ, চারী প্রভৃতির সংযোগ হয়। 'তিল্লানা' উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের অন্তর্গত। প্রায় দেড়শো থেকে দুশো বছর পূর্বে উত্তর ভারতের কয়েকজন সঙ্গীতগুণী দক্ষিণভারতে আসেন এবং তখনই এই গান কর্ণাটক সঙ্গীতে স্থান পায়। পুন্নাইয়া পিল্লাইয়ের সময় 'তারানা' গান দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যে সংযোজিত হয় এবং তাঁর পরিবারস্থ চারজন নট্টুভনর তাঁদের শিষ্যদের এই শিক্ষা দেন।

পদম—নৃত্যের শেষ অংশে পদম্ প্রদর্শিত হয়। পদমে যে সকল গীত সংযোগ করা হয় তার অধিকাংশই প্রেমসঙ্গীত। নায়কের সঙ্গে নায়িকার মিলিত হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি পদমের ভেতর ব্যক্ত করা হয়। পদমে ভাবের তীব্র অনুভূতিতে রসের সঞ্চার হয়। ক্ষেত্রায়ার পদাবলী ও জয়দেবের অষ্টাপদীও পদমে গীত হয় এবং মুখাভিনয়ে সবথেকে উপযোগী। পদমে রসনিষ্পাদন সার্থক হয়। ভরতনাট্যম নৃত্য একাধারে সাহিত্য, ভাস্কর্যের সৌন্দর্যে, শাস্ত্রের অনুশাসনে ও রসের অভিব্যক্তিতে রূপময় হয়ে ওঠে।

ভরতনাট্যম নৃত্যে বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে মৃদঙ্গ প্রধান। তালের গতি নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে মন্দিরা বাজান হয়। একে 'ঝালর' অথবা 'তালম' বলা হয়। এ ছাড়া বাঁশী, বেহালা, তম্বুরা, মুখবীণা, নাগেশ্বরম্ প্রভৃতিও সহযোগিতা করে। প্রাচীনকালে কথক নৃত্যের মত ভরতনাট্যম নৃত্যেও যন্ত্রীরা নৃত্যশিল্পীর কাছে দাঁড়িয়ে সহযোগিতা করতেন। প্রাচীন কথাকলি নৃত্যেও এই প্রথা দেখা যায়।

ভরতনাট্যম্ নৃত্যে যুগান্তকারী ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের প্রযোগ্য অধিকারী হচ্ছেন পাণ্ডানাল্লুরের মীনাক্ষীসুন্দরম্ পিল্লাই। এঁর সুযোগ্য শিষ্য এবং শিষ্যারা ভরতনাট্যম নৃত্যের গৌরবকে শতগুণ বর্ধিত করেছেন। নৃত্যের সংস্কারক

হিসেবে শ্রীকৃষ্ণ আয়ারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি একজন আইনবিশারদ হয়েও নৃত্যানুরাগী ছিলেন। ভরতনাট্যম নৃত্যকে জনসাধারণে প্রচার করবার জন্তে তিনি স্বয়ং স্ত্রীলোক সেজে নৃত্য করেন। এই প্রসঙ্গে বালাসরস্বতীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বালা সরস্বতী দেবদাসীবংশোদ্ভূত। দেবদাসী নৃত্যের সঠিক ধারাটিকে তিনিই বহন করেছিলেন। এ ছাড়া রুক্মিনী দেবী, রামগোপাল, শান্তা রাও, মৃণালিনী সারাভাই, ইন্দ্রানী রেহমান, কমলা লক্ষণ, রিতা চ্যাটার্জি প্রভৃতির নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কথাকলি

"নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া
স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া
বরণ করি ;
তুমি আছ মোর জীবন মরণ
হরণ করি।"

রবীন্দ্রনাথ

কথাকলি

কথাকলি নৃত্যের গৌরব বহন করছে দক্ষিণ-ভারতের পশ্চিম উপকূলে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার প্রান্তদেশে আরব সাগরের উপকূলে তালবৃক্ষরাজি-শোভিত আধুনিক কেরালা রাজ্যটি। রাজ্যটি ক্ষুদ্রায়তন বটে, কিন্তু শিল্পকলা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীনকালে এই রাজ্যটির আয়তন ছিল কুমারিকা অন্তরীপ থেকে উত্তরে ম্যাঙ্গালোর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই রাজ্যের চের, ও পেরুমল রাজারাও শিল্পকলা, সাহিত্য ও রাজনীতিতে নিজেদের শিল্পপ্রীতির স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। ইতিহাসের কালস্রোতে তা আজও ম্লান হয় নি।

কথাকলি নৃত্যের ইতিহাস—

কেরালার কথাকলি নৃত্য বহু স্তর অতিক্রম করে আধুনিক রূপ পেয়েছে। এই স্তরের পটভূমিকায় শাস্ত্রীয়, সামাজিক ও সামরিক নৃত্যের উল্লেখ করা যেতে পারে।

কেরালা রাজ্যটি অতি প্রাচীন। এই রাজ্যটির প্রাচীনত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রন্থ 'শিলপ্পদিকরণে'। এতে আছে যে, যখন চেররাজ সেঙ্কুত্তভন্ নীলগিরির কাছে সৈন্যশিবির খুলেছিলেন, সেই সময় ত্রিবাঙ্কিকুলমের পাক্কর থেকে চাক্কিয়াররা এসে নৃত্য ও মূকাভিনয়ের দ্বারা রাজার মনোরঞ্জন করেছিলেন। কথাকলি নৃত্যে এই চাক্কিয়ারদের দান বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এই চাক্কিয়াররাই সঙ্গীত শাস্ত্রে সংস্কৃতনাটক প্রভৃতিতে সূতপুত্র বলে পরিচিত। সূতপুত্রের ব্যাখ্যা পূর্বে করেছি। কেরালায় সূতপুত্ররা 'চাক্কিয়ার' এবং সূতকন্যারা 'নাঙ্গিয়ার' নামে অভিহিত হতেন। এঁরা সমাজে নটনটী হিসেবে স্বীকৃতি পেতেন। চাক্কিয়ারদের কথকতাকে 'চাক্কিয়ার কুত্তু' বলা হত। চাক্কিয়াররা নাট্যশাস্ত্রজ্ঞ ও সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। তাঁদের দ্বারাই কেরালার নৃত্যনাট্যকলা কালের কবল থেকে রক্ষা পেয়ে আজও অব্যাহত আছে।

চাক্কিয়াররা নিজেদের দেবদাস বলে পরিচয় দেন। দেবদাসীদের মত তাঁরাও মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত নাটকে নৃত্য, গীত ও অভিনয় প্রভৃতির দ্বারা

দেবতা ও সুধীজনের মনোরঞ্জন করতেন। মন্দিরের এই নৃত্যপ্রাঙ্গণকে "কুথম্বলম্' বলা হত।

কুডিয়াট্টমে চাকিয়াররা সমবেত ভাবে নৃত্যাভিনয় করতেন। এতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই অংশ গ্রহণ করতেন। কুডিয়াট্টমে কেবলমাত্র সংস্কৃত নাটকই অভিনীত হত এবং উচ্চবর্ণের ভেতরই এর প্রচলন ছিল। নৃত্যনাট্যের কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল যা প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে দেখতে পাওয়া যেত না। সেইজন্য সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে এর সামান্য প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। পোষাক পরিচ্ছদ, মুখচিত্রণ, প্রজ্বলিত দীপ, যুদ্ধের দৃশ্য, রক্তপাত, প্রভৃতি সংস্কৃতনাটকে দেখতে পাওয়া যেত না। বিশেষ করে রক্তপাত, মৃত্যুর দৃশ্য সংস্কৃত নাটকে বর্জনীয়। কুডিয়াট্টমে বিদূষকই একমাত্র মুখ্য শিল্পী। বিদূষক তাঁর প্রখর বুদ্ধি, তীব্র শিল্পানুভূতি, গভীর শিল্পচাতুর্যের দ্বারা সমস্ত নাটকটিকে জমিয়ে রাখতেন। যদিও কুডিয়াট্টম সংস্কৃত ভাষায় অনুষ্ঠিত হত, তবুও গ্রামবাসীদের বোধগম্যের জন্যে বিদূষক 'মালয়ালম' ভাষায়ও নাটকের ব্যাখ্যা করতেন। কুডিয়াট্টমের অভিনয়ের দ্বারাই কথাকলি নৃত্য পুষ্ট হয়েছে। কুডিয়াট্টমের অভিনয় দীর্ঘদিন ধরে চলত। 'নাগানন্দ', 'আশ্চর্যচূড়ামণি' নাটকগুলি সাধরণতঃ কুডিয়াট্টমে করা হত। এই নৃত্যকলা চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত পেরুমল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। কুলশেখর পেরুমল, চেরমন পেরুমল, প্রভৃতি রাজারা এই নৃত্যনাট্যের বিশেষ সমাদর করতেন।

কেরালার পেরুমল রাজবংশ যদিও শাসনতন্ত্র পরিচালনা করতেন, কিন্তু নির্বাচিত হতেন নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণের দ্বারা প্রেরিত জন প্রতিনিধির দ্বারা। নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণরা কেরালার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন। শাসনতন্ত্রের চাইতেও আধ্যাত্মিকতায় ও শিল্পকলায় এঁদের অনুরাগ ছিল বেশী। পেরুমল রাজারা এই শিল্পকলাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখতেন। চতুর্থ খৃষ্টাব্দে পেরুমল রাজারা হীনবীর্য হয়ে গেলে নায়াররা প্রাধান্য লাভ করেন। এঁরা সামরিক শক্তিতে বলবান ছিলেন। এঁদের সময় 'কলারী' অথবা সামায়িক বিদ্যালয়গুলির অভ্যুত্থান হয়। এই বিদ্যালয়গুলিতে যোদ্ধাদের দেহগুলিকে ব্যায়ামের দ্বারা সুগঠিত করে তোলা হত। পরবর্তীকালে এই ব্যায়াম সামরিক নৃত্যপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। নায়াররা এই 'কলারী' পর্যায়ভুক্ত সামরিক নৃত্যগুলির ধারক ছিলেন। নায়াররা যদিও খুব শক্তিশালী ছিলেন তবুও

পদমর্যাদায় নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণরা উচুতে ছিলেন। নায়াররা যুদ্ধ কৌশলী ছিলেন কিন্তু নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণরা শাস্ত্রে ও শিল্পকলায় নিপুণ ছিলেন। এর ফলে দুই শ্রেণীর ভেতর যে নাট্যের উদ্ভব হয়, তার একটি শাস্ত্রীয় নৃত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় এবং আর একটি লোকনৃত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। কথাকলি নৃত্যে লোকনৃত্য ও শাস্ত্রীয় নৃত্যের অদ্ভুত সংমিশ্রন হয়েছে। এর আরও একটি কারণ অনুধাবণ করা যেতে পারে। কেরালার আদি অধিবাসিরা ছিলেন 'দ্রাবিড়'। কিন্তু আর্যদের আগমনে দ্রাবিড় সভ্যতা পরিবর্তিত হয়ে হিন্দু সভ্যতায় পর্যবসিত হয়। আর্যদের সংস্কৃতি দ্রাবিড়দের মুগ্ধ করত এবং তাঁরা সর্বান্তঃকরণে আর্যদের অনুকরণের চেষ্টা করতেন। কেরালার গ্রামবাসিরা হাতের তৈরী গহনা ও ভূষণের দ্বারা সজ্জিত হয়ে নিজেদের আর্যসাহিত্যের নায়ক, প্রতিনায়ককল্পনা করে বাচিক অভিনয় ও নৃত্যের মাধ্যমে তা প্রদর্শন করতেন। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে মাথার মুকুট, গহনা ইত্যাদি প্রস্তুত করতেন ও চালের গুঁড়ো ও চুণ প্রভৃতি মিশিয়ে মুখ চিত্রিত করতেন। এর সঙ্গে কোন বাদ্যযন্ত্র অথবা সাহিত্য ছিল না। কেবল আনন্দলাভের জন্যেই করা হত। কিন্তু এই খেলার ভেতর ছিল মহীরুহের বীজ। এই খেলাকে বলা হয় 'কেলি'। এই 'কেলি' বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পরবর্তীকালে 'কথাকলি' রূপ পেয়েছে।

কথাকলি নৃত্যে মধ্যযুগের 'কৃষ্ণঅট্টম' ও 'রামঅট্টমের' অবদান অবিস্মরনীয়। কথাকলি নৃত্যের অবয়ব পুষ্ট করতে এই নৃত্যনাট্যগুলি যথেষ্ট সহায়তা করেছে। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে কালিকটের জ্যামুরিন মানবেদ কৃষ্ণঅট্টম রচনা করেন। কথিত আছে যে, একদিন রাত্রে মানবেদ কৃষ্ণগোপালকে স্বপ্ন দেখেন এবং কৃষ্ণঅট্টম রচনা করতে আদিষ্ট হন। কথিত আছে যে, স্বপ্নে তিনি একটি ময়ূরের পাখাও পান। এখনও কৃষ্ণ অট্টম প্রদর্শনের সময় ময়ূরের পাখা পরতে হয়। কৃষ্ণঅট্টম গীতগোবিন্দের অনুকরণে সংস্কৃতে রচিত হয়েছিল।

কেরালার নৃত্যনাট্যে সাহিত্যের এই প্রথম সংযোজন। এই নাটকটিকে রূপদান করতে মানবেদ উত্তর কোট্টয়মের রাজা, কুশলী অভিনেতা ও গুণজন নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণের সহায়তা লাভ করেছিলেন। এই নৃত্যনাট্য মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হত বলে উচ্চবর্ণ ছাড়া কেউ যোগ দিতে পারতেন না। কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, কৃষ্ণাদেশে এই নাটক রচিত হয়েছিল বলে এর সংস্কার করা

উচিত নয়। এখনও পর্যন্ত এই সংস্কারের বশবর্তী হয়ে কৃষ্ণঅট্টম্ অভিনীত হবার সময় অভিনেতাদের শিখীপুচ্ছ ধারণ করতে হয়।

কথিত আছে যে, একবার রাজা (জামুরিন) কৃষ্ণ অট্টম অভিনয় করবার জন্যে কোট্টরাকারার রাজা থম্পুরণ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হন। কিন্তু মানবেদ এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। এতে অপমানিত ক্ষুব্ধ রাজা শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম থেকে সমস্ত জীবনের কার্যাবলী নিয়ে 'রাম অট্টম' রচনা করেন। এই নাটকটিকে আট ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল এবং আটদিন ধরে এই নাটকটি অভিনীত হত। জনসাধারণের সুবিধার জন্যে 'মালয়লম' ভাষায় রচিত হয়েছিল। রামঅট্টমের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে অনেক পণ্ডিত, কবি ও নাট্যকাররা নাটক রচনা করতে থাকেন। এই রামঅট্যমই পরবর্তীকালে কথাকলিতে রূপান্তরিত হয়।

কৃষ্ণঅট্টম ও রামঅট্টমের তুলনামূলক আলোচনা—

কৃষ্ণঅট্টম ও রামঅট্টমের মধ্যে প্রভেদ এই যে, একটি (কৃষ্ণঅট্টম) দৈবপ্রেরণায় রচিত হয়েছিল ও অপরটির (রামঅট্টম) জন্ম অপমানের বহ্নিশিখা থেকে। একটি অভিজাত সম্প্রদায়ের জন্যে ও অপরটি জনসাধারণের জন্যে। একটির ভাষা প্রাচীন মার্জিত সংস্কৃত সাধুভাষা, অপরটি জনসাধারণের ব্যবহৃত মালয়লম্ ভাষা। কৃষ্ণঅট্টমের বিষয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে লীলাবসানের কাহিনী নিয়ে রচিত। রামঅট্টমের বিষয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ণজীবনের রূপায়ণ। কৃষ্ণঅট্টম এখনও পর্যন্ত গুরুভায়ুর মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। রামঅট্টমের প্রদর্শন হয় জনসাধারণের মধ্যে। কৃষ্ণঅট্টমের অভিনয়াংশ কথাকলির মত সমৃদ্ধ ছিল না। এতে নৃত্তাংশের ওপর বেশী প্রাধান্য দেওয়া হত এবং এতে সমবেত বা যুথনৃত্যের সমাবেশ ছিল। রামঅট্টমে বাচিক অভিনয়ের প্রচলন ছিল। বাচিকাভিনয়ের সঙ্গে নৃত্য ও গীত প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। চরিত্রগুলিতে রূপ দেবার জন্যে মুখোশ ও কাঠের মুকুট ব্যবহার করা হত এবং পরবর্তীকালে মুখোশ ব্যবহার উঠে যায়। বাচিক অভিনয় সম্পূর্ণ বর্জিত হয় এবং পদমের সাহায্যে নৃত্যাভিনয়ের প্রচলন হয়। শুধু তাই নয়, সংস্কৃত নাটকের মত নায়ক—নায়িকা ও অন্যান্য চরিত্রগুলির পরিচয় ও স্থায়ীভাব বর্ণনা করার নিয়ম প্রবর্তিত হয়। কথাকলি নৃত্যে বাচিক অভিনয় সম্পূর্ণ বর্জিত হয় এবং পদমের সাহায্যে নৃত্যাভিনয়ের প্রচলন হয়।

কেরালার রাজাদের কলাপ্রীতি—কেরালার রাজারা কলাপ্রীতির নিদর্শনস্বরূপ বহু নৃত্যনাট্য রচনা করেছেন। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে কোট্টয়মের রাজা থম্পুরণ রাজ্যলাভ করে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এর ভেতর তিনি 'বকবধ', 'ক্রিমিরাবধ', 'কালকেয় বধ' ও 'কল্যানসৌগন্ধী' নামে চারটি নাটক রচনা করেছিলেন। ইনি স্বয়ং অভিনেতা ও নর্তক ছিলেন। ত্রিবাঙ্কুরের রাজা কার্তিক থিরুমলের প্রকৃত নাম ছিল বলরাম বর্মা। ইনি সংস্কৃতে একটি পুস্তক রচনা করেন। এর নাম 'বলরাম ভরতম'। এ ছাড়া তিনি সাতটি নাটক রচনা করেন। অশ্বতী থিরুমল চারটি নাটক লেখেন। এই চারটি নাটক হচ্ছে 'পুতনা মোক্ষম', 'অম্বরীষ চরিতম্,' 'পুণ্ডরীক বধম' ও 'রুক্সিনী স্বয়ম্বরম্'। ১৮১৩—১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুরের রাজা থিরুমল রাম বর্মা নৃত্যনাট্যের জন্যে ৭৫টি পদ রচনা করেন। এঁর সমসাময়িক কবি ইরিয়াম্মান থাম্পি তিনটি মনোজ্ঞ নাটক রচনা করেন। এগুলি হচ্ছে 'কীচকবধম', 'দক্ষযজ্ঞম' ও 'উত্তরাস্বয়ম্বরম'। এঁর সুযোগ্য কন্যাও কয়েকটি নাটক রচনা করেন। এগুলির নাম হচ্ছে "শ্রীমতি স্বয়ম্বরম", 'পাবর্তী স্বয়ম্বরম' 'মিত্রসাহা মোক্ষম' ইত্যাদি। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা উথরাম থিরুমল কথাকলি নৃত্যের উন্নতির জন্যে সর্বাঙ্গীন চেষ্টা করেছিলেন।

কথাকলি নৃত্যানুষ্ঠান পদ্ধতি—কথাকলি নৃত্যনাট্য মন্দির প্রাঙ্গণে অথবা কোন গৃহাঙ্গণের মুক্ত স্থানে অভিনীত হয়ে থাকে। লতাপাতা ও ফুল দিয়ে মণ্ডপটিকে সজ্জিত করা হয়। নৃত্যানুষ্ঠানের জন্য কোন পৃথক মঞ্চ থাকে না। মণ্ডপের ভেতর একটি স্থান নির্দিষ্ট করা হয় এবং সেখানে মাদুর বিছান হয়। এই মাদুরের ওপর অভিনয়ের ব্যবস্থা হয় এবং এর চারপাশে উন্মুক্ত আকাশের নীচে দর্শকরা আসন গ্রহণ করেন। অভিনয়ের জন্যে নির্দিষ্টস্থানে একটি মাত্র প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকে। দিবা অবসানে 'চেণ্ডা' ও 'মদ্দলমের' গুরু গম্ভীর আওয়াজ গ্রামের দূর দূর প্রান্তে কথাকলি নৃত্যানুষ্ঠানের বার্তা ঘোষণা করে। একে 'কেলিকুত্তু' বলা হয়। রাত্রি ৮-৩০ টার সময় গুরু গম্ভীর বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে নৃত্যানুষ্ঠান সুরু হয়। নৃত্যানুষ্ঠানের প্রথমে 'চেণ্ডা' 'মদ্দলম' প্রভৃতি শুদ্ধবাদ্যের অনুষ্ঠান হয়। একে 'শুদ্ধ মদ্দলম' বলা হয়। এর পর দুজন পুরুষ একটি ত্রিকোণা পর্দা নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হন। এই পর্দাটি সাধারণতঃ ১২ ফুট দীর্ঘ এবং ৮ ফুট প্রস্থ হয়ে থাকে। কাপড়টির ওপর একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম অঙ্কিত থাকে

এবং কাপড়টিও বিচিত্র রঙের হয়। একে 'তিরশিলা' বলে। এর পেছনে দুজন নৃত্যশিল্পী 'টৌডরম' নৃত্য করেন। 'টৌডরম' হচ্ছে দেবতাদের প্রশস্তিমূলক নৃত্য। এতে দেবতাদের বন্দনা করা হয়ে থাকে। এরপর 'পুরুপ্পাড' অনুষ্ঠিত হয়। পুরুপ্পাডের অর্থ হচ্ছে 'প্রবেশ' বা 'প্রস্তাবনা'। এতে 'পচ্চা' চরিত্ররা নৃত্য প্রদর্শন করেন। উত্তম চরিত্রগুলিই 'পচ্চা' নামে অভিহিত হয়। 'পুরুপ্পাড' অথবা প্রস্তাবনার দ্বারা নৃত্যনাট্যের আরম্ভ হয়। 'চেণ্ডা', 'মদ্দলম', 'শঙ্খবাদ্য' প্রভৃতির সঙ্গে পর্দাটিকে অর্ধনমিত করা হয়। পচ্চা চরিত্রের দুপাশে দুজন ময়ূরপঙ্খধারী ও দুজন চামরধারী থাকেন। এর পর ভ্রূ, চক্ষু, ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন আরম্ভ হয়। পুরুপ্পাডের পর গীতগোবিন্দ থেকে যে গান করা হয় তাকে 'মঞ্জুরথা' বলা হয়। পরবর্তী অংশ মেলাপদমে বাদকরা তাঁদের চাতুর্য প্রদর্শন করেন। অর্থাৎ মদ্দলমে শুরুবাদ্য করা হয়। প্রথম দৃশ্যে সাধারণতঃ নায়ক নায়িকার প্রেমের দৃশ্য থাকে। এই দৃশ্যে নায়ক নায়িকার পরিচয় দেওয়া হয়।

কথাকলি নৃত্যনাট্যে নায়ক প্রতিনায়কের চরিত্রগুলি তাদের চরিত্র গুণোচিত বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশ পায়। অহঙ্কারে, গর্বে, ঐশ্বর্যে, মান অভিমানে এই চরিত্রগুলি মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। এইভাবে নিজের প্রতাপ প্রকাশ করাকে 'তিরনোক্কু' বলা হয়। কোন অঙ্গহার আরম্ভ হবার আগে 'মুখজ' অভিনয়ের প্রাধান্য থাকে। যখন কোন বস্তু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ করা হয়, তাকে 'নোক্কিকাম্নুকা' বলা হয়। কথাকলি নৃত্যনাট্যে যুদ্ধের দৃশ্যটি বিশেষ আকর্ষনীয় হয়। যুদ্ধের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে সমরায়োজনকে 'পড়পুরপ্পড' বলা হয়। পরস্পর যুদ্ধে আহ্বান করাকে 'পোরভিলি' বলা হয়। রক্তপাতের দৃশ্যকে 'নিমম', বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ শূর্পনখার নাসিকা কর্তন. দুঃশাসনের রক্তপান ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে।

কথাকলি নৃত্যনাট্যে প্রণয়ের দৃশ্যে লাস্যনৃত্যের প্রয়োগ হয়ে থাকে। এই লাস্য নৃত্যের অন্তর্গত হচ্ছে 'সারি' ও 'কুমি'। উদ্যানে নায়ক নায়িকার প্রেমের দৃশ্য নৃত্যে অভিনীত হলে তাকে 'সারি' নৃত্য বলে। নৃত্যনাট্যের ভেতর রাজ-দরবারের দৃশ্যও থাকে। এই রাজদরবারে অনুষ্ঠিত নৃত্যকে 'কুমি' বলা হয়। এতে রাজার যশোগান করা হয় এবং চার বা তার বেশী নর্তকী এতে অংশ গ্রহণ ও করতে পারে।

'কলাস' শব্দটি সঙ্গীতরত্নাকরে পাওয়া যায়। এর সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করেছি। এর সঙ্গে কথাকলি কলাসমের প্রভেদ আছে। পদমের প্রত্যেকটি স্তবকের শেষে বিভিন্ন ছন্দের তিহাইকে কলাসম্ বলা হয়। বিভিন্ন তালে নির্দিষ্ট সংখ্যায় 'কলাসম' থাকে। বিলম্বিত লয়ের সঙ্গে নৃত্য করাকে 'পরিক্ষুঅট্টম' বলা হয়।

কথাকলি নৃত্যে দুরকম পদম্ গান করা হয়—শৃঙ্গার পদম্ ও মুর্গীর পদম্। শৃঙ্গার পদমে গান মধ্যলয়ে গীত হয় এবং মুর্গীর পদমে গান দ্রুতলয়ে গীত হয়। পদাভিনয়ের তিনটি ভাগ থাকে—এলাকিয়াট্টম, চুল্লিয়াট্টম ও কুড়িয়াট্টম্।

এলাকিয়াট্টম—এতে কোন গীত থাকে না। শুধুমাত্র 'ঘন' বাদ্যের সঙ্গে নৃত্য করতে হয়। এতে শিল্পীর নৃত্যচাতুর্ব প্রদর্শনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে।

চুল্লিয়াট্টম—এই অংশে সঙ্গীতের প্রয়োগ থাকে।

কুড়িয়াট্টম—পদমের ভেতর দুটি চরিত্রের কথোপকথন থাকলে তাকে 'কুড়িয়াট্টম' বলে।

কথাকলি নৃত্যে দুজন গায়ক থাকেন। যিনি মুখ্য গায়ক তাঁকে 'পন্তানি' বলা হয়। যিনি মুখ্য গায়ককে সহযোগিতা করেন তাঁকে 'গাংগরী' বলা হয়। এঁদের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রী থাকেন। এঁরা বৃহৎ গণ্ড, চেণ্ডা, মৃদঙ্গ ও করতাল প্রভৃতি দ্বারা নৃত্যের সহযোগিতা করেন।

কথাকলি নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে বলি অথিক্কন নাম্বুদ্রী, কুঞ্জুকৃষ্ণ পানিকর, নলন্ উন্নি, বেচুর রমণ পিল্লাই, কাভালাপ্পারা, নারয়ণ নায়ার, শঙ্করণ নাম্বুদ্রী প্রভৃতির নাম তাঁদের শিল্পচাতুর্যের সঙ্গে অমর হয়ে আছে। যাঁরা এখনও জীবদ্দশায় এই নৃত্যকলার সেবা করছেন তাঁদের মধ্যে কুঞ্জু কুরূপ, রাবণি মেনন ও পান্নিকরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীগোপীনাথের নামও স্মরণীয়। সাগরপারের শিল্পী রাগিনীদেবী এই নৃত্যকলায় বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে এই নৃত্যকলা শিক্ষা করেন। ইনি গোপীনাথের নৃত্যানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কথাকলি নৃত্যশিল্পীদের ভেতর অনেকে বাংলাদেশে এসে যশ অর্জন করেছেন। এঁদের ভেতর কেলু নায়ার, গোবিন্দম্ কুট্টি, বালকৃষ্ণ মেনন, শিবশঙ্করণ, গোপাল পিল্লাই প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কথাকলি নৃত্যে মুদ্রার প্রয়োগ বেশী। প্রায় চারশ' মুদ্রার প্রয়োগ আছে। সংযুত ও অসংযুত মুদ্রা প্রয়োগের সঙ্গে মিশ্র মুদ্রার ব্যবহারও

হয়ে থাকে। মুদ্রা দুহাতে করতে হয়। কিন্তু দু হাতে একই রকম মুদ্রার ব্যবহার না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। একে মিশ্র বলা হয়। মুদ্রার অত্যাধিক ব্যবহারে অনেক সময় গতি রুদ্ধ হয়। যাঁরা নৃত্যে মুদ্রার প্রয়োগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নন, অথবা যাঁরা মালয়লম্ ভাষার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না, তাঁদের কাছে এই মুদ্রার অতিরিক্ত প্রয়োগে নৃত্য ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

লোকনৃত্য

"সোমান সোমান চলরে ভাই জোরে চালাও হাত।
আপন জীবন সামাল কইর‍্যা শক্তে বাইন্দো পাত।"

লোকনৃত্য

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত কতরকমের যে বর্ণাঢ্য লোকনৃত্য আছে তার হিসেব রাখা দুষ্কর। ভারত স্বাধীন হবার পর ভারত সরকারের চেষ্টায় লোকনৃত্য পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার পূর্বে লোকনৃত্য শহরের লোকের লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে জনসমাজে লোকনৃত্য সম্বন্ধে একটি চেতনাবোধ দেখা দিয়েছে, দেশীয় সংস্কৃতির ওপর একটি মমত্ববোধ জেগেছে, স্বদেশ ও স্বজাতিকে জানবার ও চিনবার একটি অদম্য স্পৃহাও জাগ্রত হয়েছে। যার ফলে উত্তরের হিমালয় থেকে দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত জানা, অজানা সকল জাতি ভারতের বেদীতলে সংস্কৃতির অর্ঘ্য সাজিয়ে এনেছে।

আদিমযুগে মানুষের আবির্ভাব থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। বিভিন্ন স্তরে সমাজের বিবর্তন হয়েছে এবং ধীরে ধীরে সমাজ অগ্রগতির পথে অগ্রসর হয়েছে। সমাজের এই বিবর্তনের ভেতর দিয়ে লোকসংস্কৃতির প্রবাহ ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হয়ে জাতির জীবনতরুকে রসসিঞ্চিত করে রেখেছে। এই লোকসংস্কৃতি ফুলে ফলে পল্লবিত হয়ে সমাজের আর্থিক, নৈতিক, ধর্মীয় ও সামরিক রীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে। সেইজন্যে আমরা দেখতে পাই সামাজিক উৎসবে অথবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নৃত্য করবার প্রথা রয়েছে। লোক নৃত্য একক নৃত্য নয়, সংহত সমাজের নৃত্য। যখন গ্রামের দেবতা রুষ্ট হন, তখন সেই ক্রোধের ফল ব্যক্তিগত কারোর ওপর আশঙ্কা করা হয় না। তখন তা সকল গ্রামবাসীর শঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে। দেবতা কোন একজন বিশেষ গ্রামবাসীর নন। তিনি গ্রামের দেবতা। গ্রামের ভাল মন্দ তাঁর কৃপাদৃষ্টির ওপর নির্ভর করে বলে গ্রামবাসীরা মনে করেন। সেইজন্য লোকনৃত্যের কোন অনুষ্ঠান ব্যক্তিবিশেষের নয়। এতে প্রত্যেকেই যোগদান করতে পারেন। এই যোগদান পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে হয়ে থাকে। সকলে যদি নাচ গানে যোগদান নাও করতে পারেন,

তাহলে সম্প্রদান করেন। এই সম্প্রদানের অর্থ হচ্ছে যে নিজের আনন্দ অথবা বিষাদকে সকলের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া। সেইজন্যে শীতের শেষে ফসল কাটা শেষ হ'লে বসন্তের সমাগমে, হোলি উৎসবে, অথবা বর্ষার আবির্ভাবে সমবেতভাবে নাচ-গানের দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া অনাবৃষ্টির সময়, দুর্ভিক্ষের সময়, মহামারীর সময় সমবেতভাবে নাচগানের দ্বারা দেবতাকে প্রার্থনা জানাবার রীতিও আছে। সুতরাং লোকনৃত্যে কারোর ব্যক্তিগত প্রতিভা প্রকাশের অবকাশ নেই। এতে শিক্ষার আভিজাত্য নেই, নাট্যশাস্ত্রের চুলচেরা বিচার নেই, রঙ্গমঞ্চেরও প্রয়োজন হয় না। এ হচ্ছে স্বাভাবিক আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। এতে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই যোগদান করতে পারেন। যদিও লোকনৃত্য শাস্ত্রীয় নৃত্যের জনক, তবুও শাস্ত্র মানবার কোন নিয়ম এতে নেই। বিচ্ছিন্নকে একসূত্রে গাঁথবার শক্তি এর প্রবল। এই লোকনৃত্যের জন্যে বিশেষ শিক্ষার দরকার হয় না, বংশ পরম্পরায় প্রচলিত হয়ে থাকে।

লোকসংস্কৃতিতে পুরোনোর মধ্যে নতুনের বিকাশ হয়েছে। প্রান্তীয় উপজাতি ও আদিবাসিদের সংস্কৃতির সঙ্গে সভ্যতর সংস্কৃতির মিলন হয়েছে। এই মিলিত সংস্কৃতি হচ্ছে লোকসংস্কৃতি। আদিবাসিদের সংস্কৃতি আদি ও অকৃত্রিম রয়ে গিয়েছে। কারণ এর মধ্যে কোন বাইরের সংস্কৃতি এসে মেশে নি। তবে আদিবাসিদের সংস্কৃতি প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। এর একটি কারণ আছে। সাধারণতঃ দেখা যায় লোকসংস্কৃতি নিজের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। নদীর স্রোতের মত কূল ভাসিয়ে চলে। নিজের আবর্তের মধ্যে বাইরের সব কিছু টেনে নেয়। কিন্তু যার স্রোত রুদ্ধ তা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। আদিবাসিদের সংস্কৃতি বাইরের সমস্ত স্পর্শকে বাঁচিয়ে চলে, দূরে ঠেলে দেয়; তাই তার গতিও শ্লথ হয়ে এসেছে। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, লোকনৃত্য বা লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসিদের নৃত্য বা আদি সংস্কৃতির মধ্যে অনেক সাদৃশ্য থাকলেও একটি ব্যবধান আছে।

লোকনৃত্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা—সামাজিক নৃত্য ধর্মীয় নৃত্য ও সামরিক নৃত্য। বিবাহ বাসরে ও আনন্দোৎসবে অনুষ্ঠিত নাচগুলিকে সামাজিক নৃত্য বলা যেতে পারে। ধর্মকে কেন্দ্র করে যে সব নৃত্য হয়, তাকে ধর্মীয় নৃত্য বলা হয়। বাংলার গাজন, বাউল প্রভৃতি এই জাতীয়

নাচ। লাঠি নৃত্য তরবারী নৃত্য, ঢাল নৃত্য প্রভৃতিকে সামরিক নৃত্যের মধ্যে গণ্য করা হয়।

সামরিক নৃত্যের উৎপত্তি জমিদার ও রাজা মহারাজদের সময় থেকে। পূর্বে রাজা ও জমিদাররা নিজেদের রাজত্ব রক্ষা করবার জন্যে লাঠিয়াল অথবা অস্ত্রবিদ্‌দের অর্থ দিয়ে পোষণ করতেন। এরা অবসর সময় নিজেদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে নাচ গানের মধ্যে দিয়ে নানারকম ব্যায়াম করত। এইভাবে লোকনৃত্যে সামরিক কসরৎ প্রবেশ করে। সমবেতভাবে অভ্যাসের জন্যে একটি ছন্দের প্রয়োজন হয়। এই ছন্দে সমতা রাখবার জন্যে বাজনার প্রয়োজন হয়। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে সাধারণতঃ ঢাক, ঢোল, কাঁসর প্রভৃতির ব্যবহার হয়। রৌদ্ররস ও বীররস প্রকাশের জন্যে মুখে নানারকম আওয়াজ করবার প্রথাও আছে।

পশ্চিমবঙ্গে পুরুষদের নাচের ভেতর একটি বলিষ্ঠ ও দৃঢ় ভাব আছে। নাচের ভেতর শরীরের ওপরের অংশের বলিষ্ঠ প্রয়োগ হয়ে থাকে। বাদ্যযন্ত্রের ভেতর বিশেষ করে ঢাক, ঢোল, কাঁসর, ঘণ্টা প্রভৃতি থাকে। কখনও কখনও বেণুর ব্যবহারও হয়ে থাকে। স্ত্রীদের নৃত্যে শরীরের নিম্নাংশ বেশী আন্দোলিত হয়ে থাকে।

পশ্চিমবাংলার লোকনৃত্যের ভেতর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রাইবেশে, ঢালী, কাঠি, জারী, ভাজো, ঘাটু, ঘাটওলানো, মনসাভাসান, বাউল ইত্যাদি।

রাইবেশে—'রাইবেশে' নাচ সাধারণতঃ বীরভূম জেলার রাজনগর এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 'ভল্ল' জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। 'ভল্ল' শব্দটির অর্থ হচ্ছে বল্লম জাতীয় অস্ত্র। পুরাকালে সৈন্যদের রাইবেঁশে বলা হত। রাইবেঁশে সৈন্যরা সাধারণতঃ নিম্নবর্ণ ও নিপীড়িত শ্রেণী থেকে আসতেন। এঁরাই নৃত্য করতেন। এই নাচে মুখে হাত দিয়ে আওয়াজ করতে করতে অংশ গ্রহণকারীরা লাফ দিয়ে রঙ্গস্থলে এসে উপস্থিত হন। ঢাকের তালে তালে কাঁধ ও বক্ষঃস্থল ঝাঁকি দিতে দিতে তাঁরা নৃত্য সুরু করেন। তারপর নৃত্যের গতি বৃদ্ধি পেতে থাকে, এবং সর্বশেষে দৈহিক কসরৎ সুরু হয়।

ঢালী—ঢালী শব্দটি থেকে বোঝা যায় যে, এটি সামরিক নাচ। ঢাল সাধারণতঃ যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হয় এবং যাঁরা এই ঢাল ব্যবহার করেন তাঁদের 'ঢালী' বলা হয়। বারো ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া প্রতাপাদিত্য বাহান্ন হাজার 'ঢালী' সৈন্য

রেখেছিলেন। সকল বর্ণ থেকে 'ঢালী' সংগ্রহ করা হত। এমনকি ব্রাহ্মণ শ্রেণী থেকেও সংগ্রহ করা হত। ঢালী নৃত্যশিল্পীরা বেতের ঢাল ব্যবহার করেন। এই ঢালের ব্যাস ৮ থেকে ১৮ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। এঁরা উঁচু করে মালকোচা মেরে কাপড় পরেন। এক পায়ে ঘুঙুর পরেন। সাধারণতঃ মহরম বা বিবাহোৎসবে ঢালী নৃত্য হয়ে থাকে। ঢালীদের মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান অথবা নমঃশূদ্র। প্রথমে নৃত্যশিল্পীদের যিনি প্রধান তিনি নৃত্যবাসরের মধ্য স্থলে এসে দাঁড়ান এবং গোড়ালির ওপর দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ ঘুরে যান। তার পর বাম হাতে মাটি নিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকেন। মন্ত্র উচ্চারণের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, মা ধরিত্রী যেন তাঁদের শত্রুপক্ষ থেকে রক্ষা করেন। এর পর দল-প্রধান অন্যান্য সভ্যদের জন্যে অপেক্ষা করেন। অন্যান্য সভ্যরা একের পর এক শ্রেণীবদ্ধভাবে হাতে ঢাল ও কাঠি নিয়ে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করেন। এঁদের সকলের কপালে মন্ত্রপূত মাটি দিয়ে জয়টীকা এঁকে দেন। এঁরা নৃত্য আরম্ভ করবার পূর্বে সমস্ত রঙ্গভূমিটি পরিক্রমণ করেন। এক একটি কোণ যখন অতিক্রম করেন তখন মাথার ওপর লাঠি ঘুরিয়ে দিক্‌পালদের প্রণাম জানান। মঙ্গলাচরণ সমাধা হবার পর ই ই ই শব্দ করতে করতে ছুটে এসে গোলাকারে দাঁড়ান এবং ঢাল ও কাঠি ভূমিতে রেখে ডান হাঁটু ভূমিতে স্পর্শ করে বাম পা পেছনদিকে সোজা করে এবং বাম্ হাত পিঠের ওপর রেখে মুখে শব্দ করেন। দ্বিতীয়বারে পা এবং দিক্ পরিবর্তন করে আবার ওইরকম করেন। এরপর দাঁড়িয়ে ব্যায়ামের সঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে কাঠিতে আঘাত করেন। শেষ অংশে তাণ্ডব নাচের মাধ্যমে ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের শেষে রঙ্গভূমি দৌড়িয়ে অতিক্রম করে শিল্পীরা বিদায় নেন।

কাঠি—সাধারণতঃ বেহারা ও বাগ্দী শ্রেণীভুক্ত নর্তকরা এই নৃত্য করেন। মালকোচা মেরে কাপড় পরে খালি গায়ে এই নৃত্য করা হয়ে থাকে। এই নৃত্যে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে মাদল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দেড়হাত লম্বা লাঠি নিয়ে ৪ থেকে ৮ জন নৃত্যশিল্পী গোলাকারে দাঁড়িয়ে নৃত্য সুরু করেন। এঁরা ঘড়ির কাঁটার বিপরীত গতিতে গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে দক্ষিণ ও বাম পাশে অবস্থিত জুড়িদের কাঠিতে আঘাত করেন। সঙ্গীতও ক্রমশঃ দ্রুততর হতে থাকে।

বাউল ঃ—উপরোক্ত নাচগুলি সামরিক নৃত্যের অন্তর্গত। ধর্মীয় নৃত্যের ভেতর বাউলকে গণ্য করা যেতে পারে। বাউল নৃত্য ও গান বাংলার

লোকনৃত্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাউলরা বাদ্যযন্ত্র হিসেবে আনন্দলহরী (গাবগুবাগুব), একতারা, করতালী, ডুবকী প্রভৃতি ব্যবহার করেন। পরিচ্ছদের মধ্যেও বিশেষত্ব আছে। সাধারণতঃ ধুতি ও গেরুয়া রঙের আলখাল্লা পরেন বাউলরা। এঁরা কোন জাতিভেদ মানেন না, কোন প্রতিমাপুজো করেন না বা মন্দিরে যান না। তাঁরা নিজের দেহকেই মন্দির মনে করে দেহতত্ত্বের গান করেন। তাঁরা মনে করেন তাঁদের দেহের মধ্যেই ভগবানের বাস এবং সেইজন্যেই সেই পরম আধারের সঙ্গে মিলবার তৃষ্ণা তাঁদের কোনকালেই শেষ হয় না। ভগবান তাঁর অতি নিকটে দেহের মধ্যেই রয়েছেন, কিন্তু তিনি তাঁর নাগাল পাচ্ছেন না, এবং এই না পাওয়ার পাগলামি তাঁকে আরও পাগল করে তোলে। বাউলরা এই নাচগানের মধ্যে দিয়েই সেই পরম শক্তিমানকে পেতে চান। বাউলরা নিজেই এক হাতে বাজনা বাজিয়ে গান করেন ও নাচেন।

জারি—স্মৃতির উদ্দেশে জারি নাচ করা হয়। পূর্ব মৈমনসিংহের 'জারি' নৃত্য বীর ও করুণ রসের অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে কারবালার যুদ্ধ বৃত্তান্ত। একজন মূল গায়েনের অধীনে ২৫ থেকে ৩০ জন নর্তক পায়ে ঘুঙুর বেঁধে এবং হাতে রুমাল নিয়ে এই নাচ করেন। সাধারণতঃ পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা মহরমের সময় এই নৃত্য করেন।

ঝুমুর—ঝুমুর নৃত্য সাধারণতঃ প্রেমসম্বলিত গানের সঙ্গে করা হয়। একক, দ্বৈত বা সমবেত ঝুমুর প্রভৃতি নানারকমের নৃত্য হয়ে থাকে। ঝুমুর নৃত্যে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন তাঁরা সাধারণতঃ বাগ্দী, বাউড়ি ও ডোম জাতির অন্তর্গত। এই নৃত্যে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ঢোল ও মাদল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একক ঝুমুর সাধারণতঃ তাণ্ডব পদ্ধতিতে করা হয়। দ্বৈত ঝুমুরে দুজন স্ত্রীলোক অংশ গ্রহণ করেন। এতে ঢোল বাজানো হয়ে থাকে। 'কোরা' ঝুমুরে কোরা শ্রেণীর অন্তর্গত মেয়েরা অংশ গ্রহণ করেন। মাটি খোঁড়া বা রাস্তা তৈরী করা এঁদের জীবিকা। সুতরাং এঁদের নাচ গানের মধ্যে দিয়েও জীবনধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

এইগুলি বাংলার নিজস্ব লোকনৃত্য। এছাড়া কতকগুলি ভারতীয় লোক নৃত্যেরও পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

তেরাতালি—এই নৃত্য খুব চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকে। এতে দুই থেকে

তিনজন স্ত্রীলোক শরীরের বিভিন্ন স্থানে মন্দিরা বাঁধেন। ওড়না দিয়ে মুখ ঢাকা থাকে এবং নৃত্যশিল্পী দাঁত দিয়ে তরবারি ধরে থাকেন। মাথার ওপর একটি ঘড়া থাকে। গানের সঙ্গে বা ঢোলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন ভঙ্গীতে নাচ স্বরু হয়। লয় দ্রুততর হতে থাকে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে মন্দিরা বাজিয়ে এঁরা নৃত্য করেন। সাধারণতঃ রাজস্থানে এই ধরণের লোকনৃত্যের প্রচলন আছে।

কাচ্চি ঘোড়ী—বাঁশ ও কাগজের ঘোড়া তৈরী করে তার ভেতর ঢুকে তাসা ও ঢোলকের সঙ্গে নর্তকরা নাচেন। গুজরাট, রাজস্থান প্রভৃতি জায়গায় এই নৃত্যের প্রচলন আছে।

ঘুমর—রাজস্থানের 'ঘুমর' নৃত্য বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে। ঘুমর নৃত্য রাজস্থানের স্ত্রীলোকেরাই করে থাকেন। রাজস্থানী ঘাগরা ও ওড়না পরে মেয়েরা গানের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ঘোমটা টেনে এই নৃত্য করেন।

ভাংরা—পাঞ্জাবের ভাংরা নৃত্য লোকনৃত্য হিসেবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই উদ্দাম নৃত্যে সাধারণতঃ পুরুষরা অংশ গ্রহণ করেন। অবশ্য এখন মেয়েরাও অংশ গ্রহণ করছেন। লুঙ্গী, কুর্তী ও জ্যাকেট পরে হাতে রুমাল নিয়ে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর হয়ে এই নৃত্য উদ্দাম অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে করা হয়।

গরবা—গুজরাটের লোকনৃত্যের মধ্যে গরবা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গরবা নৃত্য নবরাত্রির সময় অম্বা মাতার সম্মুখে করা হয়। অম্বা মাতা হচ্ছেন শক্তির আধার। রঙ্গভূমির মধ্যস্থলে শক্তির প্রতীক হিসেবে মঙ্গলদীপ রাখা হয়। মঙ্গলদীপটিকে ঘিরে নারীরা নৃত্য করেন গানের সঙ্গে। অনেক সময় ঘড়ায় মঙ্গলদীপটিকে রেখে মাথায় ঘড়া নিয়েও নাচ হয়। এ ছাড়া হাতে তালি বাজিয়ে অথবা পরস্পর পরস্পরের কাঠিতে আঘাত করে নৃত্য করা হয়।

গোফ্—মহারাষ্ট্রের লোকনৃত্যের মধ্যে গোফনৃত্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই নৃত্যে সাধারণতঃ নারীরা অংশ গ্রহণ করেন। কখনও কখনও পুরুষরাও অংশ নেন। কতকগুলি নানারঙের রেশমের দড়ি ওপরে আংটার সঙ্গে হালকাভাবে বাঁধা থাকে। মেয়েরা দড়ির একপ্রান্ত বাম হাতে ধরেন এবং অন্য হাতে ছোট ছোট লাঠি নিয়ে পরস্পরের লাঠিতে আঘাত করে প্রত্যেকে প্রত্যেককে অতিক্রম করে ঘুরতে থাকেন। এই ভাবে দড়িগুলিতে

বিনুনী হয়ে যায় এবং একই পদ্ধতিতে উল্টোদিকে ঘোরেন। তার ফলে বিনুনী আবার খুলে যায়। এইভাবে নৃত্য করতে হয়।

কোলকালি—কেরালার মুসলমানদের মধ্যে এই নৃত্যের প্রচলন আছে। যদিও মুসলমানরা এই নৃত্য করেন, তবুও এর গান হিন্দু দেবদেবীকে নিয়ে রচিত। নৃত্যমণ্ডপে একটি প্রদীপ রাখা হয়। প্রদীপের চারপাশে নর্তকরা গোল হয়ে বসে থাকেন এবং লাঠিগুলি মাটিতে স্পর্শ করা হয়। গানের সঙ্গে পরস্পর পরস্পরের লাঠিগুলি বাজাতে থাকেন এবং ক্রমশঃ উঠে দাঁড়ান, তারপর নাচ সুরু হয়। ক্রমশঃ ক্রমশঃ এর ছন্দ দ্রুততর হতে থাকে। এক একটি নাচের পর প্রদীপের নীচে নর্তকরা প্রণতি জানান।

ভেলাকালি—এটি কেরালার সামরিক নৃত্য। নায়াররাই এই নৃত্য করে থাকেন। ত্রিবাঙ্কুরের পদ্মনাভ স্বামীর মন্দিরে ফাল্গুন চৈত্র মাসে এই নৃত্য করা হয়ে থাকে। এই নৃত্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দৃশ্য দেখানো হয়। নর্তকরা কুরুদের ভূমিকা অভিনয় করেন। কাঠের দ্বারা পাণ্ডবদের প্রতিমূর্তি তৈরী করে মন্দিরে রাস্তার ধারে পুঁতে রাখা হয়। ড্রাম ও ভেরীবাদ্যের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। প্রত্যেক নর্তকযোদ্ধার বাম হাতে একটি ঢাল ও ডান একটি লাঠি থাকে। সাদা লুঙ্গীর ওপর একটি লাল রঙের কাপড়ের টুকরো হাতে বাঁধা থাকে এবং মাথায় লাল পাগড়ী থাকে। ধীরে ধীরে এর গতি দ্রুততর হতে থাকে এবং তার সঙ্গে যুদ্ধের নানরকম কৌশল দেখানো হয়ে থাকে। শেষে কুরুদের পলায়ন দেখিয়ে নৃত্য শেষ করা হয়।

থেরায়াট্টম—মালাবারে ভগবতী পুজোর সময় এই নৃত্য করতে দেখা যায়। শক্তিরূপী কালী অথবা ভগবতীর অনুচরদের সাজ পরে জনসাধারণের সম্মুখে এই নৃত্য করা হয়। নর্তকরা সাজপোষাক পরে গ্রামের পূজাবেদী পরিক্রমণ করেন। তারপর তাঁরা যূপকাষ্ঠের সম্মুখে এলে ভক্তরা তাঁদের কাছে মুরগী প্রভৃতি পুজোর বলি নিবেদন করেন। একটি ছুরির সাহায্যে বলির গলাটি কেটে ফেলে দেহটি ফেরত্ দেওয়া হয়। এই সবকিছুই নৃত্যের তালে করতে হয়।

ডাপ্পু—অন্ধ্রপ্রদেশের 'ডাপ্পু' নৃত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হরিজনরা ঢোলের সঙ্গে এই নৃত্য করে। পুরুষরা ঢোল বাজাতে থাকে এবং নর্তকীরা হাতে তাল দিয়ে তাদের অনুসরণ করে। এরা রঙিন ঘাগরা ও ওড়না ব্যবহার

করে। গয়নার ভেতর কদম ফুলের মত কাপড়ের তৈরী বালা পরে। পুরুষরা ধুতি, ফ্রককোট, ও পাগড়ী ব্যবহার করে।

লোকনৃত্তের ব্যবহার সম্বন্ধে পৃথিবীর সর্বত্রই একই মত পোষণ করা হয়। শুধু মতের ঐক্যই নয়, নৃত্যের ভেতরও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ-স্বরূপ তরবারি নৃত্যের কথা বলা যেতে পারে। তরবারি নৃত্য, কাঠি নৃত্য, রুমাল নৃত্য পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই প্রচলিত আছে। বিচার করলে দেখা যায় যে, সকল দেশের লোকনৃত্যের ভেতর একটি পারস্পরিক যোগসূত্র রয়েছে যা সকল দেশ ও জাতিকেই একসূত্রে গাঁথতে পারে।

আধুনিক নৃত্যধারা

আধুনিক নৃত্যধারা

পটভূমিকা—নৃত্যের আধুনিক যুগ বলতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর আধুনিক কাল পর্যন্ত নির্দেশ করা যেতে পারে। এই সময়ের মধ্যে কথক, কথাকলি, ভরতনাট্যম ও মণিপুরী নৃত্যের প্রভূত সংস্কার করা হয়েছে। কিন্তু এগুলিকে আধুনিক নৃত্য বলা চলে না। এগুলি শাস্ত্রীয় নৃত্য। কিন্তু এগুলি আধুনিক যুগের উপযোগী করে সংস্কার করে নেওয়া হয়েছে এবং তার ফলে পুরোন গণ্ডী ছেড়ে তার মধ্যে আধুনিকতা এসেছে। এদের সংস্কার সাধন করা হলেও মূল নিহিত আছে পূর্ব যুগে। শুধু তাই নয় এদের একটি নির্দিষ্ট শাস্ত্র আছে।

আধুনিক নৃত্য কিন্তু শাস্ত্রীয় নৃত্যের বন্ধনকে মানে না। আধুনিক নৃত্যের কোন নির্দিষ্ট শাস্ত্র নেই। যুগোপযোগী রুচি, চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পায় আধুনিক নৃত্যে। প্রাচীন বিষয়বস্তুও নতুনরূপে, নতুন পদ্ধতিতে (টেকনিক) প্রতিভাত হয়ে ওঠে। নদী যেমন আপন খেয়ালে নতুন নতুন পথে বাঁক নেয়, তেমনি আধুনিক নৃত্যধারাও নতুন নতুন চিন্তাধারাকে স্থান দেয়।

প্রাক্ স্বাধীনতার যুগে আধুনিক নৃত্যই ভারতে ও ভারতের বাইরে 'ওরিয়েন্টাল' বা প্রাচ্যনৃত্য বলে খ্যাত ছিল। আধুনিক নৃত্যের উদ্ভব হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে। বাঁধন ছেড়ার সাধনা ছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ নৃত্যের সমস্ত শাস্ত্রকে ভেঙ্গে এবং লোকনৃত্য, শাস্ত্রীয় নৃত্য এবং অন্যান্য সমস্ত নৃত্য থেকে মণিমুক্তো আহরণ করে তাঁর নৃত্যের ডালি সাজালেন। তাঁর নৃত্যনাট্যগুলিকে রূপময় ও ভাবময় করে তোলবার জন্যে যে ধরণের নৃত্যের প্রয়োজন হয়েছিল এবং যা তাঁর ভাল লেগেছিল তাই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নৃত্যের কোন পদ্ধতি (টেকনিক) প্রবর্তন করতে চান নি। সেইজন্যে রবীন্দ্র নৃত্য বলতে কোন পদ্ধতি বা টেক্‌নিক বোঝায় না। যে কোন শাস্ত্রীয় নৃত্যেও রবীন্দ্র নৃত্য করা যেতে পারে। রবীন্দ্র চিন্তাধারা, ভাব ও রূপ যে কোন নৃত্যে প্রকাশিত হতে পারে সুতরাং 'রবীন্দ্রনৃত্য' বলে কোন বিশেষ পদ্ধতির উল্লেখ করা যায় না।

প্রাক্‌স্বাধীনতার বাংলাদেশে কি ধরণের নৃত্যের প্রচলন ছিল অথবা মার্গ-নৃত্যের প্রচলন আদৌ ছিল কি না এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে বাংলাদেশের সংস্কৃতির ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

সাংস্কৃতিক ইতিহাস :—প্রাচীনকালে বাংলাদেশ আর্য-অধ্যুষিত-অঞ্চল ছিল না। বেদের সংহিতাভাগেও বাংলাদেশের নাম নেই। বাংলাদেশে এলে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ছিল। এর শাস্ত্রীয় প্রমাণও আছে—

"অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সুরাষ্ট্র-মগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥"

বৈদিককালের পর অঙ্গদেশে আর্যদের আগমন হয়। আর্যদের পূর্বে বঙ্গ, রাঢ় ও সুহ্ম প্রভৃতি জাতি আর্যেতর ছিল। এর পর আর্য সভ্যতা পুণ্ড্রবর্ধন বা বরেন্দ্রভূমিতে প্রসার লাভ করে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অন্ধ্র, পুলিন্দ, শবর প্রভৃতি ব্রাত্য বা অন্ত্যজ জাতিদের সঙ্গে পুণ্ড্রদের উল্লেখও করা হয়েছে।

মৌর্যযুগের আরম্ভে আর্যরা বঙ্গে ব্যাপকভাবে এসে বসতি স্থাপন করেন। তবে বরেন্দ্রভূমি ও রাঢ় অঞ্চলে যাঁরা বসতি স্থাপন করেন, তাঁদের অধিকাংশই জৈন ছিলেন। বঙ্গের পূর্বপ্রান্তে অনার্যজাতির প্রভাব বেশী ছিল এবং এই দেশটি দুর্গম ছিল বলে এই অঞ্চলে আর্যপ্রভাব বহুদিন প্রতিহত ছিল। বরেন্দ্র ও রাঢ় অঞ্চলে জৈনদের পর বৌদ্ধদের আধিপত্য বিস্তৃতি লাভ করে। ৪৭৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ৪৭৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পাহাড়পুরের স্তূপ নির্মিত হয়। এই স্তূপে সঙ্গীতরতা নারী ও নরদের মূর্তি খোদিত আছে। জৈন ও বৌদ্ধদের মধ্যে সঙ্গীতের চর্চা কি রকম প্রবল ছিল তা আগে আলোচনা করেছি 'নৃত্যের ইতিহাস' অধ্যায়ে। বৌদ্ধমতাবলম্বী পাল রাজবংশ বাংলায় রাজত্ব করে একে আর্যভূমিতে পরিণত করেন। এই রাজবংশ ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন রেখে যান। পালদের সময় থেকে বাংলাদেশে নতুন সংস্কৃতির সূচনা হল। এই সময় মার্গসঙ্গীতেরও প্রচলন হল। সুতরাং কিছুকালের জন্যে যে বাংলাদেশে মার্গসঙ্গীতের প্রচলন হয়েছিল সে বিষয় অনুমান করা কঠিন নয়।

প্রাচীন গ্রন্থে নৃত্যের উল্লেখ—রাজতরঙ্গিনীতে আছে যে, ৭৬৫ খৃষ্টাব্দে পুণ্ড্রবর্ধন নগরে কাশ্মীররাজ জয়াপীড় এসেছিলেন। সন্ধ্যাকালে তিনি ছদ্মবেশে যখন নগরে প্রবেশ করেন, তখন কার্তিকেয় মন্দিরে দেবনর্তকী কমলার নৃত্য

নৈপুণ্য দেখে মুগ্ধ হন। এতে প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশেও এককালে দেবদাসী প্রথা ও দেবদাসী নৃত্যের প্রচলন ছিল।

বাংলা সংস্কৃতির যথার্থ ইতিহাস পাওয়া যায় 'সেন' রাজত্বকালে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে কবি জয়দেবের আবির্ভাব হয়। জয়দেবের নীলাচলে পদ্মাবতী নামে এক নৃত্যকুশলা দেবদাসীকে বিবাহ করেন। কথিত আছে যে, পদ্মাবতী সঙ্গীতে নিপুণা এবং দেবদাসীদের মার্গ নৃত্যে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে উমাপতি ধর, ধোয়ী প্রভৃতি কবিরা বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। 'পবনদূত' রচয়িতা ধোয়ীর কাব্যে নৃত্যকুশলা গন্ধর্বকন্যার নৃত্যের খ্যাতির উল্লেখ ছিল এবং তিনি লক্ষ্মণ সেনের প্রতি-আসক্ত ছিলেন। ১২০৫ খৃষ্টাব্দে মহামাণ্ডলিক শ্রীধর দাস সঙ্কলিত সদুক্তিকর্ণামৃতেও নৃত্যের উল্লেখ আছে। রাজা লক্ষ্মণ সেন সঙ্গীতপ্রিয় এবং স্বয়ং সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। এঁর পূর্বপুরুষরা কর্ণাটদেশের ব্রাহ্মণ ছিলেন। সঙ্গীতপ্রিয়তা এঁদের জন্মগত ছিল। এই সময় নট গাঙ্গোকের উল্লেখও আছে। সঙ্গীত, কাব্য প্রভৃতি আর্যভাষা সংস্কৃতে রচিত হত। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, এক সময় মার্গ সঙ্গীতও প্রচলিত ছিল। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করবার মত যে, আর্যসংস্কৃতির সঙ্গে অনার্য-সংস্কৃতিরও প্রচলন ছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে বাংলাদেশে তুর্কীদের আগমন হয়। এর পর বাংলাদেশে কিছুকাল অরাজকতা চলে। এই সময় বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে বিপদ ঘনিয়ে আসে। ধর্মও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। যে আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মিলন বহু পূর্বেই সুরু হয়েছিল তা ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ করেছিল এই আক্রমণের পূর্বেই।

বাংলা সংস্কৃতির যুগে 'ইলিয়াস সাহী' বংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এঁদের সময় থেকে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে শিল্প ও জ্ঞানের চর্চা সুরু হয়েছিল। বাংলার স্বনামখ্যাত রাজা ও তাঁর বিধর্মী পুত্র জালালুদ্দীন বিদ্যোৎসাহী ও কলারসিক ছিলেন। এঁর সময় রচিত কৃত্তিবাস 'রামায়ণে' নৃত্যগীতের উল্লেখ আছে। তাঁর রাজত্বকালে অর্থাৎ চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর ভেতর চর্যাপদগুলির ভেতর নৃত্যের উল্লেখও আছে। কিন্তু এই সব নৃত্যগীত অভিজাত সম্প্রদায়ের ভেতর প্রচলিত ছিল না।

মুসলমানদের আগমণে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম নির্মূল হল এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের

প্রভাব প্রশমিত হল বটে, কিন্তু বৌদ্ধ, আর্য ও অনার্য দেবতারা এক হয়ে গেলেন। এই সময় যে সকল গীতধর্মী বা নাট্যধর্মী কাব্য রচিত হতে লাগল, তা' মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত হ'ল। মঙ্গলকাব্য অর্থাৎ মনসা, চণ্ডী প্রভৃতির কাহিনী নৃত্য ও গীতের সঙ্গে অভিনীত হতে লাগল। গ্রামবাসীদের কাছে এই ধরণের নৃত্য ও গীত বিশেষ সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হল। এই নৃত্যগীত গ্রামীন সংস্কৃতিকে আশ্রয় করেছিল। এই সকল কাব্যে অনার্য দেবতারা কখনও দেবতার বাহন হয়ে মানুষের অনিষ্টকারী হয়েছেন, কখনও বা আর্য দেবতারাও অনার্য দেবতাদের মত রুদ্ররূপ ধারণ করে মানুষের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিয়েছেন। অবশেষে নানারকম প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে নিজেদের পুজো প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এইভাবে আর্য ও অনার্য দেবতারা মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছেন।

এর পর হোসেন শাহের রাজত্বকালে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয় এবং সংস্কৃতি ও সাহিত্যে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে। এই সময় বাংলার কৃষ্টি কি রকম ছিল তা শ্রদ্ধেয় শ্রীসুকুমার সেনের উক্তিটি থেকে উদ্ধৃত করছি—"রামায়ণ কাহিনী, মঙ্গলচণ্ডী ও বিষহরির পাঁচালী এবং কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা কাহিনী নৃত্য ও বাদ্য সহযোগে গীত হত। কালীয়দমন গীত, শিবের গীত, দুর্গা ও লক্ষ্মীর গীত প্রতিদিনের কাজকর্মের মধ্যে আনন্দের যোগান দিত।" সুতরাং দেখা যায়, এই ব্রতকথা, উপকথাগুলি গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে প্রচার করা হত। কিন্তু মহাপ্রভুর আবির্ভাবে সংস্কৃতির ধারা পরিবর্তিত হ'ল। বৈষ্ণব সাহিত্যের সমাদর বৃদ্ধি পেল। সাহিত্যে, নৃত্যে ও গীতে একটি উচ্চস্তরের ভক্তিরসের ভাবধারা প্রবাহিত হতে লাগল। কীর্তনের সঙ্গে ভাবোন্মাদে নৃত্য করা হতে লাগিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর এই জাতীয় নৃত্যের বর্ণনা আছে।

১৫৫০ খৃষ্টাব্দকে কৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল বলে অনুমান করা হয়। কৃষ্ণ-কীর্তন বাংলার একটি নিজস্ব নাট্যগীতি। নৃত্য, গীত ও অভিনয়ে কৃষ্ণকীর্তন চিরকালই বাঙালীর অন্তর জয় করেছে। এর পর চপ্‌ কীর্তনের প্রবর্তন হয়। চপ্‌ কীর্তনেও নেচে অথবা অভিনয় করে গান করা হয়।

মহাপ্রভুর সময় থেকেই শিক্ষিত সমাজে 'মঙ্গল' সাহিত্যের প্রভাব কমতে লাগল। কিন্তু গ্রামে এর প্রভাব বিশেষ কমল না। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের মধ্যে দেহতত্ত্ব শিক্ষামূলক

বাউল গানের প্রচলন হয়। বাউলরা পায়ে ঘুঙুর বেঁধে হাতে একতারা নিয়ে গান গাইতে গাইতে গ্রামের মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। সুতরাং বাংলাদেশ মার্গনৃত্যের পীঠভূমি বলে দাবী করতে না পারলেও লোকসংস্কৃতিতে বাংলা গৌরবান্বিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাংলাদেশে ভক্তিমূলক সঙ্গীতের সমান্তরালভাবে আদিরসাত্মক সঙ্গীতের আবির্ভাব হল। 'ঝুমুর,' 'খেমটা,' আখড়াই প্রভৃতি এই শ্রেণীভুক্ত। সাধারণতঃ গ্রামের পেশাদারী নর্তকীরা এই নাচ নাচত। পরবর্তীকালে কীর্তন থেকে 'পাঁচালী' গানের উদ্ভব হল। এতে একজন পাত্র সাজসজ্জা করে গীতের সঙ্গে নৃত্য করে গীতের ভাবার্থ ব্যক্ত করতেন। এই 'পাঁচালী' থেকেই যাত্রা গানের সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীকালে যাত্রায় নৃত্যের সংযোগ হয়েছিল। নৃত্যের অধিকাংশই কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে করা হত না। কখনও কখনও অভিনয় করে অথবা কখনও কখনও পায়ের তালের কসরৎ প্রদর্শিত হত।

ধনী জমিদার গৃহে বাইরের থেকে আমন্ত্রিত বাঈজীরা এসে নৃত্য প্রদর্শন করতেন। তাঁরা অধিকাংশ কথকের আঙ্গিকে নাচতেন। এসব স্থানে জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ ছিল। এর ফলে শিক্ষিত সমাজ থেকে নাচ প্রায় অন্তর্হিত হ'ল এবং নাচ সম্বন্ধেও পুঞ্জীভূত ঘৃণা মানুষের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রাখল।

বিকল্প হিসেবে শিক্ষিত সমাজে থিয়েটারের উদ্ভব হল। প্রথমে মুষ্টিমেয় ধনী সম্প্রদায় থিয়েটারের নেশায় মেতেছিলেন। কিন্তু ন্যাশন্যাল থিয়েটারের সঙ্গে জনগণের সম্বন্ধ স্থাপিত হ'লে থিয়েটার জনসমাদর লাভ করে। থিয়েটারের ভেতরও সখীদের অথবা দেববালাদের নাচ থাকত। এই সময় বিখ্যাত নাট্যকার স্বর্গত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ নৃত্যধর্মী 'আলিবাবা' নাটক রচনা করেন।

আধুনিক যুগ ও রবীন্দ্রনাথ—১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বাংলার নৃত্যের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে। নৃত্যের যখন এই রকম অবহেলিত ও অসম্মানজনক অবস্থা, তখন পরিমার্জিত ও পরিশুদ্ধ করে একে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একটি সম্মানীয় পদে অধিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রকারদের ব্যাকরণগত বিধিনিষেধের অর্গল ভাঙলেন বটে, কিন্তু

তিনি তাঁদের প্রবর্তিত আত্মিক ভাবাধরার সঙ্গে নিজস্ব মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর সামঞ্জস্য করে নৃত্যের অভিনব রূপ দান করলেন। তাই তাঁর কণ্ঠে গীত হল —

"নৃত্যের তালে তালে নটরাজ, ঘুচাও সকল বন্ধ হে।"

বর্ষামঙ্গলে তাঁর স্বরচিত গানগুলির সঙ্গে নৃত্যের সংযোজন হ'ল। এটাই হচ্ছে নৃত্যের মাধ্যমে উন্নততর ভাব প্রকাশের প্রথম প্রচেষ্টা। এর পর নটীর পূজার নৃত্যের ছন্দ ও প্রকাশভঙ্গী আরও সহজ ও স্বচ্ছ হয়ে উঠল। প্রতিমা দেবীর ভাষায় বলি—"সহজ ও স্নিগ্ধ তার গতি।" নৃত্যকে আরও উন্নততর করবার প্রচেষ্টা তখনও চলছিল। রবীন্দ্রনাথ ব্যাকরণের শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেললেন। যে দেশে যা দেখে তাঁর সুন্দর লেগেছে তিনি তাই সুকৌশলে প্রয়োগ করেছেন। ঋতুরঙ্গে তিনি যবদেশীয় নৃত্য পদ্ধতির প্রয়োগ ও পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করেছেন। চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য মণিপুরী নৃত্যের আধারে ও আঙ্গিকে রচিত হয়েছিল। কবিগুরু এই মৃদু, কোমল ও ললিত অঙ্গভঙ্গিযুক্ত মণিপুরী নৃত্যকেই বিশেষ পছন্দ করেছিলেন। মণিপুরী নৃত্যের অনুকরণে রাবীন্দ্রিক নৃত্যে 'মুখজ' অভিনয় অপেক্ষা দেহরেখা ও ছন্দের ওপর বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণভারতের কথাকলি নৃত্যের আঙ্গিক ও তালের ছন্দকেও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কথাকলি নৃত্যের মুদ্রার বাহুল্যকেও তিনি বর্জন করেছিলেন। এই দুটি শাস্ত্রীয় নৃত্য পদ্ধতিই লোকনৃত্যের ভিত্তিতে রচিত। রবীন্দ্রনাথ ভরতনাট্যম ও কথককে অপাংক্তেয় করে রেখেছিলেন। প্রতিমা দেবী বলেছেন—"চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে আমরা একটি জিনিস পুরাতন প্রথা অনুযায়ী গ্রহণ করিনি, সেটি হচ্ছে দক্ষিনী ও উত্তর ভারতীয় ঘাড় ও চোখের খেলা।" তাঁর মতে পুরাকালে যখন আরবী ও পারশী প্রভাব ভারতীয় সঙ্গীতের উপর ছায়াপাত করেছিল সেই সময় নাচের ওই চোখ ও ঘাড় নাড়ার ভঙ্গীও সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে আমাদের নৃত্যে এসে পড়েছিল, সেইজন্য অন্য কোন এদেশীয় লোকনৃত্যে এই ভঙ্গীগুলি চোখে পড়ে বলে জানি না।" কিন্তু এই কথাটি সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে দ্বিধা হয়। কারণ ১ম খৃষ্টাব্দ থেকে রচিত যতগুলি সঙ্গীতশাস্ত্রের কথা জানা গিয়েছে, তাতে আঙ্গিক অভিনয়ের ভেতর গ্রীবাভেদ, অক্ষি, অক্ষিপুট ও ভ্রূভেদের উল্লেখ আছে। হিন্দুশাস্ত্রের ভিত্তিতে রচিত সঙ্গীতশাস্ত্রগুলিতে ভারতীয় নৃত্যের ব্যাখ্যাই বিশদভাবে করা হয়েছে। সুতরাং এগুলি বাইরের জিনিস হতে পারে না। অবশ্য আজকাল

শান্তিনিকেতনে কথাকলি নৃত্যের অধ্যাপকদের শিক্ষাধারায় এই বাধানিষেধ বিশেষভাবে অনুসৃত হয় না। ভরতনাট্যম ও কথকনৃত্যকে কবিগুরু গ্রহণ করেন নি। কারণ নৃত্যের তখন শৈশব অবস্থা। শৈশব অবস্থায় তাকে বিশেষ যত্নে পালন করা দরকার, যাতে কোন দূষিত বস্তু তার অনিষ্ট করতে না পারে। কারণ চারদিকে পঙ্কবেষ্টিত পঙ্কজের অবস্থার মত ভরতনাট্যম ও কথকের অবস্থা ছিল। কিন্তু আধুনিক কালে সেই সকল পঙ্কের অপসারণে মালিন্যমুক্ত পঙ্কজগুলি ক্রমশঃ সমাজে ব্যাপক সমাদর লাভ করছে। সুতরাং এখন রবীন্দ্র নৃত্যে এর প্রয়োগ দেখা যায়।

বাংলাদেশে নৃত্যনাট্যের থেকে বাচিক-অভিনয়ের বেশী প্রয়োগ ছিল। যাত্রা বা থিয়েটারে বাচিক অভিনয়ের সঙ্গে নৃত্যের কিছু কিছু প্রচলন ছিল। তাই বলে নৃত্য মুখ্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথ প্রথম চিত্রাঙ্গদা নাটকটিকে সম্পূর্ণ-ভাবে নৃত্যের মাধ্যমে রূপ দিয়ে এক বিস্ময় সৃষ্টি করেন। এতে তিনি ইউরোপীয় নৃত্যনাট্যের উন্নততর গ্রন্থনাপদ্ধতিকে গ্রহণ করেন। বাংলার নৃত্যের ইতিহাসে এটি একটি দৃঢ় পদক্ষেপ।

সমাজের বন্ধন ছিন্ন করে তিনি বাঙালী তরুণ তরুণীদের উপযুক্ত নৃত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং নৃত্যকে শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেন। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ তাঁর রচনায় লিখেছিলেন যে "রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং নৃত্যশিল্পী ছিলেন না। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের শুধুমাত্র নৃত্যশিল্পী করে তোলবার বাসনাও তাঁর ছিল না।" কিন্তু নৃত্যের ভেতর সৌন্দর্যের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। প্রাচীনকালে অন্যান্য কলাবিদ্যার ভেতর নৃত্যকেও গণ্য করা হত। সেইজন্যে তিনি চেয়েছিলেন যে, অন্যান্য কলাবিদ্যার সঙ্গে নৃত্যও শিক্ষিত সমাজে গৃহীত হয়ে শান্তির প্রলেপ লেপন করুক। তাঁর নৃত্যনাট্যগুলির ভেতর যে বিশ্বমানব বাণী ধ্বনিত হয়েছে তা শিক্ষিত সমাজে সাগ্রহে ও সমাদরে গৃহীত হয়েছে। যাঁরা প্রথম রাবীন্দ্রিক নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের ভেতর নন্দিতা দেবী, শ্রীমতি ঠাকুর ও শান্তিদেব ঘোষের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়।

এই সময় নৃত্যের জগতে ভারতের সর্বত্র প্রাণ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজে নৃত্যের প্রচলনের জন্য চেষ্টা চলতে লাগল। এই বিষয়ে আরও একজন পথিকৃৎ পথ দেখিয়েছিলেন। ইনি হচ্ছেন বিশ্ববিশ্রুত

নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর। উদয়শঙ্কর পাশ্চাত্যে গিয়ে প্রাচ্যের ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করলেন। রূপসজ্জায়, সঙ্গীতে, নৃত্যের আঙ্গিকে, মঞ্চসজ্জায় প্রাচ্যের ভাবধারা যেন মূর্ত হয়ে উঠল। ভারতের ভাস্কর্যে যেন প্রাণ সঞ্চার হ'ল। উদয়শঙ্কর স্বয়ং চিত্রশিল্পী ছিলেন বলে ভারতের চারুকলার উৎসটি কোথায় তা অনুভব করতে পেরেছিলেন। তিনি মন্দির ও পাহাড়ের গুহাশিল্পের অনুকরণে পোষাক তৈরী করলেন। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি থেকে বিষয়বস্তু গ্রহণ করে ভারতীয় ঐতিহ্যকে নৃত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। পাশ্চাত্য জগৎ এই নৃত্য দেখে মোহিত হ'ল এবং সেই যুগে এই ধরণের নৃত্য প্রাচ্য (oriental) নৃত্য বলে পরিচিত হ'ল। বিদেশীরা এতে যে কত আকৃষ্ট হয়েছিলেন ভারতীয় নৃত্যের প্রতি তা বিদেশী নর্তকীদের ভারতীয় নৃত্য শিক্ষার আগ্রহ দেখেই বুঝতে পারা যায়। বিদেশী নর্তকী এ্যানাপাবলোভা উদয়শঙ্করের নায়িকা হয়ে রাধাকৃষ্ণ নৃত্যে অবতীর্ণ হন। বিদেশী নর্তকী রাগিনী দেবী গুরু গোপীনাথের সঙ্গে মঞ্চে অনেকবার অবতীর্ণ হন এবং বহুদিন পর্যন্ত ভারতীয় নৃত্য শিক্ষা করেন। আমেরিকার নর্তকী লা মেরী ভারতে এসে সাত বছর ভারতীয় নৃত্য শিক্ষা করেন। উদয়শঙ্করের খ্যাতির মূলে বিদেশী নৃত্যশিল্পী সিম্কীর দান অবশ্যই স্বীকার্য। এছাড়া জোহরা, উজারা, অমলাশঙ্কর, লক্ষ্মীশঙ্কর, দেবেন্দ্রশঙ্কর ও রবিশঙ্করের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এককালে অনেক গুণী উদয়শঙ্করের নৃত্যবাসরকে মুখরিত করেছিলেন। বিশ্ববিশ্রুত আল্লাউদ্দীন খাঁ সাহেবও তাঁর সম্প্রদায়ে যোগদান করেছিলেন। উদয়শঙ্করের নৃত্যে গীতের পরিবর্তে সমবেত যন্ত্রসঙ্গীতের প্রয়োগ হয়েছিল। এটাও একটি যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ পাশ্চাত্য অর্কেস্ট্রার অনুকরণে অনেকগুলো বাদ্যযন্ত্র সমবেতভাবে নৃত্যের সঙ্গে সহযোগিতা করল। এই অর্কেস্ট্রা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সুবিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক শ্রীতিমিরবরণ। নৃত্যের সঙ্গে সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত যে সুষ্ঠভাবে সহযোগিতা করতে পারে তার প্রথম নিদর্শন তিনিই দিলেন। সমবেত বাদ্যযন্ত্রসঙ্গীত নৃত্যের বৃত্তি বা Mood কে প্রকাশ করতে বিশেষ সহায়ক হ'ল। উদয়শঙ্করের সহধর্মিনী অমলাশঙ্কর তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারিনী। তিনি উদয়শঙ্করের ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন।

বাংলাদেশে আধুনিককালে নৃত্য যে পর্যায় এসেছে তার পেছনে অনেক

কৃতি নৃত্যশিল্পী, প্রযোজক ও যন্ত্রশিল্পীর অবদান আছে। এর একটি ধারাবাহিক বিবর্তনের ইতিহাস দেবার চেষ্টা করছি। এতে বাঙালী ছাড়া অন্য প্রদেশের শিল্পীদের অবদানও অস্বীকার করা যায় না।

শান্তিনিকেতনে মণিপুরী নৃত্যের অধ্যাপক হয়ে শ্রীনবকুমার যোগদান করেন। এর পর সেনারিক রাজকুমারও মণিপুরী নৃত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কথাকলি নৃত্যের অধ্যাপক শ্রীকেলু নায়ার আসেন। শ্রীবালকৃষ্ণ মেননও কিছুদিন অধ্যাপনা করেন। এঁরা নানান্ নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দেন।

ভারতের নৃত্যজগতে বাঙ্গালী নৃত্য প্রযোজক শ্রীহরেন ঘোষের দান অনস্বীকার্য। তিনি ভারতের বিভিন্ন নৃত্যশৈলীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কলকাতার দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেন। তিনি ১৯৩৩, ১৯৩৫, ১৯৩৬, ১৯৩৭ ও ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা কলকাতায় নৃত্য প্রদর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩০, ১৯৩৩, ১৯৩৫ ও ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে উদয়শঙ্করের নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বালা সরস্বতীকে ; ১৯৩৪ ও ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে মায়া টাকিকে, ও বার্মার পোয়ে নৃত্যদলকে ; ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে এণাক্ষী রমা রাওকে, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ছউ নৃত্য সম্প্রদায়কে কলকাতায় এনে নৃত্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সময়ে সাধনা বোস, মণিপুরী নৃত্য সম্প্রদায়, ও রুক্মিণী দেবী হরেন ঘোষের প্রযোজনায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে নৃত্য প্রদর্শন করেন। সেই সময়ের কুশলী চিত্রাভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী সাধনা বোস শাস্ত্রীয় নৃত্যকে পরিহার করে ছোট ছোট কাহিনীকে নৃত্য ও বাচিক অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেন। সমকালীন নৃত্যশিল্পী ও চিত্রাভিনেত্রী লীলা দেশাইয়ের নামও বাংলার নৃত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। এঁদের আগে শ্রীমণিবর্ধন অভিজাত সম্প্রদায়ের মেয়েদের নিয়ে নৃত্যবাসরের আয়োজন করেন। এই প্রসঙ্গে স্বর্গত শ্রীবুলবুল চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলার নৃত্যশিল্পীরা বাংলার বাইরে গিয়েও নৃত্য প্রদর্শন করতে লাগলেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত নৃত্যকে একটি লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হচ্ছিল। শ্রীসমর ঘোষ, শ্রীঅতীনলাল প্রভৃতি বিভিন্ন দল গঠন করে বিভিন্ন জায়গায় নৃত্য প্রদর্শন করেন। এই সময় শ্রীরবি রায় চৌধুরী নৃত্যে সুর সংযোজন করে

একটি নতুন দিগন্ত উদ্‌ঘাটিত করলেন। নৃত্যের প্রত্যেকটি আঙ্গিক সুর ও মূর্চ্ছনায় মূর্ত হয়ে উঠল। এটি তাঁর নৃত্য জগতে বিশেষ অবদান।

বহিরাগতদের মধ্যে ব্রজবাসী সিংহ, গোপাল পিল্লাই যথাক্রমে মণিপুরী ও কথাকলি নৃত্যের শিক্ষা দিয়ে কলকাতার আসর জমিয়ে তোলেন। এই সময় লক্ষ্ণৌ ঘরানার দিকপাল ওস্তাদ ঝণ্ডে খাঁ তাঁর অতুলনীয় জ্ঞানভাণ্ডার ও প্রতিভা নিয়ে কলকাতায় এসে উপস্থিত হন্। এ ছাড়া শ্রীশম্ভু মহারাজ, মেনকা দেবী, কমলেশ কুমারী, রামগোপাল, মৃণালিনী সারাভাই, জয়লাল, সোহনলাল ইত্যাদি গুণীরাও কলকাতায় এসে নৃত্যের আসর জমিয়ে রাখেন। কিন্তু বাঙ্গালীদের ভরতনাট্যম নৃত্যে শিক্ষাগ্রহণ করবার সুযোগ তখনও আসে নি।

ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে পরাধীনতার গ্লানি শিল্পীদের সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গবার জন্যে জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদেরও প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। এই সময় কতকগুলি স্বাধীনতামূলক নৃত্যনাট্য রচিত হয়। তার মধ্যে 'Discovery of India', 'My country' 'অভ্যুদয়' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। Discovery of India যদিও বোম্বাই প্রদেশের অবদান, তবুও এতে বহু প্রতিভাবান বাঙ্গালী শিল্পী ছিলেন।

এই যুগে নৃত্যে একটি পরিবর্তন দেখা দিল। নৃত্যের প্রত্যেকটি গতিভঙ্গী পদবিক্ষেপ ও ভাবাভিনয়ের সঙ্গে সুরের আশ্চর্যজনক সামঞ্জস্য বিধান করে সুর সৃষ্টি হতে লাগল। নৃত্য যেন সঙ্গীতের সাহায্যে আরও মুখর হয়ে উঠল। নৃত্যের সঙ্গে স্বরবিন্যাসের এইরকম সামঞ্জস্য করে নূতনত্বের সৃষ্টি করেন শ্রীরবি রায় চৌধুরী। নৃত্যনাট্যে সৌন্দর্য বর্ধনে আমরা আরও একজনের দান অস্বীকার করতে পারি না। আশ্চর্যজনকভাবে আলোকসম্পাত করে নৃত্যের সৌন্দর্য শতগুণ বাড়িয়ে দেন শ্রীতাপস সেন। তাঁর পূর্বে রঙ্গমঞ্চে নৃত্যের ক্ষেত্রে ঠিক এই ধরণের আলোকপাত হত না। তাপস সেনের পরবর্তীকালে অনেকে এই বিষয়ে দক্ষতা দেখিয়েছেন, কিন্তু পথিকৃৎ হিসেবে তাঁর নামই সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। অভ্যুদয় নৃত্যনাট্যে অনেক খ্যাতিমান সাহিত্যিক, নৃত্যশিল্পী সঙ্গীতশিল্পী যোগদান করেছিলেন। সকলের মিলিত চেষ্টায় 'অভ্যুদয়' অদ্ভুত সফলতা লাভ করেছিল। এতে কয়েকটি নৃত্য ছাড়া শ্রীপ্রহ্লাদ দাস

সামগ্রিকভাবে নৃত্য পরিচালনা করেছিলেন। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব ছিল শ্রীসুকৃতিসেনের ওপর এবং গ্রন্থনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন বিখ্যাতসাহিত্যিক শ্রীপ্রবোধ সান্যাল। এতে ধ্রুপদী নৃত্য বা সঙ্গীতের প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং সেইদিক দিয়ে এই নৃত্যনাট্যটি বিচার্য বিষয় নয়। কিন্তু এর দেশাত্মবোধক অনুভূতি সেই যুগে প্রত্যেক শিল্পীকে উদ্দীপ্ত করেছিল এবং দর্শকদের ভেতরও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। শ্রীযুক্ত প্রহ্লাদ দাস নৃত্যনাট্যটিকে অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত করেছিলেন। পরবর্তীকালে এর অনুকরণে অনেক নৃত্যনাট্য রচিত হয়।

'আমার দেশ' নৃত্যনাট্যটির নৃত্য পরিচালনা ও সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব যথাক্রমে শ্রী অতীনলাল ও শ্রী রবি রায় চৌধুরীর ওপর ন্যস্ত ছিল। এটি একটি সার্থক দেশাত্মবোধক নৃত্যনাট্য বলে পরিগণিত হয়েছিল। এই নৃত্যনাট্যটি সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। অর্থাৎ নৃত্যের শিল্পচাতুর্যের থেকে নাটকের ভাবপরিবেশের ওপর বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। সেই পরাধীনতার যুগে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা মানুষকে উন্মাদ করে তুলে ছিল। সেইজন্যে সহজেই দেশাত্মবোধক নৃত্যনাট্যগুলি দর্শকের অন্তর স্পর্শ করতে পেরেছিল। একে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যে মণিশঙ্কর ও প্রভাত ঘোষের উদ্যম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রহ্লাদ দাস, মণিশঙ্কর, অনাদি প্রসাদ, শম্ভু ভট্টাচার্য প্রভৃতি বাংলা নৃত্য জগতের উজ্জ্বল তারকা।

এই সময়ে সমস্ত ভারতে নৃত্যনাট্য রচনায় একটি অদ্ভুত আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিষয়ে নিঃসন্দেহে বাংলা অগ্রণী ছিল। একমাত্র বাংলাদেশই নৃত্যকে নতুন ভাবধারায় উদ্দীপ্ত করে, সনাতন নৃত্যের বন্ধন ভেঙ্গে তাকে যুগোপযোগী করে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় অপরূপ করে যখন বিশ্ব সভায় উপস্থিত করল, তখন তার মনোমুগ্ধকর রূপেরচ্ছটায় চারিদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এতে নৃত্যশিল্পীর স্বাধীনতা বহুগুণ বেড়ে গেল। কারণ সনাতন নৃত্যগুলিকে নাটকের চরিত্র, কাল ও পরিবেশ অনুযায়ী পরিবর্তন করা হতে লাগল। অর্থাৎ এক কথায় বলা যেতে পারে যে, নৃত্যের মধ্যে মিশ্রণ সুরু হল এবং এটাই আধুনিক নৃত্যে একটি বৈশিষ্ট্য দান করল। এতে সুফলের সঙ্গে কুফলও দেখা দিতে লাগল। কারণ নৃত্যনাট্য পরিচালনা করতে হ'লে শাস্ত্রীয়নৃত্যের ওপরও পূর্ণ জ্ঞান থাকা চাই। তা না হ'লে পরিমাণবোধ আসে

না এবং এই বোধ না থাকলে উচ্চস্তরের নৃত্যনাট্য সৃষ্টি করাও সম্ভব হয় না। অধিকাংশক্ষেত্রে নৃত্যপরিচালকের নৃত্যের কুশলতা প্রদর্শনের অতি উৎসাহ নাটকের রস নষ্ট করে দেয় অথবা নৃত্যনাট্যের ভাব রক্ষা করতে গিয়ে নৃত্যনাট্যকে মূকাভিনয়ে পরিণত করে। অর্থাৎ নৃত্ত এবং নৃত্যের সুন্দর সমন্বয় হওয়া চাই।

অনেকে এই মিশ্রণকে ভাল চোখে দেখেন না। তাঁদের মতে কোন একটি বিশেষ পদ্ধতির শাস্ত্রীয় নৃত্যকে অবলম্বন করে নৃত্যনাট্য রচনা করা উচিত। তা না হলে নৃত্যের কৌলিন্য রক্ষা করা যায় না। এ কথাও ভাববার বিষয়। কিন্তু মিশ্রণ তো কালের প্রবাহে অগোচরে সকল নৃত্যশৈলীর ভেতরই এসে পড়েছে। আধুনিক যুগে আমাদের মধ্যে প্রাদেশিকতা বোধ তীব্র হয়ে উঠেছে এবং আমরাও আমাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে বিশেষ যত্নবান হয়েছি। কিন্তু বৈশিষ্ট্যের নামে আমরা অজ্ঞাতসারে সঙ্কীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি কি না তাও ভেবে দেখবার বিষয়। বৈশিষ্ট্য ও সঙ্কীর্ণতা এক জাতীয় নয়। আমরা যখন শাস্ত্রীয় নৃত্যের বিশেষ শৈলীতে নাচব তখন তার বৈশিষ্ট্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। কিন্তু আমরা যখন কোন নৃত্যনাট্য সৃষ্টি করব তখন কয়েকটি বিষয়ে আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। বিষয়বস্তু, চরিত্র, রূপসজ্জা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রেখে নৃত্যের প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজন বোধে নৃত্যের ব্যকরণকে ভেঙ্গে চুরে গড়তে হবে। দেড়শ বছর আগে ভরতনাট্যম, কথক, কথাকলি ও মণিপুরী নৃত্যের যে আঙ্গিক ছিল এখনও কি তাই আছে? যুগধর্মের সঙ্গে মিশ্রণকে আমরা সুস্থমনে গ্রহণ করতে পারছি না কেন? কারণ আমরা যা গ্রহণ করছি তা তো ভারতেরই জিনিস। দুই বা ততোধিক মৌলিক উপাদানের মিশ্রণে রাসায়নিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন কোন রাসায়নিক দ্রব্যের উৎকর্ষ অথবা গুরুত্ব কোন মৌলিক উপাদান থেকে কম নয়।

আধুনিক নৃত্যনাট্যে অভিনয়—আধুনিক নৃত্যনাট্যে আঙ্গিক, বাচিক আহার্য, এই তিন রকম অভিনয়েরই আশ্রয় নেওয়া হয়। কিন্তু এই বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। অনেকের মতে নৃত্যাভিনয়ে নেপথ্যে বাচিক অভিনয় অথবা গীতের কোন প্রয়োজনই হয় না। কারণ নৃত্যকে বলা হয়েছে Gesture o language. এ কথা খুবই সত্য। তবু বলি নৃত্যের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সৌন্দর্য সৃষ্টি এবং নিজের মনের ভাবকে অপরের মনে সঞ্চারিত করা। এই ভাবের

আদান প্রদান ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে গীতের প্রয়োজন আছে বই কি। গীতের কাব্যিক ভাষা ও ভাষার সঙ্গে সুরের ইন্দ্রজাল নৃত্যের ভাব প্রকাশে বিশেষ সহায়ক। অনেক সময় যেমন ভারী জিনিষ ওঠাতে হ'লে অপরের একটু সাহয্যেই তা সম্ভবপর হয়; নৃত্যেও সেইরকম গভীর তত্ত্বমূলক গূঢ় অর্থ প্রকাশে গীতের সাহচর্য বিশেষ সহায়তা করে। ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য হচ্ছে দর্শনভিত্তিক। সেইজন্যে অনেক সময় abstract ভাব (নির্বস্তু) শুধুমাত্র আঙ্গিক অভিনয়ের দ্বারা যেখানে সরলভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না সেখানে নেপথ্যে দুই একটি শব্দের সাহায্যেই তা প্রকাশমান হয়ে ওঠে। কিন্তু একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, ভাষা যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত না হয়ে ওঠে। ভাষার কাজ হচ্ছে সকলের অলক্ষ্যে কেবলমাত্র সৌন্দর্যের সহায়ক হয়ে স্নিগ্ধ ও মৃদু সৌরভের মত সানন্দ রসানুভূতি সৃষ্টি করে আমাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন রাখা।

মঞ্চসজ্জা—মঞ্চসজ্জা নৃত্যনাট্যে প্রয়োজন কি না, এও বিচার্য বিষয়। বহু প্রাচীনকালে নাটক প্রভৃতি অভিনীত হবার সময় যুগধর্ম অনুসারে মঞ্চসজ্জার যে রীতি ছিল তা আমরা নাট্যশাস্ত্রে পাই। কিন্তু মধ্যযুগে রঙ্গমঞ্চ অথবা মঞ্চসজ্জা বলে বিশেষ কোন ব্যাপার ছিল না। তখন দু ধরণের মঞ্চে শিল্পীরা নৃত্য করতেন। একটি মন্দির অথবা মন্দিরপ্রাঙ্গণে আর একটি দরবার বা আসরে। ভক্তিমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠান বা ভক্তি মূলক নৃত্য আলেখ্যগুলি মন্দিরে বা মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হত। নবাব বা রাজদরবারে নিতান্ত আমোদের জন্যেই নৃত্য বা গীতানুষ্ঠানগুলি হত। শিল্পীদের আসরের মধ্যেখানে নৃত্য বা অভিনয় করতে হত। দর্শকরাও চারিদিকে গোল হয়ে বসতেন। দর্শক ও শিল্পীদের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকত না। শিল্পীরাও তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের দোষত্রুটী নিয়ে দর্শকদের সম্মুখে উপস্থিত হতেন। দর্শকরাও এতে অভ্যস্ত ছিলেন বলে অভিনীত চরিত্রগুলি তাঁদের কাছে সজীব হয়ে উঠত। এ ছাড়া গ্রামের কোন নির্দিষ্ট স্থানে মণ্ডপ তৈরী করেও রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ইত্যাদি অভিনীত হত এবং এই সব পালাতে নৃত্যগীতের প্রাচুর্য থাকত। গ্রামবাসীরা চারদিকে গোল হয়ে বসে এইসব অনুষ্ঠান উপভোগ করতেন।

এখন যুগের সঙ্গে রুচির পরিবর্তন হয়েছে। ইংরেজের কৃপায় ইংরেজী শিক্ষায় ও ভাবধারায় আমরা ভাবিত হয়েছি। এর সুফল ও কুফল আমরা দুইই ভোগ

করছি। প্রাচ্য চিরকালই আদর্শবাদী। কিন্তু পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে আমরা বাস্তববাদী হয়ে উঠছি। তার ফলে শিল্পে ও নাট্যেও বাস্তবতার স্পর্শ লেগেছে। আধুনিককালে নৃত্যনাট্য অথবা নাটকগুলি বাস্তববাদী হয়ে উঠছে। একে বাস্তবমুখী করবার জন্তে সেইরকম পরিবেশ স্থষ্টির প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং পরিবেশ স্থষ্টির জন্তে মঞ্চসজ্জারও প্রয়োজন হয়।

এখন শিল্পী ও দর্শকদের ভেতর একটি গভীর ব্যবধান রচিত হয়েছে। মঞ্চের সম্মুখস্থ পর্দাটি ব্যবধানের স্থষ্টি করেছে। এই ব্যবধানের জন্তেই চরিত্রগুলি দর্শকদের পূর্বপ্রস্তুতির স্থযোগ না দিয়ে তাদের সম্মুখে একটি বিস্ময় নিয়ে আবির্ভূত হয়। মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা, আবহসঙ্গীত প্রভৃতি নাটকের পরিবেশ রচনায় সহায়তা করে। চরিত্রগুলির পর্দার আড়াল থেকে আবির্ভাব ও অন্তর্ধান সর্বক্ষণই একটি কৌতূহল স্থষ্টি করে রাখে।

নৃত্যনাট্য ও নাট্য—নৃত্যনাট্য ও নাটকের বিষয়বস্তুর ভেতর একটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। নাটকের বিষয়বস্তু সাধারণতঃ বস্তুতান্ত্রিক হয়। দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি এবং দ্বন্দ্ব বিকশিত হয়ে ওঠে। কিন্তু নৃত্যনাট্যের বিষয়বস্তু সাধারণতঃ পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত বা সংস্কৃতকাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয় অথবা কল্পনাশ্রয়ী হয়। আধুনিক বিষয়বস্তু হলেও তাতে দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বিশেভাবে তুলে ধরা হয় না। নাটকে স্থান, কাল, পাত্রের জন্তে মঞ্চসজ্জার প্রয়োজন হয় এবং যতদূর সম্ভব বাস্তব করে তোলা হয়। কিন্তু নৃত্যনাট্যে মঞ্চসজ্জার ওপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপ না করলেও চলে। অবশ্য আধুনিক নৃত্যনাট্যে মঞ্চসজ্জা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করতে চলেছে।

নৃত্যনাট্যে মঞ্চসজ্জা ব্যঞ্জনাপূর্ণ (suggestive) হলেও চলে। বড় এবং ভারী মঞ্চসজ্জা নৃত্যনাট্যে, বিশেষ উপযোগী নয়। কারণ এই ধরণের মঞ্চসজ্জা অনেকখানি স্থান অধিকার করে থাকে। শুধু তাই নয়, অতিরিক্ত মঞ্চসজ্জার প্রভাবে দর্শকের দৃষ্টি ব্যাহত হলে নৃত্যের প্রয়োজনীয়তা গৌণ হয়ে পড়ে শিল্পীর আঙ্গিক অভিনয়ের সূক্ষ্ম কারুকার্যগুলি বিরাট মঞ্চসজ্জার আড়ালে ঢাকা পড়ে। এর ফলে রসহানি হয়।

অনেকে মনে করেন, নৃত্য ক্ষেত্রবিশেষে প্রচার ধর্মী হওয়া উচিত। তা না হ'লে এর কোন সার্থকতা নেই। এ কথা আংশিক সত্যি। কিন্তু নৃত্য যখন

শিল্পকর্মকে অতিক্রম করে প্রচারের হাতিয়ার হয়ে পড়ে তখন এর শৈল্পিক মূল্য ও সর্বজনীন আবেদনটি ক্ষুন্ন হয়। কারণ শিল্প তখন স্থান ও কালের ভেতর আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তখন শিল্প অপেক্ষা প্রচারের ওপরই বেশী দৃষ্টি থাকে। কিন্তু কোন আর্টই কালজয়ী হয় না, যদি তার ভেতর সর্বজনীন আবেদনটি না থাকে। এ্যানা পাভলোভার মৃত্যুমুখী হংসী (dying swan) অথবা ইসাডোরা ডানকানের 'নীল দানিউব' নৃত্যগুলি সর্বকালের। এইগুলি কালজয়ী ও জাতিধর্মনির্বিশেষে রসিকচিত্তজয়ী। এগুলি যুগধর্মকে আশ্রয় করতে গিয়ে সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে নি।

এই অধ্যায়ে যা আলোচিত হল, তা বাংলার আধুনিক নৃত্যের উৎপত্তির প্রাথমিক অবস্থা॥ আমার জীবনের আবাল্য সঞ্চিত বাস্তব অভিজ্ঞতার একটি চিত্র বলা যেতে পারে। হয় তো আমার জ্ঞানের পরিধির বাইরে এই বিষয়ে অন্যান্য শিল্পীর অবদানও থাকতে পারে, কিন্তু তাঁদের অনুল্লেখ ইচ্ছাকৃত নয়। যাই হোক, ভবিষ্যতে আরও পরীক্ষা নিরীক্ষণের দ্বারা বাংলার আধুনিক নৃত্যকলাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে পূর্ণতর রূপদানের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব ভবিষৎ শিল্পীদের ওপর ন্যস্ত থাকল।

দেই তুলসী তিল
দেহ সমর্পিলু।—বিত্তাপতি

মণিপুরী নৃত্য

গোবিন্দজীর মন্দিরে রাসের সময় অগণিত ভক্তবৃন্দের মাঝে নৃত্য করতে করতে মণিপুরবাসীরা সত্যিসত্যিই দেহ ও হিয়া সেই রসময় কিশোর ঠাকুরটির পদতলেই অর্পণ করেন। তাঁরা মনে করেন সকলই সেই রসময়ের। নৃত্য করতে করতে এবং দেখতে দেখতে সকলেই তদ্‌গতভাবে বিভাবিত হন।

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।"

ভক্তপ্রাণ পরম বৈষ্ণব মৈতৈরাও চিরদিনের জন্যে হৃদয় মন্দিরে মাধবকে বন্দী করে আনন্দের শেষ কণিকাটুকুও আহরণ করে নিতে চান। তাঁদের আনন্দমেলায় গোবিন্দজীকে উৎসর্গীকৃত রাস নৃত্য করবার জন্যে মণিপুরী নৃত্যশিল্পীরা গোপীবেশে যখন সূক্ষ্ম ওড়নাতে মুখখানি ঢেকে, অলকাতিলকা-শোভিত হয়ে, চরণে নূপুরের ঝঙ্কার তুলে মণ্ডলীতে নৃত্য করেন, তখন মনে হয়, সত্যিই মণিপুরীদের আনন্দের অবধি নেই।

পূর্বে মণিপুরী নৃত্যকে লোকনৃত্যের ভেতর গণ্য করা হত। ইদানীং মণিপুরী নৃত্য শাস্ত্রীয় নৃত্যের মর্যাদা পেয়েছে।

মণিপুর দেশ ও নৃত্যের প্রাচীনত্ব ঃ—

মণিপুরীরা বলেন মণিপুরী নৃত্য অতি প্রাচীন। প্রায় হাজার বছর পূর্বে মণিপুরী নৃত্যের জন্ম। মণিপুরী নৃত্যের ইতিহাস দেখলে এর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কিছু অনুমান করা যায়। তবে মণিপুরী যে একটি প্রাচীন দেশ এবং এর কৃষ্টি ও সভ্যতা যে বহু প্রাচীন সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। মহাকাব্যের পৃষ্ঠায় মণিপুরের উল্লেখ আছে। মহাভারতের আদি ও অশ্বমেধ পর্বে আছে যে, বীর চূড়ামণি অর্জুন এক সময়ে দ্বাদশবর্ষব্যাপী বনবাসকালে পর্যটনে যান। এই সময় তিনি দুটি বিবাহ করেন। প্রথম বিবাহ হয় গঙ্গাদ্বারের (হরিদ্বারের) নাগবংশীয় নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা উলূপীর সঙ্গে এবং দ্বিতীয় বিবাহ হয় মণিপুরের রাজা চিত্রবাহনের কন্যা চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে। মহাভারতে আছে যে, নাগকন্যা উলূপী অর্জুনকে দেখে

মুগ্ধ হয়ে তাকে জলের নীচে পাতালে টেনে নিয়ে যান। এরপর তাঁদের বিবাহ হয় এবং ইরাবান্ নামে একটি পুত্র হয়। দ্বিতীয় বিবাহ হয় মণিপুরের রাজা চিত্রবাহণের কন্যা চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে। মূল মহাভারতে আছে—

'মণিপুরেশ্বরং রাজন্ ধর্মজ্ঞং চিত্রবাহনম্,

তস্য চিত্রাঙ্গদা নাম দুহিতা চারুদর্শনা। "আদি, ২১৩/১৫

চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহনের জন্ম হয়। বভ্রুবাহন অপুত্রক মাতামহ চিত্রবাহনের উত্তরাধিকারী হয়ে মণিপুর রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ইরাবান নাগপ্রদেশাধিপতি রূপে রাজত্ব করেন। দুই পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই পাশাপাশি রাজত্ব করতে লাগলেন এবং তাঁদের মধ্যে কলহ লেগেই রইল। ইরাবান নাগবংশীয়। গুপ্তবংশের ঠিক পূর্বে নাগবংশীয় রাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সমুদ্রগুপ্তের সময় প্রাপ্ত স্তম্ভে নাগসেন, নাগদত্ত, গণপতি নাগ প্রভৃতি রাজাদের নাম উৎকীর্ণ আছে। বায়ুপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে দুটি নাগবংশের উল্লেখ আছে। একটি বংশ পদ্মাবতীতে (মধ্যভারত) আর একটি বংশ মথুরায় রাজত্ব করেন। বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয় নাগবংশের উল্লেখ আছে। কথিত আছে যে, মণিপুরী রাজারা সিংহাসনে আরোহণের সময় সর্পচিহ্নিত অঙ্গত্রাণ, উষ্ণীষ প্রভৃতি পরেন।

মণিপুরীরা নিজেদের গন্ধর্বের বংশধর বলে পরিচয় দেন। এঁদের সঙ্গীতপ্রীতি দেখে তা অস্বীকার করা যায় না। গন্ধর্বদের অধিকাংশের বাস ছিল পুরুষপুরে (পেশোয়ার) এবং তাঁরা আর্য ছিলেন। তাঁরা সঙ্গীতকে কিভাবে ব্যবসায় হিসেবে গ্রহণ করেন পদ্মপুরাণে তার একটি সুন্দর উপাখ্যান আছে। একবার মানব, দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, নাগ প্রভৃতি বসুন্ধরাকে দোহন করেন! গন্ধর্বপতি মহামতি সুরুচিকে দোগ্ধা করেছিলেন এবং সুবিদ্বান চিত্ররথ বৎস হয়েছিলেন। বসুন্ধরাকে দোহন করবার পর মানবজাতির এক একটি শ্রেনী বিশেষ বিশেষ দ্রব্য লাভ করেছিলেন। গন্ধর্বরা পদ্মপাত্রে গীত দোহন করেছিলেন এবং এর দ্বারাই তাঁরা জীবন ধারণ করতে লাগলেন। গন্ধর্বদের ব্যবসায়ই হল সঙ্গীত পরিবেশন। সুতরাং ভারতে যে সকল সঙ্গীত ব্যবসায়ী বংশগতসূত্রে এই বৃত্তি গ্রহণ করেছেন তাঁরা নিজেদের গন্ধর্বদের বংশধর বলে দাবী করতে পারেন। মণিপুরী দুহিতা চিত্রাঙ্গদা নৃত্যগীত পটীয়সী ছিলেন। তাঁর পিতা চিত্রবাহনের সময় থেকেই শঙ্খ, বাঁশরী প্রভৃতির প্রচলন ছিল।

অনুমান করা হয়, নৃত্যে কোমল অঙ্গহারের প্রয়োগও ছিল। শঙ্খগুলি বিভিন্ন গ্রামে বাঁধা থাকত। বিশেষ বিশেষ উৎসবের সময় বিভিন্ন সুরে বেজে উঠত।

মণিপুরীরা অনার্য নাগদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। বভ্রুবাহনের সঙ্গে যুদ্ধে অর্জুন নিহত হলে নাগরাজ্য থেকে সুরঙ্গপথে মণি এনে অর্জুনের জীবন দান করা হয়। মণিপুরীরা বলেন এই মণিবাহিত সুরঙ্গপথের মুখে একটি সিংহবাহিত সিংহাসন আছে এবং এই সুরঙ্গপথ এখনও রাজবাড়ীতে আছে।

মণিপুরী পুরাণে সঙ্গীতঃ—

রাস নৃত্যেরও বহু পূর্বে লাই হারাওবা নৃত্যের প্রচলন ছিল। লাই হারাওবা নৃত্যের আরাধ্য দেবতা হচ্ছেন শিব পার্বতী। মণিপুরী পুরাণে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তাতে জানা যায় যে শিবই ছিলেন সঙ্গীতের উৎস। মণিপুরী পুরাণ 'বিজয়পাঞ্চালী' তে আছে যে, শিব তাঁর নশ্বর কান্তি পুত্র গণেশের কাছে জগৎসৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে বলেন যে, সকলের গুরু 'অতিয়াগুরুশিদবা' জগৎ সৃষ্টি করেন এবং জগতে প্রথম নৃত্য আনয়নের জন্যে কৌদিনকে আহ্বান করেন। জগৎসৃষ্টির পর দেবসভায় সিংহাসন নিয়ে ভীষণ বিতণ্ডা সুরু হয়। দেবতারা মহাদেবকে রাজা হবার জন্যে অনুরোধ করেন। মহাদেব রাজা না হয়ে মন্ত্রী হলেন এবং কার্তিক গণেশ প্রহরী হয়ে প্রহর যন্ত্রের সৃষ্টি করেন। প্রহরে প্রহরে এই যন্ত্রের ওপর আঘাত পড়ে এবং প্রহর পরিবর্তন হয়। এই অশ্রুত প্রহর বাদ্যের সঙ্গে দিনরাত্রি প্রহর পরিবর্তন করছে। এরপর খেলার প্রবর্তন হয়। এই খেলার ভেতর নৃত্যও স্থান পেয়েছিল। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে বৈষ্ণবধর্মের পূর্বে মণিপুরীরা শিবের উপাসক ছিলেন এবং শিবই ছিলেন সঙ্গীতের প্রবর্তক।

মণিপুরী নৃত্য সম্বন্ধে কিংবদন্তী

মণিপুরী নৃত্য কি ভাবে মণিপুরে প্রচলিত হল তার একটি সুন্দর উপাখ্যান আছে। একবার কৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা করেন। তাঁদের নৃত্যবাসরে কোন বিঘ্ন যেন না আসে, সেইজন্যে তিনি শিবকে দ্বাররক্ষক নিযুক্ত করেন। এই সময় পার্বতী সেখানে উপস্থিত হন এবং শিবের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি গোপনে এই রাস দেখেন। এই রাস দেখে তাঁর মনে দারুণ অভিলাষ হ'ল যে তিনিও

শিবের সঙ্গে এই রাস নৃত্য করবেন। শিব উপায়ন্তর না দেখে নৃত্যের উপযোগী একটি জায়গার সন্ধান করলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা কৈলাসপর্বতের নীচে এসে মণিপুর অঞ্চলে কৌব্রুচীং নামে শৃঙ্গ দণ্ডায়মান হন এবং চারদিকে জলবেষ্টিত স্থানটিকে নৃত্যের জন্যে মনোনীত করেন। শিব তাঁর ত্রিশূল দিয়ে পাহাড়ের গায়ে ছিদ্র করেন! সমস্ত জল পার্শ্ববর্তী অঞ্চল প্লাবিত করে নদীর আকার নেয়। নয়জন দেবতা স্বর্গ থেকে মাটি নিয়ে আসেন মর্তে। সাতজন দেবী ওই মাটি জলে নিক্ষেপ করেন এবং এ্যামাইবীরা অতি হালকা পায়ে সেগুলি সমান করেন। জমি প্রস্তুত হলে শিব ও পার্বতী সেখানে লীলা করেন। এইভাবে নৃত্য আরম্ভ হলে সর্পরাজ পাখাম্বা তাঁর মণি দিয়ে জায়গাটিকে আলোকিত করেন। এই জন্যে এই স্থানটিকে মণিপুর বলা হয়। পাখাম্বা হচ্ছেন মৈতৈদের আদি পুরুষ। ইনি হচ্ছেন অনন্তনাগ এবং অমর। সুতরাং নাগদের প্রভাবও মৈতৈদের ওপর ছিল বলে বোঝা যায়।

মণিপুর রাজ্যটি ছোট হলেও প্রান্তীয় দেশ বলে চিরকালই প্রতিবেশী রাজ্যগুলির সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই ছিল। মণিপুরের উত্তরে নাগা পাহাড়। নাগরা চিরকালই সমতলবাসী মৈতৈদের উত্যক্ত করেছে। পশ্চিমে কাছাড় জেলা, দক্ষিণে কুকি, লুসাই, সুতী প্রভৃতি পার্বত্যজাতির বাস। পূর্ব সীমায় উত্তর ব্রহ্মের শান প্রদেশ। চতুর্দিকে নাগা, কুকি, লুসাই, সান ও ব্রহ্মবাসীরা মণিপুরীদের নিশ্চিন্তে থাকতে দেয় নি। সেইজন্যে স্বাভাবিক ভাবেই মণিপুরের সঙ্গে এই সকল জাতির সাংস্কৃতিক বিনিময় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। এর একটি কারণ হচ্ছে মনিপুর থেকে ওই সব দেশের মধ্যে গমনাগমনের সুবিধা ছিল। এইজন্যে উত্তর, দক্ষিণ ভারতের থেকেও মণিপুরে মঙ্গোলীয় প্রভাব বেশী লক্ষ্য করা যায়।

ইতিহাস—মণিপুরের নৃত্য সম্বন্ধে ধারাবাহিক কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। কথিত আছে যে, পামহেবা রাজা হবার পর মণিপুরের অনেক পুঁথি পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। এর ফলে লিখিত প্রমাণাদি সব লোপ পেয়েছে। তবুও যেটুকু ইতিহাস পাওয়া যায় তার ওপর ভিত্তি করেই নৃত্যের একটি ইতিহাস তুলে ধরা যেতে পারে। ৩৩ খৃষ্টাব্দে পৈরোইতান্ নামে এক ব্যক্তি পশ্চিম ভারত থেকে মণিপুরে গিয়ে আর্যসভ্যতা প্রচার করেন। ১৫৪ খৃষ্টাব্দে রাজা খুয়াইতোম্‌পোক চর্মবাদ্যের প্রচলন করেন। ৭০৭ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশের রাজা

চীনদেশে মণিপুর ও আসাম থেকে কয়েকজন নৃত্যশিল্পী পাঠান। ১০৭৪ খৃষ্টাব্দে রাজা লয়াম্বা সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময় খাম্বা থৈবীর ঘটনা ঘটে। কথিত আছে যে, এই সময় থেকে লাইহারাওবা নৃত্যের প্রচলন সুরু। ১৪৬৭ খৃষ্টাব্দে রাজা কিয়াম্বার সময় বর্মার রাজা পং মণিপুর থেকে কয়েকজন নৃত্যশিল্পী ও ড্রামবাদককে বর্মায় নিয়ে যান। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে মণিপুর বাইরের বিবাদ ও ঘরের কলহে জর্জরিত হয়ে পড়ে। এই সময় ব্রহ্মরাজ মণিপুর আক্রমণ করেন। এই অবস্থায় পামহৈবা মণিপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং প্রজাদের আনুকূল্য লাভ করে 'গরীব নেওয়াজ' উপাধি পান। পামহৈবা তাঁর গুরু শান্তিদাসের সহায়তায় 'রামানন্দি' ধর্মের প্রচলন করেন। রামানন্দি ধর্মে রামই আরাধ্য দেবতা। মণিপুরের প্রজারাও এই ধর্ম গ্রহণ করেন। এঁর রাজত্বকাল থেকেই বৈষ্ণব প্রভাব বাড়তে থাকে। পামহৈবা পূর্বতন ধর্মের সমস্ত পুঁথি পুড়িয়ে ফেলেন এবং পূজা নিষিদ্ধ করে দেন। এর ফলে মৈতৈদের ধর্মে ও সংস্কৃতিতে একটি বিরাট পরিবর্তন ঘটে এবং বৈষ্ণবধর্ম প্রাধান্য পায়।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ রাজত্ব করেন। এই সময় বঙ্গদেশ থেকে পরমানন্দ ঠাকুর ধর্ম প্রচারক হিসেবে মণিপুরে যান। ইনি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিষ্য ছিলেন। মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র এঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব পদকর্তাদের পদ নাচের মধ্যে সন্নিবেশিত হয়। বঙ্গদেশ পালাকীর্তনেরও প্রবর্তন হয়। বঙ্গদেশ থেকে আগত এই পালার নাম হয় 'বঙ্গদেশ পালা' বা 'অরিবা' (প্রাচীন)। এর থেকেই 'নটপালা' বা 'অনৌবা' (নবীন) কীর্তনের উদ্ভব হয়। নটপালা কীর্তনে নৃত্যকে বেশী প্রাধান্য দিয়ে 'করতাল' চলোম পুংচলোম প্রভৃতি নৃত্যের প্রবর্তন হয়। ভাগ্যচন্দ্র মহারাজের সময় মণিপুরের প্রায় প্রতিটি মন্দিরেই নাটমণ্ডপ তৈরী হয় এবং মহারাজ রাসনৃত্যের সৃষ্টি করেন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি গোবিন্দজীর পুজো করেন। মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র মহারাস, বসন্তরাস, কুঞ্জরাস ও ভঙ্গী অচৌবার সৃষ্টি করেন। তিনি প্রথম যখন রাসলীলার প্রবর্তন করেন তখন সেই উৎসবে তাঁর কন্যা লাইরোবী বা বিম্বাবতী মঞ্জরী রাধিকার অভিনয় করেন। মহারাজা গম্ভীর সিংএর সময় (১৮২৫ খৃঃ-১৮৩৪ খৃঃ) গুরু সময়রাঙ গোষ্ঠভঙ্গী রচনা করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নরসিংহ মহারাজের সময় নটপালার পোষাক ও চোলমের

সংস্কার করা হয়। ১৮৫০—১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মহারাজ কীর্তি সিং রাজত্ব করেন। এই সময় বৃন্দাবন পারেং ও খুড়ুম্বা পারেংএর প্রচলন হয়। এঁর রাজত্বকালে গুরু সেনাচন্দ্র, থকচোমাবৈবা এবং বামন খোরানিসবি নিত্যরাসের পুনর্বিন্যাস করেন। এঁর রাজত্বের সময় মণিপুরে প্রবেশের বাধা থাকাতে মণিপুরী নৃত্য ভারতের অন্যান্য প্রান্তের নৃত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ মণিপুর থেকে কয়েকজন গুরুকে শান্তিনিকেতনে আনেন এবং মণিপুরী নৃত্যের আঙ্গিকে কিছু নৃত্য রচিত হয়। ১৯২৬ খৃঃ শান্তিনিকেতনে ত্রিপুরা থেকে নবকুমার এবং মণিপুর রাজপরিবার থেকে বুদ্ধিমন্ত সিং আসেন। এঁদের শিক্ষাদানে মণিপুরের বাইরে মণিপুরী নৃত্যের প্রচলন সুরু হয়। ১৯৩৭ খৃঃ শিলচর থেকে সেনারিক রাজকুমার এবং মহিম সিং কলকাতায় আসেন। সিলেট থেকে নীলেশ্বর শর্মাও অধ্যাপনার জন্যে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। গুরু অমুবী সিং এসে উদয়শঙ্কর কালচার সেণ্টারে যোগ দেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে শ্রীহরেন ঘোষ কলকাতায় মণিপুরী নৃত্য প্রদর্শনের জন্যে মণিপুর থেকে একটি নৃত্যের দল এনেছিলেন। এইভাবে মণিপুরী নৃত্য ক্রমশঃ মণিপুরের গণ্ডি ছেড়ে বহির্জগতে এসে স্থানলাভ করে।

রাস :—একথা পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে যে মণিপুরে ধর্ম ও নৃত্য অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে। অনেকে অনুমান করেন যে, মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র লাইহারওবা নৃত্যের অনেক উপাদান রাস নৃত্যে গ্রহন করেছেন। শুধু তাই নয়, আসামের বৈষ্ণব আখড়ার 'সত্রা' নৃত্য থেকে এবং বঙ্গদেশের কীর্তন থেকে তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন। মণিপুরের প্রচলিত নৃত্যপদ্ধতিকেই পরিমার্জন করে, কোথাও বর্জন করে, কোথাও বা সংযোজন করে তিনি রাস নৃত্যের প্রচলন করেন। মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র মহারাস, বসন্তরাস কুঞ্জরাসের সৃষ্টি করেন। ১৮২৫—১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গম্ভীর সিংএর সময় গোষ্ঠরাস রচিত হয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে মহারাজ কীর্তি সিংএর সময় নিত্য রাসের সৃষ্টি হয়। নিত্যরাসকে নর্তনরাসও বলা হয়। ভাগবত পুরাণের রাস পঞ্চাধ্যায় থেকে বিষয় বস্তু গ্রহণ করে মহারাসের সৃষ্টি হয়েছে। কার্তিক পূর্ণিমাতে এই রাস করা হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা করেন তখন গোপীদের মনে গর্বের সঞ্চার হয়। গোপীদের শিক্ষা দেবার জন্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলী থেকে অন্তর্হিত হন। এতে গোপীরা

এবং শ্রীরাধিকা কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। তাঁদের এই বিরহকাতর অবস্থা দেখে শ্রীকৃষ্ণ আবার প্রকট হন এবং প্রত্যেক গোপীর সঙ্গে নৃত্য করেন। এই মহারাসে ভঙ্গী অচৌবা ও বৃন্দাবন ভঙ্গী করা হয়।

বসন্তরাস :—চৈত্র পূর্ণিমাতে বসন্তরাস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে যে, দোল উৎসবে রঙ খেলবার সময় শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর ওপর একটু বিশেষ অনুরাগ দেখান। এতে শ্রীরাধা অভিমান করে রাসমণ্ডলী ত্যাগ করেন এবং নীল ওড়নাটি রাসমণ্ডলীতে রেখে যান। ওই ওড়নাটি দেখে শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পারেন যে শ্রীরাধা অভিমান করে ওড়নাটি ফেলে রেখে রাসমণ্ডলী ত্যাগ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ অনেক অনুনয় করে শ্রীরাধার মানভঞ্জন করেন এবং সকলে মিলে হোলি অথবা রঙ্ খেলেন। বসন্তরাসে অচৌবা ভঙ্গী পারেং ও খুরুম্বা ভঙ্গী পারেং করা হয়।

কুঞ্জরাস :—অশ্বিনমাসের অষ্টমীতে কুঞ্জরাস অনুষ্ঠিত হয়। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে যে, অভিসার ও রাসের পর শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের মনোমত সঙ্গী নিয়ে কুঞ্জে বিহার করেন। এই রাসে ভঙ্গী অচৌবা করা হয়।

নিত্যরাস—এই রাস বৎসরের সকল সময়ই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এতে শুধুমাত্র অভিসার ও রাস প্রদর্শিত হয়। এই রাসে অচৌবা ভঙ্গী পারেং, বৃন্দাবনভঙ্গী পারেং, খুরুম্বা ভঙ্গী পারেং করা হয়।

গোষ্ঠরাস—(শন্‌শেন্‌বা) এই রাস কার্তিকমাসে অনুষ্ঠিত হয়। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম নারদের কাছে গোপালকের কাজ শিক্ষা করেন এবং গোপদের সঙ্গে মাঠে গোচারণে যান। সেখানে সকলে কন্দুক (বল) খেলেন। অত্যাধিক পরিশ্রমে তাঁরা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েন এবং নিকটবর্তী তালবনে গিয়ে বৃক্ষের থেকে ফল পেড়ে খান। সেই তালবনে বাস করত ধেনুকাসুর রাক্ষস। সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে বধ করতে আসে। কিন্তু নিজেই সে বালক কৃষ্ণের হাতে নিহত হয়। এরপর বকাসুরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ভীষণ যুদ্ধ হয়। সেই ভীষণ যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ বকাসুরকে বধ করেন।

উলুখল রাস—উলুখল রাস কার্তিক মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এটির বিষয়বস্তুও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাকে অবলম্বন করে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গী সাথীদের নিয়ে গোপীদের ঘর থেকে মাখন চুরি খেতেন। তখন গোপীরা অতিষ্ঠ হয়ে

যশোদার কাছে নালিশ করে। যশোদা গোপীদের অভিযোগে অতিষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে উলুখলের সঙ্গে বেঁধে রাখেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে নিজেকে বন্ধনমুক্ত করে পালিয়ে যান।

রাসমণ্ডপ—মণিপুরে গোবিন্দজীর প্রত্যেকটি মন্দিরের সামনে নাটমণ্ডপ থাকে। নাটমণ্ডপটির ১২টি স্তম্ভ থাকে। এই স্তম্ভগুলির মধ্যবর্তী জায়গায় রাসমণ্ডপ তৈরী হয়। রাসমণ্ডপটিকে ফুল লতাপাতা দিয়ে সাজানো হয়। রাসমণ্ডপের চারটি প্রবেশ দ্বার থাকে। মধ্যস্থলে যেখানে রাস অনুষ্ঠিত হয়, সেই জায়গাটিকে 'রঙ্গস্থল' বলে।

মহারাসের অনুষ্ঠান সূচী :—কৃষ্ণ অভিসার, শ্রীরাধা—গোপী অভিসার, মণ্ডল সাজানো, গোপীদের রাগালাপ, অচৌবা ভঙ্গী, কৃষ্ণনর্তন, রাধা নর্তন, গোপীদের নৃত্য, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান, শ্রীকৃষ্ণের পুনরাবির্ভাব, বৃন্দাবন ভঙ্গী পারেং ও পুষ্পাঞ্জলি।

বসন্তরাসের অনুষ্ঠান সূচী :—১নং থেকে ৮নং পর্যন্ত মহারাসের মতনই অনুষ্ঠান সূচী। তারপর সুরু হয় হোলি খেলা বা ফাগু খেলা। কৃষ্ণ ও চন্দ্রাবলীর নৃত্য, রাধার ঈর্ষ্যা ও অভিমান, কৃষ্ণের রাধাকে খোঁজা, ললিতা ও বিশাখার কৃষ্ণকে অনুসন্ধান, ললিতা ও বিশাখার কৃষ্ণকে রাধার কাছে নিয়ে আসা, কৃষ্ণের ক্ষমা ভিক্ষা ও রাধার মার্জনা, খুরুম্বা ভঙ্গী পারেং, আনন্দে গোপীদের নৃত্য, এবং পুষ্পাঞ্জলি, গোপীদের গৃহে গমন।

গোষ্ঠরাসের অনুষ্ঠানসূচী :—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গুণগান, সূত্রধারের নান্দীর পর নারদ ও বৎসাসুরের প্রবেশ ও নন্দরাজার প্রাসাদে গমন, নন্দরাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ, প্রহরীর যশোদা ও রোহিনীর কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে আনয়ন, বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে নারদ কর্তৃক গাভীদোহন শিক্ষা। এরপর শ্রীকৃষ্ণ নারদকে দুগ্ধ পান করতে দেন ও প্রণাম জানান। বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে আশীর্বাদ জানিয়ে নারদের বিদায় গ্রহণ, প্রহরী এসে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে যশোদা ও রোহিণীর কাছে ফেরৎ নিয়ে যায়। শ্রীদাম ও সুদাম প্রভৃতি সখাদের যশোদা ও রোহিণীর কাছে অনুনয়। যশোদা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে নৃত্য শিক্ষা দেন এবং অন্যান্য গোপরাও এই নৃত্যে যোগ দেয়। অশুভশক্তি থেকে ছেলেদের রক্ষার জন্যে যশোদার প্রার্থনা, নন্দরাজের কাছে ছেলেদের পাঠিয়ে দেন যশোদা। অন্যান্য গোপদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও

বলরামকেও নন্দ গোচারণে পাঠান। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সাথীদের সঙ্গে গোবর্ধন পাহাড়ে যান।

রাসনৃত্যে প্রধানতঃ খোল ও মন্দিরা বাজে ও তার সঙ্গে গান করা হয়। স্ত্রীপ্রধান রাসে প্রথমে নটপালা করা হয়, কিন্তু গোষ্ঠলীলাতে নটপালা হয় না। এতে স্ত্রী সূত্রধারিনী থাকে না। পুরুষ সূত্রধর থাকে এবং এতে মন্দিরার বদলে ঝাল বাজানো হয়ে থাকে। গোষ্ঠলীলা চালির সঙ্গে শেষ হয়।

ভঙ্গী পারেং :—মণিপুরী নৃত্যে ভঙ্গী পারেং এর বিশেষ ভূমিকা আছে। ভঙ্গীর অর্থ হচ্ছে নানাভাবে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ভঙ্গ করে অবস্থান করানো। অর্থাৎ বিভিন্নভাবে নৃত্যের আঙ্গিক ক্রিয়া। এই আঙ্গিক ক্রিয়া এবং অবস্থানকে মণিপুরী নৃত্যে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে একটি নিয়মের মধ্যে আনা হয়েছে এবং এইগুলি মণিপুরী নৃত্যে প্রয়োগ করা হয়। বিশেষ করে রাস নৃত্যে এই ভঙ্গীগুলি প্রয়োগ করা হয়। ভঙ্গীকে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে—(১) ভঙ্গী অচৌবা (২) বৃন্দাবন ভঙ্গী (৩) খুরুম্বা ভঙ্গী (৪) গোষ্ঠভঙ্গী (৫) গোষ্ঠ বৃন্দাবন ভঙ্গী। পারেং কথাটি ভঙ্গীর সঙ্গে যুক্ত হয়। পারেং এর অর্থ ক্রমবিন্যাস বা সারি। ভঙ্গীগুলি সারিবদ্ধ করা হয়েছে বলে পারেং শব্দটি ব্যবহৃত হয়। অচৌবা ভঙ্গী পারেং এ শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা থাকে। বৃন্দাবন পারেং এ বৃন্দাবনের বর্ণনা থাকে। খুরুম্বা পারেং এ যুগল বন্দনা থাকে। গোষ্ঠভঙ্গী পারেং এ গোষ্ঠলীলার বর্ণনা থাকে এবং গোষ্ঠবৃন্দাবন পারেং এ গোষ্ঠবৃন্দাবনের বর্ণনা থাকে। অচৌবা, বৃন্দাবন ও খুরুম্বা পারেং লাস্য নৃত্যে করা হয় এবং গোষ্ঠ ও গোষ্ঠবৃন্দাবন তাণ্ডব পদ্ধতিতে করা হয়।

চালি—মণিপুরী নৃত্য শিখতে গেলে প্রারম্ভিক শিক্ষা সুরু হয় 'চালি' নৃত্য দিয়ে। এই প্রারম্ভিক শিক্ষা ছাড়া মণিপুরী নৃত্যশিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র যে নৃত্যটি গোবিন্দজীর চরণকমলে অর্পণ করেছিলেন তার ২৪, ২৫ ও ২৬ পর্যায়গুলি এই নৃত্যে ব্যবহৃত হয়েছে। রাসলীলা ও ভঙ্গীগুলিতে 'চালি' নৃত্যের প্রয়োগ হয়। চালির দুটি ভাগ—তাণ্ডব ও লাস্য। একই চালি তাণ্ডব ও লাস্য পদ্ধতিতে করা যায়। মূল চালি সাধারণতঃ ৪ রকম হয়। চালি নৃত্যে বিভিন্ন পদক্ষেপের সঙ্গে কতকগুলি মুদ্রার বার বার প্রয়োগ হয়ে থাকে। সমপাদে, সমশিরে ও সমদৃষ্টিতে পতাক হাত দুটি বুকের সামনে রাখতে হয় এবং করতল বাইরের দিকে

থাকে। তারপর চালি নৃত্য সুরু করতে হয়। গতির সঙ্গে করকরণ এবং মুদ্রাগুলি বার বার করতে হয়। 'চালি' নৃত্য অপরিবর্তনীয়। প্রায় প্রতিটি বৈষ্ণবীয় নৃত্যের শেষে 'চালি' নৃত্য করা হয়ে থাকে। মনে হয় 'কৃষ্ণপ্রেম বিনা কৃষ্ণ মেলে না' এই মূলমন্ত্রই হয় তো চালির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা হয়। অনেক গুরুর মতে চালির দ্বারা বিরহকাতরা গোপীদের বিলাপ প্রকাশ করা হয়, পদ্মসরোবরে সাথীহারা রাজহংসীরচকিত বিলাপের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। চারটি মূল চালি ছাড়া চালির সঙ্গে অনেক অলঙ্কার যোগ করা হয়। তাকে চালি পারেং বলা হয়। অনেকে চালির পর পুংলোল্ জগোই যোগ করেন।

পুংলোল জগোই—খোলের বোলের সঙ্গে নৃত্য করাকে পুংলোল জগোই বলে। খোলের বোলের গতির সঙ্গে নৃত্যের গতি সমতা রক্ষা করে। তাণ্ডব বা লাস্যে এই নৃত্য করা যেতে পারে। যে কোন লয়েই এই নৃত্য করা হয়। পুং মানে খোল এবং জগোই মানে নৃত্য।

নিপা ও সুপী—মণিপুরী নাচের দুটি ভাগ। নিপার অর্থ হচ্ছে পুরুষ। পুরুষের দ্বারাই তাণ্ডব নৃত্য করবার বিধান আছে। সুপীর অর্থ স্ত্রী। সুতরাং স্ত্রীর দ্বারা লাস্য নৃত্য করাই কর্তব্য। সুতরাং তাণ্ডব ও লাস্যের যে ভেদ আছে যথাক্রমে তা নিপা সুপীর দ্বারা সম্পন্ন হয় বলে নিপা সুপী জগোইএর উল্লেখ করা হয়েছে।

নটপালাসংকীর্তন :—নটপালাকে এককথায় পূর্বরঙ্গ বলা যেতে পারে। 'নটপালাকে' অনৌবাপালা বা নূতন পালা বলা হয়। 'বঙ্গদেশ' পালা অরিবাপালা বা প্রাচীন পালা নামে খ্যাত। বঙ্গদেশ পালাতে নৃত্যের প্রাধান্য দিয়ে করতাল চলোম্, পুং চলোম্ প্রভৃতি নৃত্যের সংযোজন করে নটপালা কীর্তন হয়েছে। এতে গানেরও পরিবর্তন করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'গরীব নওয়াজের' সময় বঙ্গদেশ পালা কীর্তনের প্রচলন হয়। এই সময় এই 'বঙ্গদেশ পালাতে' রাধের গুণকীর্তন হত। বঙ্গদেশ থেকে এই পালার আগমন বলে একে 'বঙ্গদেশ' পালা বলা হয়। নটপালা কীর্তনে রাধাকৃষ্ণের গুণগান করা হয়। মাথায় পাগড়ী এবং গায়ে উত্তরীয় নিয়ে পুরুষরা পুংলোল জগোই বা করতাল জগোই করেন।

থাবল্ চোংবা :—দোল পূর্ণিমাতে বড় খোলা মাঠে গ্রামের যুবক যুবতীরা

মিলিত হয়ে হাত ধরাধরি করে বৃত্তাকারে এই নৃত্যোৎসব করেন। দলপতি গানের প্রথম লাইনটি গাইতে থাকেন এবং অন্যান্য সকলে ধুয়ো ধরেন।

খুবাক-ঈশে :—আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিন খুবাক-ঈশৈ নৃত্য সুরু হয় এবং একাদশীতে শেষ হয়। হাতে তালি বাজিয়ে বাজিয়ে এই নৃত্য করা হয়। অনেকে একে তালরাসকের অন্তর্গত করেছেন। এই সময় দশঅবতার প্রভৃতি হাতে তালি দিয়ে গান করা হয়।

ঔগ্রিহঙেল :—ঔগ্রি অর্থাৎ শিবের অঙ্গহার। কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, মণিপুরী নৃত্যের সৃষ্টির সময় তিনি যে নৃত্য করেছিলেন তাকে ঔগ্রিহঙেল বলা হয়। হাতে তরবারী বা বর্শা অথবা ত্রিশূল নিয়ে এই নৃত্য করা হয়। কখনও কখনও শূন্য হাতেও এই নৃত্য করা হয়। এই নৃত্যে দুরকমের অঙ্গহার আছে। প্রথমটি সৌভাগ্য ও সাফল্যের ইঙ্গিত করে এবং দ্বিতীয়টি ধ্বংসের ইঙ্গিত করে।

চীংখৈরোল—আজকাল এই নৃত্যটি প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। এই নৃত্যকে একরকম ব্যায়াম বলা যেতে পারে।

বাদ্যযন্ত্র :—মণিপুরে বিভিন্ন ধরণের নৃত্যের সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক বৈষ্ণবীয় নৃত্যে খোল এবং মন্দিরা (খঞ্জনী) একটি বিশেষ বাদ্যযন্ত্র। এই বাদ্যযন্ত্র ছাড়া রাসনৃত্য বা ভঙ্গীপারেং নৃত্য করা হয় না। খোলগুলি বাংলাদেশের খোলের মতন মাটি দিয়ে তৈরী হয় না। এগুলি কাঠ দিয়ে তৈরী হয়। আনদ্ধ যন্ত্রের মধ্যে পুং (খোল), ডাফত, খঞ্জরী, নগনা (ড্রাম), হারাও পুং, তানিয়াই বুং ইত্যাদি বাজানো হয়ে থাকে। কাংস বাদ্যের মধ্যে মন্দিলা, তত যন্ত্রের মধ্যে পেনা, এসরাজ ইত্যাদি সুষির যন্ত্রের মধ্যে বাঁশী ও মৈবুং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাসনৃত্যে এই দুটি যন্ত্রই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মণিপুরী নৃত্যকে মণিপুরের বাইরে প্রচার করে যাঁরা সুনাম অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে গুরু অমুবী সিং ও গুরু আতাম্বাসিংএর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া গুরু সেনারিক রাজকুমার, নবকুমার, বিপিন সিং প্রিয়গোপাল সিং, নদীয়া সিং, সিংহজিতসিং, ব্রজবাসীসিং প্রভৃতি নৃত্যগুরুদের অবদানও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এইভাবে মণিপুরী নৃত্য ইদানীং মণিপুরের বাইরে প্রচারিত হয়ে নৃত্যরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। নাট্যশাস্ত্র—ভরতমুনি রচিত অভিনবগুপ্তের টীকাসহ (Gaekwad's Oriental Series.) Vol. I & II.

২। অভিনয় দর্পণ—নন্দিকেশ্বর, ভাষান্তর—শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

৩। সঙ্গীত রত্নাকর—শার্ঙ্গদেব রচিত কল্লিনাথের টীকাসহ (দ্বিতীয় ভাগ)

৪। সাহিত্য দর্পণ—শ্রীবিশ্বনাথ কবিরাজ

৫। সঙ্গীত মকরন্দ—নারদ (Edited by Ramkrishna Telang)

৬। সঙ্গীত পারিজাত—শ্রীঅহোবল পণ্ডিত (ভাষ্য-শ্রীকলিন্দজী)

৭। সঙ্গীত দর্পণ—চতুর দামোদর পণ্ডিত।

৮। সঙ্গীত দামোদর—শুভঙ্কর।

৯। শ্রীশ্রীউজ্জ্বল নীলমণি—শ্রীপাদ রূপগোস্বামী (শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক সম্পাদিত)

১০। বিদগ্ধ মাধব—শ্রীপাদ রূপগোস্বামী (শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক সম্পাদিত)

১১। পদ্মপুরাণ (ভূমিখণ্ড)—শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন কর্তৃক সম্পাদিত।

১২। দত্তিলম্—দত্তিল।

১৩। বিষ্ণু পুরাণ—শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন কর্তৃক সম্পাদিত।

১৪। ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ— ঐ

১৫। বাচস্পত্য বিধান—তারানাথ ভট্টাচার্য

১৬। শ্রীমদ্ভাগবত—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা সমন্বিত (দশম স্কন্দ)

১৭। মহাভারত—সংস্কৃত মূল (হিন্দী অনুবাদ, গীতা প্রেস, গোরখপুর)

১৮। মনুসংহিতা—শ্যামাকান্ত বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত।

১৯। কথাসরিৎসাগর—সোমদেব।

২০। বৈষ্ণবপদাবলী—শ্যামাকান্ত বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত।

২১। ভারতের সংস্কৃতি—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

২২। পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি—শ্রীবিনয় ঘোষ।

২৩। বাদশাহী আমল—শ্রীবিনয় ঘোষ

২৪। দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা—শ্রীশীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

২৫। ভারত সংস্কৃতি—ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।
২৬। পৃথিবীর ইতিহাস—দুর্গাদাস লাহিড়ী।
২৭। রবীন্দ্র রচনাবলী—(জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)।
২৮। বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—(উদ্বোধন কার্যালয়)।
২৯। ভারতকোষ—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।
৩০। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—শ্রীসুকুমার সেন।
৩১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশ চন্দ্র সেন।
৩২। বাংলার ইতিহাস—রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩৩। বাংলার লোকসাহিত্য—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।
৩৪। গৌড়ের ইতিহাস—শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্তী (১ম খণ্ড)
৩৫। মণিপুরের ইতিহাস—মুকুন্দলাল চৌধুরী।
৩৬। মণিপুর প্রহেলিকা—শ্রীজানকী নাথ বসাক।
৩৭। নাটক ও নাটকের অভিনয় ও অন্যান্য প্রবন্ধ—৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য।
৩৮। নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা—৺ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য।
৩৯। সঙ্গীত ও সংস্কৃতি—প্রজ্ঞানানন্দ স্বামী।
৪০। রাগ ও রূপ—প্রজ্ঞানানন্দ স্বামী।
৪১। বঙ্গশ্রী—(আশ্বিন—১৩২৮)।
৪২। গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ।
৪৩। রবীন্দ্র সঙ্গীত—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ।
৪৪। ভারতীয় সঙ্গীতে তাল ও ছন্দ—শ্রীসুবোধ নন্দী।
৪৫। অমিয় নিমাই-চরিত—শিশির কুমার ঘোষ
৪৬। Natyasastra—Translated by Manomohon Ghose
৪৭। The Art of Indian Asia— Henrich Zimmer.
৪৮। A Book of Indian Culture—D. S. Sharma.
৪৯। Number of Rasas—V. Raghavan
৫০। A History of fine art in India and Ceylon—
V. A. Smith
৫১। What is Art and Essays on Art—Leo Tolstoi
৫২। Bhoja's Sringara Prakash—V. Raghavan

৫৩) The Dance in India—Faubion Bowers
৫৪) A History of South India—Nilkanta Sastri
(Second Edition)
৫৫) A short History of the Muslim Rule in India—
Iswariprosad
৫৬) Gateway to the Dance—Ruby Ginner
৫৭) Dictionary of thoughts—Tryon Edwards
৫৮) Transformation of Nature in Art—
A. K. Coomarswami
৫৯) Dances of Siva—A. K. Coomarswami
৬০) Studies in Indian Antiquities—Hem Chandra Roy
Choudhury
৬১) A comprehensive History of India—Nilkanta Sastri
৬২) Children's Encyclopedia—Originated and Edited
by Arthur Mee Vol. IX
৬৩) On the Art of the Theatr.—Edward Gordon Craig
৬৪) Dance of India—Projesh Banerjee
৬৫) The Folk Dances of Bengal—Gurusaday Dutta
৬৬) Classical Dances and costumes of India—Kay
Ambrose
৬৭) The Art of Hindu Dance—Manjulika Bhaduri &
Santosh Chatterjee
৬৮) The Brief Description of the Manipuri Dance—
Atambapu Sarma
৬৯) Manipuri Dances—Leela Row Dayal
৭০) Feminism In A Traditional Society—Manjusri
Chaki Sircar
৭১) World Costumes—Angela Bradshaw
৭২) A history of Indian Dress—Dr. Charles Fabri
৭৩) Costumes and Taxtiles of India—Jamila Brij Bhusan

৭৪) Parsian Miniatures—Basil Gray
৭৫) Kathakali—K. Bharatha Iyer
৭৬) The art of Kathakali—G. A. C. Pandeya '
৭৭) Bharatnatya and other Dances of Taminad—
E. Krishna Iyer
৭৮) Advanced History of India—R. C. Mazumdar
৭৯) The Oxford Students History of India—V. A. Smith
৮০) Language of Kathakali—Premkumar
৮১) কথাকলি নৃত্যকলা (হিন্দী)—গায়নাচার্য অবিনাশ চন্দ্র পাণ্ডে
৮২) নৃত্যকলা বিজ্ঞান (হিন্দী)—বজ্রীপ্রসাদ শুক্ল
৮৩) নৃত্য অঙ্ক—(হিন্দী) সঙ্গীত কার্যালয়, হাথরাস
৮৪) রাজস্থান কী জাতিয়াঁ—বজরঙ্গলাল লোহিয়া
৮৫) নারী কা রূপশৃঙ্গার—(হিন্দী) সাবিত্রী দেব বর্মা
৮৬) কথক নৃত্য (হিন্দী)—লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ
৮৭) হমারী নাট্য পরম্পরা (হিন্দী)—শ্রীকৃষ্ণ দাস
৮৮) মণিপুরী নর্তন (হিন্দী)—দর্শনা জাভেরী, কলাবতী দেবী

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রসংখ্যা
Cod	God	২৫
Soubs	Souls	২৫
Having evoked nt it	Having evoked it in	২৫
স্বদেবিন্দুযুক্ত	স্বেদবিন্দুযুক্ত	২৮
সম্মত	মম্মত	৭৪
অনুভূতি	অনভ্যস্ত	৮৭

শিরোভেদের ব্যাখ্যায় ভ্রমবশতঃ অভিনয় দর্পণের আরও পাঁচটি শিরোভেদের উল্লেখ করা হয় নি। সেগুলির নাম ও সংজ্ঞা দেওয়া হল নীচে— ১২৫

নাম—ধুত, কম্পিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত ও পরিবাহিত।

সংজ্ঞা—ধুত—মস্তকটি বামে ও দক্ষিণে চালিত হলে 'ধুত' শির হয়। নেই এই কথা বলতে, বার বার পার্শ্বদর্শনে, অনাশ্বাসে, বিস্ময়ে, বিষাদে, অনিচ্ছায় শীতার্ত্তে, জ্বরে, ভয়ে ও সদ্য মদ্যপানে, যুদ্ধে, নিষেধে, নিজেকে নিরীক্ষণে, পার্শ্ব থেকে আহ্বানে এই শির ব্যবহৃত হয়।

কম্পিত—মস্তকটি ওপরে ও নীচে চালিত হলে 'কম্পিত' শির হয়। ক্রোধে, 'থাম' এই বচনে, প্রশ্নে, গণনায়, আহ্বানে, তর্জনে এই শির ব্যবহৃত হয়।

পরাবৃত্ত—মস্তকটি পেছনে ফেরালে 'পরাবৃত্ত' শির হয়। কোপ, লজ্জা প্রভৃতিতে মুখ ফেরালে, অনাদরে, কেশবন্ধনে, তূণী থেকে শর গ্রহণ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়।

উৎক্ষিপ্ত—পাশে ও পরে ওপরদিকে শির উৎক্ষিপ্ত হলে 'উৎক্ষিপ্ত' শির হয়। পরিপোষণ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

পরিবাহিত—মস্তকটি উভয়দিকে চামরের মত বিস্তৃত হলে পরিবাহিত শির হয়। মোহ, বিরহ, স্তুতি, সন্তোষ, অনুমোদন, বিচার প্রভৃতিতে এই শির ব্যবহৃত হয়।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃঃ
বীভৎসা	রসদৃষ্টির অন্তর্গত হবে	১৫৪
অভিনয় দর্পণের 'সূচী' হস্তের ছবিটি অভিনয় দর্পণের কটকামুখম্ হবে এবং অভিনয় দর্পণের 'কটকামুখম' হস্তের ছবিটি অভিনয় দর্পণের 'সূচী' হস্ত হবে।		১৯৮
বিলাগস্ত	বিলাসস্ত	২০৭
প্রবধনম	প্রবর্ধনম	২০৭
অঙ্গসৌষ্ঠযুক্ত	অঙ্গসৌষ্ঠবযুক্ত	২২৪
স্বতে	স্থিতে	২২৫
অভিসয়	অভিনয়	২৩৬
ভাত্ত	ভাও	২৩৬
বাকসজ্জা	বাসকসজ্জা	২৩৮
বাস	রাস	২৩৯
Continned	Continued	২৪১